এই প্রেম

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক:
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর : ১৯৫৯, কার্তিক : ১৩৬৬

প্রকাশক : সাহিত্যশ্রীর পক্ষে শ্রীরাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় ।
দি পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ । ২৯, রাম কান্ত মিস্ত্রি লেন ।
প্রবেশ পথ : কানাই ধর লেন ।
কলিকাতা—১২

মুদ্রক : শ্রীসুরেন্দ্র নাথ পান । নিউ সরস্বতী প্রেস ।
১৭, ভীম ঘোষ লেন । কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীজগৎজ্যোতি ঘোষ

চার টাকা

শ্রীযুক্তা পদ্মা দেবী

করকমলেষু

এই উপন্যাসে ব্যবহৃত বাংলা কবিতা দুটি ইতিপূর্বেই লেখকের স্বনামে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ফাল্গুনের সবে প্রথম। এরি মধ্যে বসন্ত যাই-যাই করছে। ক্ষণে ক্ষণে তার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস গায়ে এসে লাগে।

স্পষ্ট বোঝা যায় সে যাবে। সে আর বেশিদিন নেই। তবু এই মুহূর্তে আকাশে বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় সে নিজেকে নিঃস্ব ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছে।

মনে হয় কী এক অজানা অনির্দিষ্ট আকৃতিতে সে আকুল, চঞ্চল। অন্তরে যেন তার এক প্রচণ্ড ক্ষুধা আর এক গভীর তৃষ্ণা। একই বৃত্তির দুই দিক : স্থূল ও সূক্ষ্ম, অন্ধ ও আলোকিত।

ক'দিন বাদেই গ্রীষ্ম আসবে,—আসবেই। তারপর বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীত। এমনিভাবে ঋতুচক্র পাক খেয়ে যাবে। কিছুতে তা' রোধ করা যাবে না। বসন্তের প্রতিটি দীর্ঘনিঃশ্বাসে যেন তারই আরক্তিম বেদনা।

দক্ষিণ দিক হতে হুহু ক'রে হাওয়া আসে। অতানের গায়ে এসে লাগে। দুপুরবেলা মেসের নির্জন ঘরে সে পায়চারি করছে।

আজ তার বিয়ে। কথাটা সে বারবার মনের মধ্যে আলোড়িত করে। কিন্তু তবু সে এতটুকু আনন্দ অনুভব করে না। বরঞ্চ একটা শ্বাসরোধকর অনুভূতি ক্রমশ তার বুকে পাষাণ হয়ে চেপে বসতে থাকে। মনে হয়, এখনো সময় আছে, এখনও সে পালাতে পারে।

অথচ সুমিতার ফটো সে দেখেছে। খুবই সুশ্রী সে। তাছাড়া ধনীর একমাত্র মেয়ে। হ্যাঁ, ধনীই বলতে হবে সুমিতাদের। অন্তত অতীনের কাছে তো বটেই। তাকে বেশ শিক্ষিতাও বলা চলে। এম-এ পর্যন্ত পড়েছে। সব দিক হতেই সে পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তবু অতীনের মনে কিছুমাত্র আনন্দ নেই।

সমস্ত কথাই তার মনে পড়ে। এ'রকম ঘটনা সচরাচর উপন্যাসেও বোধ হয় ঘটে না। সত্যিই জীবন উপন্যাসের চেয়েও আশ্চর্যকর।

এইতো দিন কয় পূর্বের কথা। অতীনের একমাত্র টিউশনিটাও চলে যাওয়াতে সে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

গত চার বছর অক্লান্ত চেষ্টা ক'রেও একটা চাকরি জোটাতে না-পেরে চাকরির আশা সে প্রায় ত্যাগ করেছে। বর্তমানে টিউশনিই তার একমাত্র ভরসা। টিউশনির টাকাতেই তার নিজের যাবতীয় খরচ চালাতে হয়। অথচ এমনই অবস্থা, শীতকালে কুলপিবরফ-ওয়ালার মত মাঝে মাঝে এই টিউশনিও একেবারে উধাও হয়ে যায়। তখন হাজার চেষ্টা করেও একটা জোগাড় করা যায় না।

কিছুদিন যাবৎ একটি মাত্র টিউশনিই অতীনের সম্বল ছিল। অবশেষে তা-ও গেলো। গেলো অবশ্য সামান্য কারণেই, কিংবা যাওয়ার সময় হয়েছিল বলেই গেলো। তা' সে যেজন্যই হোক, সে বেশ দুর্ভাবনায় পড়েগিয়েছিল। অবশ্য টিউশনি না-থাকলে তাকে যে অনাহারে থাকতে হবে তা' নয়। বিনয় যতদিন আছে ততদিন সেরকম অবস্থা কখনো হবে না। কিন্তু বিনয়ের উপার্জনও তো সামান্যই। তাছাড়া বিনয়ের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতেও তার বাধে। সে ভালো বলেই যে সব সময় সেই সুযোগ নিতে হবে তার কী কথা আছে।

তাই সে যা-হোক একটা টিউশনি জোগাড় করার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সময়ের দোষে বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক, বহু চেষ্টাতেও তা' জোগাড় ক'রে উঠতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সে একরকম অনন্যোপায় হয়ে সব সংকোচ দূর ক'রে তাদের এক কালের অধ্যাপক ডক্টর ব্যানার্জির কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তার ছাত্র জীবনে ডক্টর ব্যানার্জি একরকম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বার দুয়েক তাকে এ'রকম জোগাড় ক'রে দিয়েও ছিলেন। সেই আশা নিয়েই সে গিয়েছিল।

ডক্টর ব্যানার্জির মত মানুষ অতীন অল্পই দেখেছে। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি প্রায় বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। পড়াতেনও তিনি চমৎকার। পড়াতে পড়াতে তিনি একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতেন। তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার মনে হতো অসীম। কিন্তু শুধু জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যই নয়, তাঁর মত সরস ক'রে পড়াবার ক্ষমতাও অতীন আর কোথাও দেখেনি। পড়াতে পড়াতে তিনি যে কত গল্প করতেন তার আর ইয়ত্তা নেই।

ছাত্র জীবনে অতীন তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তিনি খুবই স্নেহ করতেন অতীনকে। সে-সময় বই বা নোট ইত্যাদি নেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে প্রায়ই সে তাঁর বাড়িতে যেতো। তিনিই যেতে বলতেন এবং গেলে খুশীও হতেন। তিনি আশা করতেন অতীন নিশ্চয়ই ফার্স্ট ক্লাস পাবে। কিন্তু নানা কারণে অতীনের পক্ষে তা' পাওয়া সম্ভব হয়নি। সেজন্য লজ্জায় সে পরীক্ষার রিজাল্ট বার হওয়ার পর আর কোনোদিন তাঁর কাছে যায়নি।

কিন্তু এখন আর কোনোভাবে কোনো সুবিধা করতে না-পেরে শেষ পর্যন্ত সে সমস্ত লজ্জাসংকোচ ত্যাগ করে তাঁর কাছে গিয়েই

উপস্থিত হয়। সন্ধ্যাবেলা তিনি তাঁর পড়ার ঘরে ছিলেন। বছর চারেক পর হঠাৎ অতীনকে দেখে তিনি যেমন বিস্মিত হন তেমনি উৎফুল্লও হন। তাড়াতাড়ি বই সরিয়ে রেখে বলেন,—'আরে অতীন যে, বহুদিন পর। বোসো বোসো। তারপর কী খবর তোমার ?'

অতীন সসংকোচে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

ডক্টর ব্যানার্জি আবার প্রশ্ন করেন,—'কেমন আছো—ভালো ?'

অতীন মাথা নিচু ক'রে বিনীতভাবে জানায় যে সে ভালোই আছে। তখনো তার লজ্জার ভাব কাটেনি।

ডক্টর ব্যানার্জি চেঁচিয়ে তাঁর মেয়েকে ডেকে অতীনকে চা দিতে বলেন। তারপর চশমার কাচ মুছতে মুছতে বলেন,—'কিন্তু তোমাকে তো ভালো দেখছি না। বেশ রোগা হয়ে গেছো মনে হচ্ছে। কী করো আজকাল ?'

অতীন তেমনি মাথা নিচু ক'রে বলে, 'কিছুই না।'

—'কিছু না! তাহলে পড়াশোনা ছাড়লে কেন ?'

অতীন একটু ইতস্তত করে। তারপর তেমনি মাথা নিচু করেই বলে,—'পড়াশোনা করার আর কোনো উপায় ছিল না। রিজাল্টও ভালো হলো না, তাছাড়া কোথায় থাকি, কী খাই—এই চিন্তা।'

—'কেন তোমার দাদা ?'

—'দাদার ওখানে তো আর থাকি না।'

—'থাকো না!—কেন ?'—এবার ডক্টর ব্যানার্জিও একটু ইতস্তত করেন। তারপর বলেন,—'অবশ্য এই সব পারিবারিক কথা বলতে তোমার যদি কোনো আপত্তি—'

বাধা দিয়ে অতীন বলে,—'না না, আপত্তি কিসের। আপনাকে কোনো কথা বলতেই আমার আপত্তি নেই।'

একটু থেমে সংকোচ কাটিয়ে সে বলে,—'আপনি তো জানেন অল্প বয়সেই আমার মা-বাবা মারা যান।'

—'হ্যাঁ, সে তো জানি। তুমি তোমার দাদার কাছে থেকে পড়তে।'

—হ্যাঁ, কিন্তু দাদা তো আপন দাদা নয়, বৈমাত্র ভাই।'—সংক্ষেপে অতীন সব কথাই বলে।

সে যখন স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে সেই সময় তার বাবা মারা যান। মা তারও আগে। মাকে তার ভালো মনেই পড়েনা। বাবা ছিলেন সামান্য স্কুল মাস্টার। সহরতলীর ভাড়াটে বাড়িতেই তাঁর সারাটা জীবন এই মাস্টারি ক'রে কেটেছে। টাকা পয়সা কিছু জমাতে পারেননি। মৃত্যুর সময় গৃহের সামান্য আসবাবপত্র ছাড়া আর বিশেষ কিছুই রেখে যেতে পারেননি তিনি। বাবার মৃত্যুর পর অতীন তাই তার একমাত্র বৈমাত্র বড় ভাই বিষ্ণুর গলগ্রহ হয়ে পড়ে।

বিষ্ণু অতীনের চেয়ে প্রায় বছর পনেরোর বড়। সে বিবাহিত। গুটিকয় ছেলেমেয়েও আছে তার। রেলে চাকরি করে। মাইনে অবশ্য তার অল্পই, কিন্তু সে আয় করে বেশ। তবু প্রথম থেকেই সে অতীনের ভার বহনের দায় এড়াবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সামনে চক্ষুলজ্জার জন্যই বোধ হয় একেবারে তা' পারেনি। তবে বাবার মৃত্যুর পর যে-কয় বছর অতীন দাদা-বৌদির কাছে ছিল একদিনও শান্তিতে থাকতে পারেনি। সব সময়ই দাদা বা বৌদি তাকে সরিয়ে দেওয়ার নানাভাবে চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে বৌদি ছিল এ' ব্যাপারে একেবারে অক্লান্ত।

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ম্যাট্রিকুলেশন সে প্রথম বিভাগেই পাস করে। তবু দাদা পাঁচজনকে বলে বেড়াতে থাকে যে সে একেবারে বক'টে

হয়ে গেছে। বিঁড়ি সিগারেট খাওয়া শুরু করেছে। তা' ছাড়া তার হাবভাবও ভালো নয়। তাকে আর পড়াবার চেষ্টা করার কোনো অর্থ হয় না। এবার তাকে কোনো একটা কারখানায় ঢুকিয়ে, তারপর কিছুদিন গেলে একটা বিয়ে-টিয়ে দিয়ে আলাদা সংসার ক'রে দিতে পারলেই ভালো হয়।

তবু সেই দাদার কাছে থেকেই অতীন অসম্ভব বাধার স্রোত ঠেলে ঠেলে পড়াশোনা চালিয়ে গেছে। টিউশনি ক'রে পড়ার খরচ সংগ্রহ করেছে। নানাভাবে দাদা বৌদির মন জুগিয়ে কোনোক্রমে বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত থেকেওছে সেখানে। কিন্তু তারপর থাকা আর সম্ভব হয়নি।

বৌদির দুর্ব্যবহারই শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য, তাকে অপদস্থ করার জন্য বৌদি যে কতরকম উপায় উদ্ভাবন করতো তা' ভাবতেও ক্লেশ বোধ হয়। যথেষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও তাই কিছু কিছু খিটিমিটি প্রায়ই মাঝে মাঝে লাগতো। একদিন সেটাই গিয়ে চরমে উঠলো।

ব্যাপার অবশ্য সামান্যই। বি-এ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরদিন সকালে সে গিয়েছিল এক বন্ধুর বাড়ি। অনেকদিন পর পড়াশোনার চাপ নেই। মনটা বেশ হাল্কা ছিল। বন্ধুরও তাই। গল্পে গল্পে কখন অনেক বেলা হয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। বাড়ি ফিরতে প্রায় দুপুর হয়ে গিয়েছিল। একে বাজার ক'রে যায়নি, তায় এই দেরি। বৌদি একেবারে রণচণ্ডী মূর্তিতে দেখা দেয়।

অতীনের অবশ্য বৌদির এ রকম ব্যবহার সহ্য করা ভালোমতই অভ্যাস আছে। তাই সে যথারীতি চুপ ক'রেই ছিল। কিন্তু সেদিন বৌদি তার মায়ের সম্বন্ধে কিছু বক্রোক্তি করায় সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। ফলে তুমুল কাণ্ড বেধে যায়।

অভুক্ত অবস্থায় এক রকম শূন্যহাতেই সে বাড়ি থেকে বার হয়ে আসে। কয়েকটা দিন তখন তার কীভাবে যে কেটেছে তা বলার নয়। লজ্জায় ও অভিমানে আত্মীয়স্বজন কারো বাড়িতেই সে যায়নি। গেলেও, এক আধ সন্ধ্যা আহার ও বাড়ি ফিরে যাওয়ার সদুপদেশ ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা হতো বলে তার মনে হয় না। তারচেয়ে কোনো রকম একটা চাকরি বা আস্তানার চেষ্টায় প্রায় অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোও সে শ্রেয় মনে করেছে। বস্তুত কয়েকদিন সে তা-ই করেছে। তবু কোনো একটা ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত একদিন পথে তার বাল্যবন্ধু বিনয় রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তার মলিন বেশবাস ও রুক্ষ চেহারা দেখেই বোধ হয় বিনয় সব আন্দাজ করতে পারে। জোর করে তাকে তার মেসে নিয়ে যায়। এবং সেখানেই তার সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেয়।

সেই হতে এই ক'বছর সে বিনয়ের সঙ্গেই আছে। অবশ্য এখনো সে বেকার। এক আধটা টিউশনি ক'রে যা' পায় তাইতেই কোনো-ক্রমে চালাতে হয়। মাঝে মাঝে আবার তা-ও থাকে না। তখন বিনয়ের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়।

অতীন একটু থামে। ডক্টর ব্যানার্জি ব্যথিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। বলেন,—'এ সব কথা তো আমায় কিছুই জানাও নি। আমার সামর্থ্য অবশ্য সামান্যই। তবু জানলে কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতাম।'

অতীন নতমুখে চুপ করে থাকে।

ইতিমধ্যে ডক্টর ব্যানার্জির মেয়ে চা ও খাবার দিয়ে যায়। ডক্টর ব্যানার্জি নিজের হাতে প্লেটটা অতীনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সস্নেহে বলেন,—'নাও, খেয়ে নাও।'

অতীন নীরবে খাবারের প্লেটটা টেনে নেয়।

ডক্টর ব্যানার্জি বলেন,—'তোমার বন্ধু বিনয় রায় কী করেন?'

চায়ে চুমুক দিতে দিতে অতীন বলে,—'সামান্য কেরানীর কাজ করে।'

—'ছেলেটিকে তো বেশ ভালো মনে হচ্ছে।'

—'ভালো?—এমন ছেলে জীবনে আমি আর একজনও দেখিনি!'—বন্ধুর কথা বলতে গিয়ে আবেগে অতীনের মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। বলে,—'বিনয় এক অদ্ভুত ধরণের ছেলে। তার কাছে সাহায্য নিতে কেউ তেমন লজ্জাবোধ করে না। কারণ সে বুঝতেই দেয় না যে কারো উপকার সে করছে। পাছে আমি তার কাছে থাকার জন্য কোনো সংকোচ বোধ করি সেই জন্য সে প্রায়ই আমাকে বলে, 'তুই ছিলি বলে আমি বেঁচে গেলাম অতীন। তবু দুটো মন খুলে কথা বলতে পারি। এখানে আর কারো সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই না। তোর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে না পারলে এখানে বেশি দিন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।'—অথচ প্রকৃতপক্ষে কথাবার্তা বলার সময়ই তার নেই। সব সময়ই সে অপরের কাজে ব্যস্ত।—অপরের দুঃখ কষ্ট সে সত্যিই হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। বাস্তবে সত্যি সত্যি কোনো ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অন্যমানুষের জন্য নিজের সুখশান্তি বিসর্জন দিতে পারে এটা বিনয়কে না-দেখলে আমি কোনোদিন ভালোভাবে বিশ্বাস করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

ডক্টর ব্যানার্জি বলেন,—'তোমার এই বন্ধুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসায় তোমার পক্ষে অন্যদিক থেকেও ভালো হয়েছে, কী বলো। ওর জীবন থেকে তুমি যথেষ্ট প্রেরণা পাচ্ছো। এর ফলে ভবিষ্যতে তুমিও অপরের জন্য সত্যিকার বড় কাজ করতে পারবে।'

'—আমি? আমার দ্বারা কিছু হবে না।'—অতীন হতাশামিশ্রিত কণ্ঠে বলে।—'আমি কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক তো বটেই, তাছাড়া বিনয়ের মত সবল মন আমি কোথায় পাবো? মনের দিক হতে আমি বড়ই দুর্বল। বিশেষত এই চার বছর বেকার জীবন কাটিয়ে আমার যেটুকু মনোবল ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেছে। আত্মবিশ্বাস একেবারে হারিয়েছি। আর সেইজন্য বোধ হয় কেমন একটা হাল-ছাড়াভাব ও পরাজিতের মনোভাব দেখা দিয়েছে আমার মধ্যে।'

ডক্টর ব্যানার্জি আশ্বাস দিয়ে বলেন,—'ও সব কিছু নয়। কর্মক্ষেত্রে নামলে ওসব দূর হয়ে যাবে।'

—'কর্মক্ষেত্র?' অতীন একটু মৃদু হাসে।—'এই চার বছরে একটা সাধারণ চাকরিই জোটাতে পারলাম না,—আমার আবার কর্মক্ষেত্র!'

ডক্টর ব্যানার্জি বলেন,—'কেন হতাশ হচ্ছো। চাকরি না-জুটেছে ভালোই হয়েছে। চাকরি মানে তো শ' খানেক টাকার কেরাণীর চাকরি। ও' হয়তো আমিও তোমাকে একটা জুটিয়ে দিতে পারি। —কিন্তু আমার ইচ্ছে তা' নয়। আমার একান্ত ইচ্ছে তুমি আবার পড়াশোনা করো। ভালোভাবে এম, এ-টা পাশ করে রিসার্চ করো।'

ম্লান হেসে অতীন বলে,—'সে-ইচ্ছা যে আমারও কত ছিল তাতো আপনি জানেন। কিন্তু তা' আর কী করে হবে!'

—'হতে পারে।'—ডক্টর ব্যানার্জি কী যেন ভাবেন। সামনের সংবাদপত্রটা একটু নাড়াচাড়া করেন। তারপর কী একটা সংবাদের ওপর চোখ পড়ায় মনে মনে সংবাদটা একটুক্ষণ পড়েন। একটু পর চোখ তুলে সেই সংবাদ সম্পর্কেই হয়তো হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসেন—'আচ্ছা অতীন আধুনিক মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার কী রকম ধারণা?'

—'ধারণা !……আমার ?'—অতীন আমৃতা আম্‌তা করে। সে বড় মুস্কিলে পড়ে যায়। কী বলবে ভেবে পায় না।

—'আচ্ছা যাক ও' কথা। তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।'—ডক্টর ব্যানার্জি আবার সংবাদপত্রটির ওপর চোখ রাখেন। তারপর সেইভাবে চোখ রেখেই বলেন,—'ধরো, একটি মেয়ে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার ফলে একজনকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে। একেবারে ঐকান্তিক ভালোবাসা। তার নিষ্পাপ তরুণ কুমারী মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ভালোবেসেছে। তার ধারণা বিয়ে তাদের হবেই। তার অন্যথা হতেই পারে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো তার অন্যথাই হলো। অভিজ্ঞতার অভাবে না বুঝে সে যাকে ভালবেসেছে সে একটা পশু। মেয়েটিকে তার ভালবাসার অভিনয়ে ভুলিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে তার দেহ ভোগ করে একদিন সে সরে পড়লো।—এ রকম ঘটনা তো আজকাল কখনো কখনো শোনা যায়—কী বলো ?—কিন্তু ভাবো দেখি তখন মেয়েটির কী অবস্থা !—আচ্ছা, এই অবস্থায় মেয়েটিকে তুমি কি ঘৃণা করবে ?'—ডক্টর ব্যানার্জি অতীনের মুখের দিকে তাকান।

এবার অতীন আরো মুস্কিলে পড়ে। এ' ধরণের বিষয় নিয়ে খোলা-খুলিভাবে ডক্টর ব্যানার্জির সঙ্গে আলোচনা করতে তার কেমন সংকোচ হয়। সে চোখ নিচু করে শুধু বলে,—'ঘৃণা করবো কেন ?'

—'ঘৃণা করবে না ? সত্যি বলছো ?—কিন্তু সাধারণত তো তাই করে।'

টেবিলের ওপর আঙুলের দাগ টানতে টানতে অতীন বলে, 'সাধারণত কেন করা হয় তা' আমি বলতে পারি না। তবে আমি তো ঘৃণার কোনো কারণই দেখি না। মেয়েটি যদি ফ্লার্ট হতো এবং

একের পর এক বহুজনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো তাহলে অবশ্য তার সম্বন্ধে ঘৃণারই উদ্রেক হতো মনে। কিন্তু এ'ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মেয়েটি সে-রকম নয়। সে ঐকান্তিকভাবেই একজনকে ভালোবেসেছে এবং তাকে সে স্বামী বলেই ধরে নিয়েছে। শুধু বিয়ের মন্ত্রটা পড়া হয়নি—যা' দুদিন বাদে হবেই বলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস।—অবশ্য এ' ভাবে বিশ্বাস করে সে একটা মারাত্মক ভুল করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভুল করার জন্য কি কেউ কাউকে ঘৃণা করে?—ভবিষ্যতে সে যাতে এ'রকম ভুল আর না-করে সেজন্য তাকে অবশ্য যথেষ্ট সাবধান করে দেওয়াই উচিত। কিন্তু ঘৃণা করা হবে কেন?—ধরুন, অন্ধকারে ফুল তুলতে গিয়ে অভিজ্ঞতা বা সাবধানতার অভাবে কেউ যদি ঘাসে-ঢাকা ভাঙা কুয়োর মধ্যে প'ড়ে কাদা মাখে, হাত পা ভাঙে, তাহলে তাকে কি আমরা ঘৃণা করি? বরঞ্চ তার প্রতি আমাদের মনে সহানুভূতি ও করুণাই জাগ্রত হয়। তাকে সাহায্য করার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করি,—তাই না?'—অতীন ডক্টর ব্যানার্জির দিকে তাকায়। নিজের আবেগে এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে হঠাৎ তার বড় লজ্জা করতে থাকে। এ'ধরণের কথা এ'ভাবে ইতিপূর্বে ডক্টর ব্যানার্জির সঙ্গে তার আর কখনো হয়নি। সে একেবারে চুপ হয়ে যায়।

ডক্টর ব্যানার্জি কিছুক্ষণ অতীনের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। বোধহয় তার কথার সত্যতা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চান কিংবা এমনিই অন্যমনে তার মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবেন। এবং সেইভাবে ভাবতে ভাবতে আবার খবরের কাগজটার ওপর চোখ রাখেন। একটুক্ষণ নীরবে পড়ে যান। তারপর হঠাৎ একেবারে অন্য আর এক প্রশ্ন করে বসেন,—'আচ্ছা অতীন তুমি 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস' পড়েছো?'

অতীন সত্যিই বড় বিস্মিত হয়। এ'ধরণের এলোমেলো প্রশ্ন করার অর্থ ?—সে ভাবে, কোনো কারণে হয়তো আজ ডক্টর ব্যানার্জির মনটা স্থির নেই। সুতরাং আজ আর কোনো কাজের কথা হবে না। কাল-পরশু আবার আর একবার আসা যাবে।

—'কী পড়োনি ?'—ডক্টর ব্যানার্জি আবার প্রশ্ন করেন।

একটু ইতস্তত করে সসংকোচে অতীন বলে, 'অনেকদিন আগে—কিছু কিছু বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে পড়েছি। এখন আর ভালো মনে নেই।'

—'ভালো করে আবার পোড়ো। 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস' নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইংল্যাণ্ড যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের জন্য গর্ব করে, জেনো, রাসিয়াও তেমনি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের জন্য গর্ববোধ করতে পারে। বিশ্ব কথাসাহিত্যে 'ওঅর অ্যাণ্ড্ পীস' অতুলনীয়—বুঝলে।'

এর পর তিনি 'ওঅর অ্যাণ্ড্ পীস' সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন এবং সেই সঙ্গে আরো অনেকের সাহিত্য নিয়েও আলোচনা করেন। অতীন চুপচাপ শুনে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর যেন খেয়াল হয়। হঠাৎ বলে ওঠেন—'যাক এ' সব কথা। আর একদিন এ' সম্বন্ধে ভালো ভাবে আলোচনা করা যাবে।—এখন যে-কথা হচ্ছিল। তোমার পড়াশুনার ব্যবস্থার কথা।'—তিনি সংবাদপত্রটা ভাঁজ করে দূরে সরিয়ে রাখেন। তারপর অতীনের দিকে পরিপূর্ণ ভাবে তাকিয়ে বলেন,—'শোনো আমার এক বন্ধু কাল আমার কাছে এসেছিলেন।—সেই হতে তোমার কথা আমার বহুবার মনে হয়েছে। তুমি যে আজ হঠাৎ আমার কাছে এসেছো এটাকে আমি ভগবানের শুভ ইচ্ছা বলেই মনে করছি।—আমার এই বন্ধুর বাড়িতে থেকে তুমি নির্ভাবনায়

পড়াশোনা করতে পারো। সে যেমন ভালো লোক তেমনি তার অবস্থাও খুব ভালো।'

—ডক্টর ব্যানার্জি তাঁর বন্ধুর পরিচয় দেন।

অরবিন্দের সঙ্গে তিনি বি-এ পর্যন্ত পড়েছেন। বর্তমানে অরবিন্দ প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী। তাঁকে ধনীই বলা চলে একরকম,—অন্তত অবস্থাপন্ন তো বটেই। কলকাতায় তাঁর দুটি বাড়ি আছে। গাড়িও আছে। সাধারণ অবস্থা থেকে অরবিন্দ নিজের বুদ্ধি ও চেষ্টাতেই এই সব করেছেন। তাঁর বাবার ছিল রাধাবাজারে সামান্য খেলনার দোকান। অরবিন্দ সেই দোকান বিক্রি ক'রে দিয়ে বেন্টিঙ্ক্ ষ্ট্রীটে রীতিমত অফিস করে বসেন। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে খেলনা প্রভৃতি আমদানী ক'রে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তা' আবার পাইকারি-ভাবে বিক্রি করেন। তাঁর সততা ও কর্মদক্ষতায় তাঁর ব্যবসার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

অতীন বলে,—'সে তো বুঝলাম যে তিনি খুব সৎ এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। কিন্তু তিনি কেন আমার পড়াশোনার ব্যয় ভার বহন করবেন, আর আমিই বা কোন অধিকারে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করবো?'

'অধিকার?'—ডক্টর ব্যানার্জি বলেন—তুমি যদি তাঁর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করো তাহলেই সে অধিকার তোমার হবে।'

—'বিয়ে!'—অতীন একেবারে আকাশ থেকে পড়ে।

—'হ্যাঁ।'—ডক্টর ব্যানার্জি বলেন।—'তোমার মত সৎ, উদার, ও পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত একটি ছেলের সন্ধানই তিনি করছেন। অবশ্য তাঁর মেয়েও খুব সুন্দরী। শিক্ষিতাও।'

অতীনের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। সে সংশয়ের সঙ্গে বলে,—'কিন্তু কথা হচ্ছে,—দেশে এত সৎ-পাত্র থাকতে তিনি কেন

আমার সঙ্গেই তাঁর একমাত্র সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ের বিয়ে দিতে যাবেন ?'

—'তার কারণ তোমার মত সব দিক হতে তাঁর মনোমত পাত্র তিনি সহজে পাবেন না বলে।'—ডক্টর ব্যানার্জি একটু মৃদু হাসেন।—'কিন্তু সে-কথা যাক। তুমি বিয়ে করবে কি না?—আমার তো মনে হয় তোমার এই বিয়ে করাই উচিত। শুধু সামান্য পড়াশুনার সুবিধা নয়,—এর ফলে সবদিক হতেই তোমার খুব ভালো হবে।—আমি বলছি।'—আমির ওপর তিনি বেশ জোর দেন। একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বলেন,—'তারপর কী বলছো তুমি?'—তিনি অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অতীন কী বলবে ভেবে পায় না। এই অদ্ভুত অসম্ভব প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সে? তার মনে হয় ডক্টর ব্যানার্জি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন বলেই হয়তো তাকে এতটা যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেছেন। অরবিন্দ কিছুতেই তাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করবেন না। অবশ্য তার যে বিয়ে করার ইচ্ছা আছে তা' নয়। বিশেষত বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে শ্বশুরের টাকায় পড়া শোনার কথা সে ভাবতেই পারে না। সুতরাং সে মাথা নিচু করে শুধু বলে—'এ' সম্বন্ধে এখনই কিছু আপনাকে বলতে পারছি না স্যার,—যথেষ্ট চিন্তা করে দেখা দরকার।'

—'বেশ চিন্তা করো তুমি।'—ডক্টর ব্যানার্জি স্মিতমুখে বলেন।

কিন্তু চিন্তা করার আর তেমন সময় পায়নি অতীন। পরদিনই অরবিন্দ স্বয়ং তার মেসে এসে উপস্থিত হন।

বিকেল গোটা চারেক বোধ হয় হবে। ঘরে কেউ নেই। অতীন চা খাচ্ছে। এমন সময় পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছরের একজন ভদ্রলোক তার

খোঁজে ঘরে এসে ঢোকেন। তাঁর বেশবাস, ও গৌরবর্ণ পুষ্ট চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এমন মানুষের সঙ্গে অতীনের পরিচয় থাকার কথা নয়। সে কিছুটা বিস্মিতভাবে তাকায়।

অরবিন্দই প্রথমে কথা বলেন। অতীনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—'এটাই তো ছ'নম্বর রুম—তাই না?'

অতীন ঘাড় নাড়ে।

একটুক্ষণ অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য ইতস্তত করে অরবিন্দ বলেন,—'তুমিই কি অতীন?'

অতীন বলে,—'হ্যাঁ।'

অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে অতীনের পাশে বসে পড়েন। উষ্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে একটি হাত তার হাতের পরে রাখেন। তারপর আবেগের সঙ্গে বলেন,—'অবিনাশের কাছে তোমার কথা শুনে আমি এসেছি। আমাকে কিন্তু তুমি নিরাশ করতে পারবে না বাবা।'—তিনি অতীনের মুখের দিকে করুণভাবে তাকান।

অতীন খুবই বিস্মিত হয়। তখনো সে ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছে না। অরবিন্দ যে এ'ভাবে একেবারে তার কাছে এসে উপস্থিত হবেন তা সে ভাবতেই পারেনি।

অরবিন্দ অতীনের বিস্মিত মুখের দিকে মুহূর্তমাত্র তাকিয়ে বলেন,—'অবিনাশকে তুমি চিনলে না?—ডক্টর অবিনাশ ব্যানার্জি। আমার বিশেষ বন্ধু। তিনি তোমাকে আমার কথা কাল কিছু বলেননি?'

তখন অতীন বুঝতে পারে ইনিই অরবিন্দ। এঁর কথাই ডক্টর ব্যানার্জি কাল বলেছিলেন। অতীন অরবিন্দের দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহের দিকে একবার ভালোভাবে তাকিয়ে দেখে বলে,—'হ্যাঁ, বলেছিলেন।'

অরবিন্দ এবার অতীনের হাতটা চেপে ধরেন। সানুনয়ে বলেন,—'তোমাকেই বাবা আমার দায় উদ্ধার করতে হবে, আমার মেয়েকে গ্রহণ করতে হবে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরের অকৃত্রিম আবেগ অতীনের হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু তার বড়ই আশ্চর্য লাগে। সত্যিই অরবিন্দ তার কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চান? অরবিন্দকে একরকম ধনীই বলা চলে। অন্তত অতীন সেই রকমই শুনেছে। সেই অরবিন্দ অতীনের সঙ্গে তার একমাত্র সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের বিয়ে দিতে ইচ্ছুক! এটা কি বাস্তবিকই সত্যি? —ব্যাপারটা তার বড়ই রহস্যময় মনে হয়।—হঠাৎ তার গতকাল ডক্টর ব্যানার্জি সংবাদপত্র পড়তে পড়তে অপ্রাসঙ্গিকভাবে যে একটি প্রতারিতা মেয়ের কাহিনী বলেছিলেন সেই কথা মনে পড়ে যায়। তবে কি সেটা সংবাদপত্রের কোনো কাহিনী নয়? অরবিন্দের মেয়েরই ঐ অবস্থা?—অতীনের মন যেন বলে—হ্যাঁ তাই। ডক্টর ব্যানার্জির কাছ থেকে ও'রকম অবস্থায় পড়া মেয়ের প্রতি তার কীরকম মনোভাব জানার ফলেই বোধহয় অরবিন্দের এত আগ্রহ।—কিন্তু তখনো সে ব্যাপারটা ঠিকমত ধরতে পারছে না। পরে অবশ্য সমস্তই জানতে পারে। অরবিন্দ তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে অতীনকে নিয়ে গিয়ে সংক্ষেপে প্রায় সব কথাই বলেন। নতুন কিছু নয়। সেই পুরনো কাহিনীরই কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ।

অরবিন্দ তাঁর প্রাসাদোপম গৃহের তেতলায় একেবারে তাঁর নিজের ঘরে অতীনকে নিয়ে যান। অরবিন্দের মত অবস্থাপন্ন বা ধনীর গৃহের অভ্যন্তরে অতীন বড় একটা আসেনি। সে সংকোচের সঙ্গে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে।

ঘরটি বেশ মুল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো। দেওয়ালে দামী দামী

ফ্রেমে বাঁধানো বিরাট বিরাট কয়েকটি তৈলচিত্র ও ফটো। খাটের ওপর পুরু গদি পাতা। তার উপর কারুকার্য ক বেড-কভার। খাটের একপাশে একটি মাঝারি ধরণের ড্রেসিং টেবিল। তার সামনে কয়েকটি গদি-আঁটা চেয়ার। একটি বড় আরাম-কেদারাও আছে।

অরবিন্দ একটি চেয়ারে বসে অতীনকে সাদরে তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে দেন। একটু পর তাঁর স্ত্রী মহামায়া ফল ও মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত হন।

মহামায়াকে দেখে অতীন খুব বিস্মিত হয়। মহামায়া যেন সত্যিই মহামায়া। তেমনিই রূপ। দেবী ভগবতীর মতই স্নেহ-ঢলোঢলো স্নিগ্ধ জননীর মূর্তি। ছেলেবেলায় অতীন তার এক বন্ধুর বাড়িতে একটি বড় ছবি দেখেছিল। একজন বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা। কৈলাসবাসিনী জননী উমার ছবি। সঙ্গে শিশু কার্তিক। সেই ছবির উমার মুখের সঙ্গে যেন মহামায়ার মুখের মিল আছে। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বোধহয় বয়স হয়েছে মহামায়ার। কিন্তু মুখ দেখলে চট ক'রে সেটা বোঝা যায় না। বয়সের এতটুকু ছাপ পড়েনি তাঁর মুখে। দেহের সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান হয়নি। বয়স যেন তাঁর মুখে চোখে শুধুমাত্র মায়ের মহিমা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি।

মহামায়া সযত্নে নিজের হাতে ফল কেটে কেটে অতীনকে খেতে দেন। অনেক ফল। অতীন সব খেয়ে উঠতে পারে না। মহামায়া খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। সস্নেহে বলেন,—'এ কি বাবা, এই পেঁপেটা খেলে না! খুব মিষ্টি পেঁপে। একটু মুখে দিয়ে ছাখো।'

একখণ্ড পেঁপে মুখে দিয়ে অতীন সলজ্জে বলে, 'আর খেতে পারবো না। পেট ভরে গেছে।'—সে প্লেটটা একটু সরিয়ে দেয়।

মহামায়া মায়ের মত ব্যস্ত হয়ে বলেন,—'সে কি, পেঁড়া কটা

খাও। খুব ভালো পেঁড়া। দেওঘর থেকে আনানো। আমাদের জানা লোককে দিয়ে তৈরি করিয়েছি।—অন্তত দু'টো মুখে দাও বাবা।'

মহামায়ার এই মায়ের মত সস্নেহ ব্যবহার অতীনের ভারি ভালো লাগে। শৈশবে সে মাকে হারিয়েছে। এমনিভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে পীড়াপীড়ি ক'রে কেউ তাকে কোনোদিন খাইয়েছে ব'লে তার মনে পড়ে না।

সে একটা পেঁড়া তুলে নিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে থাকে।

অরবিন্দ কিছু খান না। পূর্বেই তিনি চা খেয়ে বার হয়ে ছিলেন। তিনি নিজের মনে শুধু চরুটে টান দিতে থাকেন। চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরের একটা দিক তিনি অন্ধকার ক'রে ফেলেন। হঠাৎ একসময় দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা বড় ছবি দেখিয়ে বলেন,—'বাবা, এই হচ্ছে আমাদের মেয়ে শান্থর ফটো।'

অতীন কৌতূহলী হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য সেদিকে তাকায়। তারপর তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়। নিমেষের দৃষ্টিতেই সে বুঝতে পারে যে মেয়েটি সত্যিই খুব সুশ্রী। অবশ্য মহামায়ার মেয়ে সুশ্রী হবে এতে আর আশ্চর্য কী!

অরবিন্দ অকারণে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বলেন—'হ্যাঁ, তোমাকে সব কথা খুলেই বলি। অবিনাশের কাছে তুমি হয়তো কাল কিছুটা আভাস পেয়েছো।'—ধীরে ধীরে সমস্তই বলে যান তিনি।

শান্থ অর্থাৎ সুমিতা তাঁদের একমাত্র সন্তান।—অরবিন্দ বলা শুরু করেন।—বলা নিষ্প্রয়োজন যে সে খুব আদর-যত্নে মানুষ হয়েছে। তাকে সব রকমের স্বাধীনতাই দেওয়া হয়েছে। বাংলায় অনার্স নিয়ে

বি-এ পাস করার পর এম-এ পড়ছিল সে। এই কয়েকদিন পূর্বে সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে।

আর পাঁচটা শিক্ষিত আধুনিক পরিবারে যেমন অরবিন্দের পরিবারেও তেমনি। স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ আছে তাঁর বাড়িতে। তিনি এটাকে বিশেষ স্বাস্থ্যকর মনে করেন। কেই বা করে না আজকাল। সন্ধ্যায় তাঁর ড্রইং রুমে প্রায় নিয়মিত আসর বসে। চা পানের সাথে সাথে আলাপ আলোচনা গান গল্প সবই চলে। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে স্বজন-বন্ধুরা অনেকেই আসেন।

সান্ধ্য আসরে যোগদানকারী এই সব স্বজন-বন্ধুদের মধ্যে সুজয় ডাক্তারও একজন। এই সুজয়ই তাঁর সর্বনাশ করেছে।

বলতে বলতে অরবিন্দের দৃষ্টি কঠোর হ'য়ে ওঠে। হাতের কাছের পেপার-ওয়েট্‌টা তিনি অকারণে চেপে ধরেন।

অতীন নীরবে শুনতে থাকে।

অরবিন্দের এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে সুজয় এ'বাড়িতে প্রথম আসে। এসে প্রথম দিন থেকেই, একরকম পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার চটক ও চাতুর্যে প্রায় সকলের মন হরণ ক'রে ফেলে। এক ধরণের লোক আছে যারা একেবারে অন্তঃসারশূন্য; কিন্তু তাদের সাজ-পোষাক কথায় বার্তায় এমন চটক ও ভড়ং যে সেটা চট ক'রে ধরা যায় না। সুজয়ও এই দলের। তার স্মার্ট চেহারা ও কথাবার্তার চমকে সে প্রায় সকলকেই ভুলিয়ে দেয়। তার ফলে তার পরিচয়টাও ভালো ক'রে জানার চেষ্টা তাঁরা কেউ করেননি। সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, অবিবাহিত, ডাক্তার—শুধু এই পরিচয়টুকুতেই তাঁরা তৃপ্ত ছিলেন। অবশ্য এ'-জানাও যে প্রায় সম্পূর্ণ ভুল সেটাও পরে জানা যায়।

ইদানীং এই সুজয়ের সঙ্গে সুমিতার মেলামেশাটা কিছু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে উঠেছিল। এটা তাঁদের তেমন ভালো লাগতো না। কিন্তু শিক্ষিতা ও বয়স্কা মেয়েকে কিছু বলতেও তাঁরা সাহস পাননি। অবশ্য ভিতরে ভিতরে যে ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে তা তাঁরা কেউ-ই বুঝতে পারেননি। সেটা পারলে নিশ্চয়ই এই দুর্ঘটনা রোধ করা হতো। অন্তত সুজয় সম্বন্ধে ভালোভাবে খোঁজ খবর তো নেওয়া হতোই। কিন্তু ভালোভাবে না-বোঝার দরুণ কিছুই তখন করা হয়নি।

সুমিতার কাছে অবশ্য এটা দুর্ঘটনা ছিল না। যদিও সুজয় তাদের পালটি ঘর নয় তবু সে নিশ্চিত জানতো যে সুজয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবেই।—আর সত্যি কথা বলতে কী, সুজয়টা যদি একটা স্কাউণ্ড্রেল না-হতো তাহলে বিয়ে তাদের হতোও,—জাতের বাধায় তা' আটকাতো না। আজকাল কে-ই বা ও'সব মানে।

—'কিন্তু সুজয়টা একটা জানোয়ার—একটা ভেরিটেবল্ রোগ।'—দাঁতে দাঁত ঘষেন অরবিন্দ। ক্রোধে তাঁর মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। তারপর একটু শান্ত হলে আবার বলে যান।

সুমিতাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কী, সেতো ছেলে মানুষ, সংসারের কতটুকুই বা জানে, সমস্ত দোষ তাঁদেরই। তাঁরা তো ছেলেমানুষ নন, তাঁরা অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন। পূর্বেই তাঁদের সুজয় সম্বন্ধে ভালোভাবে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই তাঁরা করেননি, কিছুই বোঝেননি, এমনি নির্বোধ তাঁরা।

সুমিতার মনে অবশ্য সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে-কথা সে সুজয়কে জানায় এবং তাড়াতাড়ি বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয়। সেটাই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু স্কাউণ্ড্রেলটা সে-কথা

শোনার পর হতেই রহস্যজনকভাবে উধাও হয়। সুমিতা কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু উদ্বেগ ও আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়ে।

ব্যাপারটা মেয়ের মার কাছে বেশিদিন চাপা থাকে না। মেয়ের পীড়িত চিন্তিত মুখ দেখেই তাঁর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। অবশেষে একদিন রাত্রে অন্ধকার ঘরে মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দু'চারটে প্রশ্ন করতেই সব জানা যায়। মায়ের কোলে মুখ গুঁজে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে সে। ধীরে ধীরে সব কথাই খুলে বলে।—কিন্তু তখন খুবই দেরি হয়ে গেছে।

অরবিন্দ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সামান্য একটু থেমে আবার বলে যান।

এর পর তিনি অনেক খোঁজ করে নিজে গিয়ে সুজয়ের বাবার সঙ্গে দেখা করেন। তখন সুজয় সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানা যায়।

সুজয় ইতিপূর্বেই বিয়ে করেছে। সুজয়ের বাবার অবস্থাও ভালো নয়। শ্বশুরের টাকায় সে ডাক্তারী পড়েছে এবং শ্বশুরের টাকাতেই সে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার তোড়জোড় করছিল। খুব সম্ভব তার ইংল্যাণ্ড যাত্রার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে সুমিতা তাকে তার আশঙ্কার কথা জানায় এবং তাড়াতাড়ি বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে সে বম্বে চলে যায়। তারপর এই কিছুদিন হলো সে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেছে। এখন আর তাকে ভারতের মাটিতে পাওয়া যাবে না। এখন সে ইংল্যাণ্ডের পথে সমুদ্র বক্ষে।

একটু থামেন অরবিন্দ। কী যেন ভাবেন। সামনে টেবিলের 'পরে রক্ষিত পেপার-ওয়েটটা অকারণে একটু নাড়াচাড়া করেন। তারপর আবার বলা শুরু করেন।

এ'সব কথা সুমিতাকে না-জানিয়ে উপায় ছিল না। সুজয় সম্বন্ধে

সব কথাই তাকে জানানো হয়। প্রথমে সে অবশ্য কিছুই বিশ্বাস করে না। পরে সব বুঝতে পারে। তখন তাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে এই কেলেঙ্কারি ঢাকার জন্য অন্য কাউকে বিয়ে করতে বলা হয়। কিন্তু সে কথায় সে একেবারে কান দেয় না।

এই ঘটনার আঘাতে সে প্রায় পাগলের মত হয়ে ওঠে। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। কখনো খায়, কখনো খায় না। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে একাএকাই দিন কাটাতে থাকে। ডাকলে সাড়া দেয় না। বন্ধ ঘরের মধ্যে দিনরাত কী যে সে ক'রে তাঁরা ভালোভাবে বুঝতে পারেন না। তবে কান্নাকাটি সে একেবারে করে না। সেইজন্য তাঁরা আরো বেশি শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের আশঙ্কা হয় সুমিতা হয়তো আত্মহত্যার সংকল্প করেছে। দিবারাত্র তারা ভয়ে সারা হয়ে থাকেন।—ওঃ, কী দিনই গেছে তখন তাঁদের!

অবশেষে ধীরে ধীরে অনেক বুঝিয়ে, অনেক অনুরোধ উপরোধ ক'রে, সুমিতার মা অনেক কান্নাকাটি ক'রে শেষ পর্যন্ত কোনোক্রমে সুমিতাকে বিয়ে করতে রাজী করান। সুমিতা বলে যে পাঁচজনের কাছে তাঁদের মাথা যাতে হেঁট না-হয় সেজন্য শুধু সে নামেমাত্র বিয়ে করতে প্রস্তুত আছে। বিয়ের সব রকম অনুষ্ঠান হোক তাতে তার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যাঁর সঙ্গে তার বিয়ে হবে তাঁর সঙ্গে তার কখনো স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ থাকবে না। এমন ব্যক্তির সঙ্গে তাকে বিয়ে দিতে হবে যিনি কখনো তাকে স্ত্রীর মত গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন না। এ'প্রতিশ্রুতি তাঁকে আগে থেকেই দিতে হবে।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামেন অরবিন্দ। একটু যেন হাসার চেষ্টা করেন তিনি। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মত মৃদুস্বরে বলেন,—'এ অদ্ভুত, অসম্ভব কথা। এ'কখনো হয়?'—আবার তিনি একটু শুষ্ক

হাসি হাসেন। ঘাড় হেঁট ক'রে টেবিলের পরে পেপার-ওয়েটটা নাড়তে নাড়তে তেমনি আপন মনে বলে চলেন,—'শানু যে এ'কথা বলেছে এটা এই দুর্ঘটনার ফলে তার মনে যে বিশ্রী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তারই জন্য। এই ভাব বেশিদিন স্থায়ী হবে না। বিয়ের পর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তিনি একবার অতীনের মুখের দিকে তাকান তারপর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে কী যেন ভাবেন।

বাইরে থেকে ফুর ফুর করে শীতল হাওয়া আসে। কথা বলতে বলতে কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হয়েছে। আকাশে অসংখ্য তারার ভিড়। সেই দিকেই অরবিন্দের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

কিছুক্ষণ পর আবার অতীনের দিকে মুখ ফিরিয়ে অরবিন্দ বলেন, —'সংক্ষেপে তোমায় তো সব কথাই বললাম। এখন…'

একটু ইতস্তত করেন তিনি। আবেগে তাঁর মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলেন,—'এখন,…এই অবস্থায় তুমি যদি বাবা আমাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা করো,…শানুকে বিয়ে ক'রে এই অবাঞ্ছিত সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করো,…আমি বড়লোক নই, তবু কলকাতায় আমার দুখানা বাড়ি আছে, একখানা বাড়ি আমি তোমার নামে লিখে দেবো।'

অতীন একমনে সব শুনছিল। বাড়ি দেওয়ার কথায় তার চমক ভাঙে। কেমন বিশ্রী লাগে। বাড়ির লোভ তাকে দেখাতে চান অরবিন্দ? সে দরিদ্র বলেই কি এই প্রলোভন দেখানো? সে অপমানিত বোধ করে।

—'না না, বাড়িটাড়ির কথা থাক। দয়া ক'রে ওসব কথা বলবেন না।'—অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতীনের কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ পায়।

অরবিন্দ বিস্মিত হন।—'কেন কী হয়েছে এতে?' তারপর ব্যস্তভাবে বলেন,—'তুমি অন্য কিছু ভেবো না বাবা। তোমার মত ছেলেকে যে ঘুস দেওয়া যায় না তা' আমি বুঝি। এটা শুধু তোমার ভবিষ্যতের সিকিউরিটির একটা আভাস দেওয়া।—তাছাড়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন সরূপ কিছু উপহার কি আমরা তোমাকে দিতে পারি না,—কিংবা ধরো জামাইকে কি মানুষ যৌতুক দেয় না?—কিন্তু যাক সে কথা। তোমার যদি নেওয়ায় আপত্তি থাকে আমরা পীড়াপীড়ি করবো না। তোমার কোনো ইচ্ছায় আমরা বাধা দিতে চাই না। কিন্তু যে করে হোক তোমাকে আমাদের চাই।—তোমাদের প্রফেসর ডক্টর ব্যানার্জি যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সেতো তুমি তাঁর মুখেই শুনেছো। তিনি তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাকে বলেছেন। ঠিক তোমার মত একটি ছেলেই আমি খুঁজছিলাম। কিন্তু পাবো যে এমন আশা করিনি। ভগবান দয়া ক'রে তোমাকে এনে দিয়েছেন। তোমাকে কি আমরা ছাড়তে পারি?—ছাখো, শান্থ আমাদের একমাত্র সন্তান। তাকে তো আর যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারি না। আজ এ'বিয়ে যেমনই দেখাক, আজ এর প্রয়োজন প্রধানত যার জন্যই হোক, ভাগ্য প্রসন্ন হলে এরই ফল ভবিষ্যতে অত্যন্ত শুভ হবে। অন্তত আমরা বাপ-মায়েরা সে-আশা একেবারে ত্যাগ করতে পারিনা।'

চুপ করেন অরবিন্দ। একটু ক্ষণ অতীনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার বলেন,—'কিন্তু যাক ও'কথা। ভবিষ্যতে যা' হয় হবে। সে ভগবানের ইচ্ছে। এখন বর্তমানের কথা বলি। আমি অবিনাশের কাছে শুনেছি তোমার এম-এ পড়ার খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা' হয়নি।—এখন তুমি আমাদের কাছে থেকে পড়াশোনা করো। ইচ্ছে করলে পরে তুমি বিদেশে গিয়েও

পড়াশোনা চালাতে পারো। তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় কেউ বাধা দেবে না।'

অতীন প্রলুব্ধ হয়। এই একটা বিষয়ে তার বিশেষ দুর্বলতা। আগের দিন ডক্টর ব্যানার্জির কাছে এই প্রস্তাব শুনেও সে মনে মনে কিছুটা লুব্ধ হয়েছিল। অনেক কথা তার মনে হয়। ভালোভাবে এম-এ পাস ক'রে সে চলে যাবে ইংল্যাণ্ডে রিসার্চ করতে। তারপর সেখান থেকে একদিন ডক্টর হ'য়ে ফিরবে।—ওঃ, এ'কথা ভাবতেও তার রোমাঞ্চ হয়। এতখানি আশা সে কোনোদিনই করেনি। শুধুমাত্র ভালোভাবে এম-এ পর্যন্ত পড়ার গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। কিন্তু সে সুযোগ সে পায়নি। শুধু বাধা আর বাধা, বিঘ্ন আর বঞ্চনা। এর-ই মধ্যে দিন কেটেছে তার। শেষ পর্যন্ত কী ক'রে যে সে বি-এ পর্যন্ত পড়াশোনা চালালো সেটাই তার কাছে এক আশ্চর্য ব্যাপার। অবশ্য পরীক্ষার ফল কোনোদিন আশানুরূপ হয়নি। সাধারণভাবে পাস করেছে সে। সে-জন্য তার মনে যে কী দুঃখ তা' শুধু সে-ই জানে।

কিন্তু তাই বলে কি এইভাবে বিয়ে করা চলে? তা' ছাড়া বিয়ের কথা ভাবতেই তার বিশ্রী লাগে। মেয়েদের সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিরূপভাব জন্মে গেছে তার মনে। এটা হয়েছে তার বৌদির জন্য। মেয়েদের কথা মনে হ'লেই তার বৌদির হীনতা নীচতা ও সঙ্কীর্ণতার কথা মনে পড়ে যায়। বৌদি ছাড়া জীবনে আর কোনো নারীর সংস্পর্শে সে আসেওনি কোনোদিন। সে-জন্য মেয়েদের প্রতি তার পুরুষমনের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকলেও সেই সঙ্গে সবসময়ই একটা ভয় ও ঘৃণার ভাবও জড়িয়ে থাকে। যে-নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার পরিচয় সে বৌদির মধ্যে দেখতে পেয়েছে তা' কোনোদিন ভুলবার নয়। তার বৌদি শুধু যে তার সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করেছে তাই নয়, তার

স্থূলরুচির লজ্জাহীন প্রকাশে ও নির্বোধ যুক্তিহীন বাক্যের আঘাতে তার দাদার জীবনকেও প্রায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলতে সে দেখেছে।—তবে সব মেয়েই যে তার বৌদির মত হবে তার কোনো কথা নেই। কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা তো রয়েছে। অবশ্য এ'ক্ষেত্রে এ'সব প্রশ্ন আসে না। কারণ এটা তো আর সত্যি সত্যি বিয়ে নয়। কিন্তু এ'ক্ষেত্রে এঁদের বিপদ্-মুক্ত করার জন্য যদি সে নামেমাত্র বিয়েতে রাজী হয়ও তাহলে বিনিময়ে সে কোনো সুযোগই নিতে পারে না। সে দরিদ্র। তাতে তার আত্মসম্মান বজায় রাখা সম্ভব হবে না।—অতীন চিন্তা করে। না না, তা কখনো সম্ভব নয়।

অতীনকে নিরুত্তর দেখে অরবিন্দ যেন কী ভাবেন। তারপর হঠাৎ বলেন,—'একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি বাবা। এই দুর্ঘটনার জন্য শানুর প্রতি কি তোমার মনে কোনো ঘৃণার ভাব জন্মেছে?'

অতীন অপ্রতীভ হয়। সেই পুরনো প্রশ্ন। ডক্টর ব্যানার্জি কৌশলে যা কাল তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সে তাড়াতাড়ি বলে —'ছিছি, এ'কথা বলছেন, কেন? ঘৃণার কোনো প্রশ্নই আসে না।' —সে আন্তরিকভাবেই কথাটা বলে। কালও সে তার অকৃত্রিম মনোভাবই ব্যক্ত করেছিল। সে বলে—'আপনার মেয়ে জীবনে একটা বড় ভুল করেছেন,—অন্যায় তো কিছু করেননি। অন্যায় করেছে আর একজন। তিনি প্রতারিত হয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁর প্রতি ঘৃণা জন্মাবে কেন? তাঁর প্রতি সহানুভূতি জাগাই স্বাভাবিক।'

অতীনের কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় অরবিন্দ সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হন। প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েন। একটু পরে বলেন,—'বাবা সত্যিই তোমার মন খুব উন্নত।—অবিনাশ ঠিকই বলেছে।'—অতীনের দিকে

তিনি সস্নেহে তাকিয়ে থাকেন। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলেন,—'তা-ই যদি হয় তাহলে তুমি ইতস্তত করছো কেন? আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, শানুর এই অসুস্থ মানসিক অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হবে না। বিয়ের পর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের জীবন খুবই সুখের হবে। শানু খুব ভালো মেয়ে। তাছাড়া তোমার মত ছেলেকে ভালো না-বেসে কি কেউ থাকতে পারে।'

অতীন লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি বলে,—'সে-কথা আমি চিন্তা করছিনা। বিয়ে করার ইচ্ছেই আমার কোনোদিন ছিল না। কখনো বিয়ে করবো না ঠিক করেছিলাম। যে-কোনোরকম বন্ধনের মধ্যে যেতেই আমার অনিচ্ছা। তাই মন দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে।'

—'বন্ধন কিসের?'—অরবিন্দ বলেন।—'এখন তো নামে মাত্র বিয়ে হচ্ছে। তারপর ভবিষ্যতে জোর ক'রে তোমাকে তো কেউ কিছু করতে বাধ্য করবে না। জোর করে কিছু করার ব্যাপারও এটা নয়। তুমি নিজের মনে থাকবে। পড়াশোনা করবে। তোমার কোনোরকম স্বাধীনতায় কেউ কখনো হস্তক্ষেপ করবে না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।'

অতীন চুপ ক'রে থাকে। কোনো কথা বলে না।—তাই কখনো হয়? যে-রকমেরই হোক, বিয়ে যখন তখন একটা বন্ধন তো বটেই। —সে নানা কথা চিন্তা করে।

অরবিন্দ আবার বলেন,—'তাছাড়া মানুষের বিপদে সাহায্য করা কি মানুষের কর্তব্য নয়?'—তিনি এবার পরিপূর্ণভাবে অতীনের চোখের দিকে তাকান।

অতীন চোখ নামিয়ে নেয়। কথাটা তার অন্তর স্পর্শ করে। কাল সে নিজেই এই ধরণের কথা ডক্টর ব্যানার্জিকে বলেছিল। সে

তেমনি চোখ নিচু করেই বলে,—'নিশ্চয়ই কর্তব্য। কিন্তু আমার কি সে শক্তি আছে!—তাছাড়া আরো কথা রয়েছে।'—সে এবার সরলভাবে তার মনের কথা খুলে বলে,—'আপনি যা-ই বলুন, নিজেকে আপনি বড়লোক মনে না-করলেও আমাদের মত মানুষের চোখে আপনি রীতিমত ধনী। অথচ আমি দরিদ্রের মধ্যেও দরিদ্র। এমন কি বর্তমানে আমি উপার্জনশীলও নই। এ' অবস্থায় এই বিয়ে হলে এখন আপনাদের ওপর আমায় নির্ভর করতে হবেই। তার ফলে আমার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত পীড়িত হবে। মনে আমি একেবারে শান্তি পাবো না।'

—'কেন শান্তি পাবে না!'—অরবিন্দ বিস্মিত হন।—'আমরাই তো তোমার কৃপার পাত্র।—নির্ভর করার কথা কী বলছো তুমি। আমাদের কাছ হতে তুমি সামান্য যা নেবে সেতো প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই দেওয়া। আমাদের বাঁচাবার জন্যে, আমাদের মনে শান্তি দেওয়ার জন্যই তো তোমার এই নেওয়া।—ও সব কথা তুমি কেন ভাবছো বুঝি না। ও'সব তুমি ভেবো না। আর কোনো দ্বিধা কোরো না বাবা। তুমি বিয়েতে রাজী হও। এখন আমাদের মানসম্ভ্রম বাঁচাও।'—তিনি আকুলভাবে অতীনের হাতদুটো চেপে ধরেন।

ব্যাপারটা রীতিমত নাটকীয়। অতীন বেশ প্রভাবিত হয়। ভালোভাবে সমস্ত বিষয় যেন আর চিন্তা করতে পারে না। তবু তার মনে হয় এ'ভাবে একটি ধনীর মেয়ের সঙ্গে নিজেকে চিরদিনের জন্য বেঁধে ফেলা কি ঠিক হবে? অরবিন্দ যা'-ই বলুন এটা একরকমের বন্ধন তো বটেই।—আর এই অভিনয়? এ-ও কি সারা জীবন সম্ভব?—তাছাড়া কে জানে সুমিতা কেমন? তার কাছে-কাছেই তো থাকতে হবে তাকে।—দ্বিধা তার কিছুতেই যেতে চায় না। চোখ তুলে বলে,—'আমাকে কয়েকদিন ভাববার সময় দিন।'

ক্লান্তকণ্ঠে অরবিন্দ বলেন—'ভাববার আর সময় নেই। তুমি তো সবই বোঝো। আর দেরি করা চলে না। তুমি দয়া করে রাজী হও।'—আরও কী বলতে গিয়ে তিনি থেমে যান। তারপর কিছুদূরে উপবিষ্ট মহামায়ার দিকে তাকিয়ে বলেন,—'এঁর দিকে চেয়ে ছাখো বাবা। তোমার মা নেই। ইনি তোমার মায়ের মত। সত্যি কথা বলতে কী আমাদের প্রথম সন্তান বেঁচে থাকলে তার বয়স তোমার মতই হতো।—তুমি তোমার এই মায়ের কথা ভেবে রাজী হয়ে যাও বাবা।'

অতীন মহামায়া দেবীর দিকে আবার চেয়ে দেখে। সত্যিই মায়ের মত। স্নিগ্ধ শান্ত জননীর মূর্তি।—কিন্তু তার মা কি এত সুন্দরী ছিলেন?—অতীন ভাবে। এই অবস্থাতেও কেন জানি এ'কথা মনে হয় তার।—কেমন দেখতে ছিলেন তিনি? কিছুই তার মনে পড়ে না। অতি শৈশবে তার মা মারা গেছেন। আব্‌ছা আব্‌ছা শুধু এক নারীমূর্তি চোখের সামনে ভাসে। একটু দীর্ঘাঙ্গী। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। আর কিছু না। আর সব ধোঁয়া ধোঁয়া।—একবার তার খুব জ্বর হয়েছিল। মা তাকে কোলে শুইয়ে কোল নাচিয়ে নাচিয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলেন। এটা অতীনের বেশ মনে আছে। কিন্তু তাঁর মুখটা কিছুতেই মনে পড়ে না। তবু কী জানি কেন তার মনে হয় তার মায়ের চোখদুটি যেন অনেকটা মহামায়ার মতই ছিল। অতীন মহামায়ার চোখের দিকে তাকায়। তাঁর আয়ত চোখের করুণ বিষণ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মেলে।

মহামায়া নীরবে এগিয়ে আসেন। নিঃসংকোচে অতীনের কপালের কাছে ঝুলে পড়া কয়েকটি চুল সযত্নে সরিয়ে দেন। তারপর সস্নেহে তার পিঠের 'পরে একটি হাত রাখেন। নীরবেই তাঁর চোখ দিয়ে

তু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।—সেকি তাঁর প্রথম [illegible] মৃতসন্তানের কথা স্মরণ ক'রে, না, বর্তমান সমস্যার চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে তা' কে জানে।

কিছুটা সংকোচ বোধ করলেও কেমন যেন হয়ে যায় অতীন। অপূর্ব এই মাতৃস্পর্শের অনুভূতি! নিজেকে তার শিশুর মত মনে হয়। মহামায়া তার গায়ে মাথায় তেমনি সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন,—'বলো বাবা, তোমার কিসের আপত্তি। আমি মা, আমার কাছে কোনো সংকোচ কোরো না।'

অতীনের এবার সত্যিই সব গোলমাল হয়ে যায়। আপত্তির কোনো ভাষা যেন সে আর খুঁজে পায় না। এতক্ষণ অরবিন্দের এত কথায় যা হয়নি মহামায়ার সামান্য একটু স্নেহস্পর্শে তাই হয়।—

—শেষ পর্যন্ত সে ভালোভাবে না-ভেবে মহামায়ার প্রভাবেই বোধ হয় বিয়েতে সম্মত হয়ে যায় এবং কথাও দেয় যে এ'মতের তার আর কোনো পরিবর্তন হবে না।

মেসের ঘরে পায়চারি করতে করতে সমস্ত কথাই অতীনের একে একে মনে পড়ে। এই তো তুদিন পূর্বের ব্যাপার। ভুলবার কথাও নয়। এলোমেলো ভাবে সব কিছুই তার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। মনের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব আবার প্রবল হয়ে ওঠে।

কাজটা কি সত্যিই ভালো হয়েছে? এই বিয়েতে রাজী হওয়া কি ঠিক হয়েছে?—তেমনি পায়চারি করতে করতে অতীন ভাবে।— মহামায়া অরবিন্দ যা-ই বলুন এটা একটা বিষম বাঁধন তো বটেই। চির জীবনের জন্য এই বাঁধন মেনে নেওয়া কি সম্ভব?

যতভাবে ততই যেন তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। নিজের ওপর রাগ হয়। কী দরকার ছিল তার এই পরোপকারবৃত্তির? ও সব

কাজ কি তার দ্বারা সম্ভব? পরের উপকারের জন্য সমস্ত জীবনের স্বাধীনতাই সে বিসর্জন দেবে?—আর সত্যিই কি সে পরোপকারের জন্য এই কাজ করতে চলেছে? নাকি নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করার লোভেই সে রাজী হয়েছে? যদি তাই হয় তাহলে তার জন্য যে-মূল্য দিতে সে চলেছে তাকি খুব বেশী নয়?—নাকি মহামায়ার জন্যই সে এ'বিয়েতে রাজী হয়েছে। কিন্তু মহামায়া তার কে?—কেউ নয়। তাহলে?

এখনো সময় আছে। এখনো সে পালাতে ।—কিন্তু প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করা কি কোনো মানুষের পক্ষে সঙ্গত? না না, তা উচিত নয়।

অতীন চিন্তা করে। চিন্তা করতে করতে পায়চারি করে। তারপর পায়চারি বন্ধ ক'রে তক্তপোষের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়েও তার সেই এক চিন্তা।

—'অতীন বাবু শুয়ে যে! চাকরির উমেদারিতে বার হননি?'—

অতীনের চমক ভাঙে। চেয়ে দেখে পাশের ঘরের জ্যোতি রায়। অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ করেন ভদ্রলোক। তাই তার মেসে যাওয়া-আসার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। দুপুরেও তাকে তাই কখনো কখনো মেসে দেখা যায়।

অতীন উঠে বসে। বলে,—'না, আর উমেদারি করবো না জ্যোতিবাবু। আজ চার বছরে তো অনেক উমেদারিই করলাম। ক'জোড়া জুতোর তলা যে ক্ষয়ে গেছে তার আর ঠিক নেই।

—'ও, তাহলে চাকরি হয়ে গেছে। যাক। খাওয়াছেন কবে আমাদের?—ভালো কথা, কোথায় হলো চাকরি?'—উৎফুল্ল জ্যোতির মুখে অনেক প্রশ্ন।

অতীন একটু বিব্রত হয়। এ'বিয়ের কথা সে কারোকে জানায়নি। জানানো সম্ভবও নয়। তাই একটু কিন্তু-কিন্তু ক'রে বলে,—'চাকরি এখনো ঠিক হয়নি। তবে আজ একটা ইণ্টারভিউ আছে, সন্ধ্যার পর।

—'ইণ্টারভিউ? সন্ধ্যার পর! সে আবার কী রকম অফিসরে বাবা।—ও, বুঝেছি, ফিল্‌ম্‌ লাইনে চাকরি, তাই না?—তা' আপনার যা' চমৎকার চেহারা, গেলেই নিয়ে নেবে। তা, কোন্‌ রোলে প্লে করতে হবে?—প্লে-ই তো। সত্যি?'

অতীন বলে,—'হ্যাঁ, সত্যিই প্লে। তবে রোলটা খুবই শক্ত। এক ধনী ব্যক্তির দরিদ্র অপদার্থ ঘর-জামাই-এর ভূমিকা।'

সন্ধ্যার অনেক পূর্বেই অতীনকে নিতে হরেন এসে উপস্থিত হয়।

হরেনের বয়সটা ঠিক আন্দাজ করা যায় না। চল্লিশ বিয়াল্লিশের মত হবে বোধ হয়। রোগা, লম্বা, পাকানো ধরণের চেহারা। সেইজন্যই বয়সটা অনুমান করা শক্ত। দেখলেই মনে হয় কোনো একটা ক্রনিক রোগ আছে তার। সুমিতার সে কীরকম দূর সম্পর্কের দাদা হয়। আসলে সে অরবিন্দের আশ্রিত। সেও তা বোঝে। তার আচার-আচরণেও তার প্রকাশ। অতীনের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে তাই বোধহয় সে কিছুক্ষণ ভাবে। অবশেষে সসংকোচে তার পরিচয় দিয়ে বলে,—আমি তোমাকে নিতে এসেছি ভাই। মা পাঠিয়ে দিলেন।'—বলে সে বিনীতভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

অতীন তার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব অশান্তি চেপে রেখে যতদূর সম্ভব শান্ত ও সংযতভাবেই হরেনকে গ্রহণ করে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—'আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।'—সে একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়।

হরেন বসে না। তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। বলে,—'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি বেশ আছি।'

অতীন বলে,—'তাকি হয়। আপনি বস্থন। আমি চা নিয়ে আসি।'

হরেন খুবই বিব্রত হয়ে পড়ে। কোনোক্রমে চেয়ারে আড়ষ্টভাবে বসে পড়ে বলে,—'ও সব কিছুর দরকার নেই। আমি এইমাত্র খেয়ে আসছি।

অতীন তা সত্ত্বেও চা খাবার এনে দেয়।

হরেন খুবই সংকোচের সঙ্গে জলযোগ করে। চা পান শেষ হলে বলে,—'এবার তো আমাদের যেতে হয় ভাই।'

যাওয়ার কথায় অতীনের যেন জ্বর আসে। কেমন ভয়-ভয় করে। বলে,—'এখনো অনেক সময় আছে।'

নানা কথায় সে দেরি করার চেষ্টা করে। গড়িমসি করে।

হরেন কিন্তু বারে বারে সাহুনয়ে তাগাদা দিতে থাকে।—'এবার রেডি হও ভাই। আর দেরি করা চলে না।'

কী আর করে অতীন। ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে নেয়।

অরবিন্দের বালিগঞ্জের বাড়িতে অতীনরা যখন পৌঁছয় তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ। উৎসবের কোনোই লক্ষণ নেই। বরঞ্চ সেদিন যখন অতীন এ' বাড়িতে এসেছিল তখন এর চেয়ে যেন বেশী প্রাণ স্পন্দন লক্ষ্য করেছিল সে এখানে। আজ মনে হচ্ছে সমস্ত বাড়িটা যেন একটা অদ্ভুত কিছু আশঙ্কা ক'রে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

সামনে বাগান পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই কিন্তু শাঁক বেজে ওঠে। যদিও এটাই স্বাভাবিক তবুও অতীনের কেমন যেন চমক লাগে। তবে

কি সে সত্যিই বিয়ে করতে চলেছে। এখনো যেন ভালোভাবে বিশ্বাস হয় না তার।

বাড়ি প্রায় ফাঁকা। ড্রইং রুমে কয়েকজন মাত্র বসে আছেন। বেশ বোঝা যায় তেমন কেউই নিমন্ত্রিত হননি। এ' বাড়ির আশ্রিত পোষ্য যারা তারাও এখানে-ওখানে যে-যার কাজে ব্যস্ত।

একটু এগিয়ে যেতে মহামায়াকে দেখা যায়। তিনি এসে অতিনকে দোতলার ঘরে নিয়ে যান। ঘরে পুরু কার্পেট পাতা। একদিকে কিছুটা জায়গায় আবার কার্পেটের 'পরে সুন্দর চিত্রিত সাদা ধবধবে চাদর পাতা। দু'পাশে দু'টি তাকিয়া। ফুলদানি। টকটকে লাল গোলাপগুচ্ছ তার মধ্যে।

ঘরের এককোনে ছোটো একটি টেবিল ও দুটি চেয়ার। অতীন এগিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসে।

মহামায়া সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন,— 'কেমন আছো বাবা, ভালো?'

অতীন সংকোচ অনুভব করে। ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে শুধু জানায় যে সে ভালোই আছে।

তেমনিভাবে অতীনের গায়ের পরে হাত রেখে মহামায়া স্বগতোক্তি করেন,—'এ বিয়ের কথা তো কাউকেই প্রায় বলা হয় নি। বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। কে বলবে যে আজ শান্তুর বিয়ে।'—বলতে বলতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস চেপে যান তিনি। একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর তেমনি সস্নেহে অতীনের কাঁধের 'পরে একটি হাত রেখে বলেন,—'বাবা, আজ বিয়ের দিন, মুখে যে একটু চন্দন পরতে হয়। আমি সতীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, চন্দন পরিয়ে দেবে।'

চন্দনের কথা শুনে অতীনের হাসি পায়। এ 'বিয়েতেও আবার

চন্দন। তবু সে না বলতে পারে না। মহামায়ার সামনে সে যেন কেমন হয়ে যায়।

একটু পরে চন্দনের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে হরেনের বৌ সতী এসে ঘরে প্রবেশ করে। সতী হরেনের একেবারে বিপরীত। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী এবং অত্যন্ত সপ্রতিভ। সংকোচের কোনো বালাই নেই তার। দেখতে বেশ। তবে একটু স্থূল। অবশ্য সেজন্য তাকে খারাপ দেখায় না। বরঞ্চ গায়ের রঙ আরো ফর্শা দেখায়। সাতাশ-আঠাশ বছর বোধ হয় বয়স হবে তার।

অতীনের সঙ্গে প্রথমেই সে ঠাট্টা শুরু করে দেয়। হাসিমুখে বলে,—'বাবাঃ, কী ছেলে! বিয়ে করতে এসেছেন তা' মুখে একটু চন্দন নেই। সাহেব নাকি!—কিন্তু গাঁয়ের রঙটা তো আমার মতই একেবারে দিশি।'—সতী মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে।

একে অতীন একটু লাজুক প্রকৃতির তার 'পরে সতীর এই প্রগলভতা। সে খুবই লজ্জা পায়। কোনোক্রমে সংকোচ কাটিয়ে শুধু বলে,—'আপনার রঙ আমার মত হতে যাবে কেন? আপনি তো খুবই ফর্শা।'

—'তাই নাকি?'—হাসিমুখে সতী অতীনের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে। অতীন তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয়।

সতী স্মিতমুখে সেইদিকে একটু চেয়ে থাকে। তারপর কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলে,—'কী, চেয়ারে বসে থাকলেই হবে? চন্দন পরতে হবে না। বসুন এখানে এসে।'—সে মেজের কার্পেটের 'পরে যেখানে ফরাশ পাতা হয়েছে সেইখানটা দেখিয়ে দেয়।

অতীন বাধ্য ছেলের মত আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে বসে।

সতীও তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। পাশে চন্দনের সাজ-সরঞ্জাম রাখে। একটা থালার পরে ছোটো ছোটো দুটি বাটি। চন্দন ভর্তি। সেই চন্দনের বাটিতে লবঙ্গ ডুবিয়ে ডুবিয়ে নিঃসংকোচে সে অতীনের মুখে সযত্নে চন্দনের ফোঁটা দিতে থাকে। বাঁ হাত দিয়ে অতীনের চিবুকটা ধরে মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার দেখে কেমন হয়েছে। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে অতীনের গায়ে এসে লাগে। অতীন ঘামতে থাকে। লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। মেয়েদের সান্নিধ্যে সে একেবারে অভ্যস্ত নয়। জীবনে নিঃসম্পর্কীয়া কোনো নারীর সংস্পর্শেই সে আসেনি। কোনোরকমে আড়ষ্টভাবে তাই সে বলে,—'একটু তাড়াতাড়ি করুন।'

মুখে একটা অর্থপূর্ণ হাসি টেনে এনে সতী বলে,—'তর আর সইছে না বাবুর। পাবেন পাবেন, এখুনি হাতের মধ্যে পাবেন।'—সতী খিল খিল ক'রে হাসে। সে হাসি কেমন যেন অশ্লীল মনে হয় অতীনের কাছে। তার মত ছেলের এতে যথেষ্ট বিরক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু তবু সে কী জানি কেন বিরক্ত হয় না। কিছু সংকোচ বোধ করলেও এই হাসিঠাট্টা তার একেবারে মন্দ লাগে না। হয়তো কিছুটা ভালোও লাগে। নিজের এই মনোভাবে সে খুব আশ্চর্য হয়।

তেতলায় ঘরের সামনের টানা প্রশস্ত দালানে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। অতীনকে সেখানে আনা হয়।

চারিদিকে চমৎকার আলপনা আঁকা। বিয়ের পিঁড়ে দুটোও সুন্দর চিত্রিত। তবে এখানেও লোকজনের খুব অভাব। একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে শুধু একপাশে জানলার কাছে সসংকোচে দাঁড়িয়ে। তার আড়ষ্টভাব দেখে মনে হয় এ' বাড়িতে সে এই প্রথম এসেছে।

আর এক ধারে কয়েকটি বেতের মোড়া পাতা। অরবিন্দ ও পুরোহিত তার' পরে বসে বসে কথাবার্তা বলছেন। অরবিন্দের খালি গা। শুধু একটা গরদের চাদর এলোমেলো করে গায়ে জড়ানো। তাঁর টকটকে রঙ ও রোমশ বুক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উপবাসের ফলে মুখটা কিছু শুষ্ক।

অতীনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে এসে তিনি বলেন,—'এসো বাবা এসো।—আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো ?'

অতীন লজ্জিত স্মিতমুখে জানায় যে তার কোনো কষ্ট হয়নি। সে অরবিন্দের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

অরবিন্দ তাকে একেবারে পিঁড়ের 'পরে বসিয়ে দিতে যান।

সতী বাধা দেয়। সামনের ঘরের দরজার পাশ হতে ফিস ফিস করে বলে,—'ওখানে এখন বসবেন না। এ দিকে আসুন, কাপড়গুলো ছাড়তে হবে।'—তার হাতে একপ্রস্থ তসরের কাপড় দেখা যায়।

অতীন ঘরে গিয়ে ঢোকে। সুসজ্জিত ঘর। মেঝেতে, সুদৃশ্য কার্পেট পাতা। দু'দিকে মানুষের সমান উঁচু দুটি বড় আয়না। ঘরে কেউ নেই। শুধু একটা সুমিষ্ট সৌরভ সমস্ত ঘরের হাওয়ায় পরিব্যাপ্ত।

সতী তার হাতে কাপড় দিয়ে স্মিতমুখে বলে।—'নিন, তাড়াতাড়ি এ'সব ছেড়ে বিয়ের কাপড় পরুন। আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। —তবে উনি কিন্তু ভেতরেই রইলেন।' ব'লে সে দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে ঘর হতে বার হয়ে যায়।

অতীন মুখ ফিরিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখে সুমিতার একটা বড় ফটো। তাড়াতাড়ি সে চোখ সরিয়ে নেয়। হঠাৎ যেন সে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নতুন ক'রে সজাগ হয়ে ওঠে। আবার একটা

অজানা আশঙ্কা এবং এক বিশ্রী অস্বস্তি তাকে পীড়িত করতে থাকে। তাহলে সত্যিই এই অদ্ভুত বিবাহের দ্বারা এই ধনীকন্যাটির সঙ্গে তার জীবন চির দিনের জন্য জড়িয়ে যাচ্ছে!

সে যতদূর সম্ভব ধীরে ধীরে বসন পরিবর্তন করে।

বিয়ের সময় সুমিতাকে দেখে অতীনের মনের ভাব কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুমিতাকে এই সে প্রথম চাক্ষুষ দেখলো।

লাল চেলীপরা স্বল্পাবগুণ্ঠিতা সুমিতার দিকে চেয়ে সে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যায়। এত রূপ সে জীবনে কখনো দেখেনি। সুমিতার ফটো তো সে একটু আগেও দেখেছে। সে যে খুব সুশ্রী তা সে নিমেষমাত্র তার ফটো দেখেই বুঝেছিল। কিন্তু তাই ব'লে এত রূপ,—এত!—এই রঙ, এই শ্রী, এ'লাবণ্য তো ফটোতে ধরা পড়েনি।

—অতীন বারবার সুমিতার দিকে তাকায়।

সুমিতা নত চোখে বসে থাকে। প্রশান্ত গাম্ভীর্য তার মুখে যেন এক নতুন শ্রী এনে দিয়েছে। পাশ থেকে ও সামনের দিক হতে তীব্র বৈদ্যুতিক আলো তার যৌবনপুষ্ট নিটোল দেহের 'পরে এসে পড়েছে। মাথার লাল চেলীর ঈষৎ গুণ্ঠনের ওপর আলো পড়ে তার মুখেও যেন একটু রক্তিম আভা এনে দিয়েছে,—কিংবা সেটা তার মুখেরই স্বাভাবিক রক্তিমা।

যথারীতি বিবাহানুষ্ঠান চলতে থাকে। সুমিতার কোমল স্বেদসিক্ত হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ ক'রে অতীন কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। তার বৌদির স্মৃতি তার মনে নারীসম্পর্কে যে একটা বিশেষ বিরূপতা এতদিন জিইয়ে রেখেছিল এক নিমেষেই যেন তা' অন্তর্হিত হয়ে যায়। এক বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ পায় সে। মনে

হয় হৃদয়ের সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে সুকুমার এক অজানা অনুভূতি অকস্মাৎ এই মুহূর্তে তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। সে একেবারে অবাক হয়ে যায়। এ' কী,—কী এ! এর স্বাদ তো সে জীবনে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। এত সুখ, এত আনন্দ, এত বেদনা এই মেয়েটির স্পর্শের মধ্যে লুকনো ছিল? এ' কোন্ অনির্বচনীয় সুপ্ত তৃষ্ণা এই মুহূর্তের স্পর্শে তার অন্তরে জেগে উঠলো!

সুমিতাকে তার বড়ই রহস্যময় মনে হয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে সে সুমিতার দিকে বারবার তাকায়। এক গভীর আকর্ষণ সে অনুভব করে তার প্রতি। ক্ষণেকের জন্য তার হাতের 'পরে রাখা সুমিতার কোমল হাত সে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে।

দুই

রাত্রি বারোটার মধ্যেই বিয়ে শেষ হয়ে যায়। অতঃপর বর-কনেকে বাসরে আনা হয়। কোনোদিক থেকেই অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি থাকে না।

বাড়ি প্রায় নিঝুম হয়ে এসেছে। স্বজন বন্ধুদের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠ দু'চার জন যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁরা অনেকক্ষণ চলে গেছেন। ডক্টর ব্যানার্জিও এঁদের মধ্যে একজন। তিনি এই বিবাহে খুব খুশী। খুব আনন্দিত। অতীন তাঁর যেমন প্রিয় পাত্র সুমিতাও তেমনি। তিনি আহারাদির পর অনেকক্ষণ বিবাহস্থলে বসে থেকে বিবাহানুষ্ঠান দেখেছেন। সর্বান্তঃকরণে তিনি বরবধূকে আশীর্বাদ করে গেছেন।

দোতলার সেই ফরাশপাতা ঘরটিকে বাসরঘর করা হয়েছ। কিন্তু বাসর জমাবে কে? লোক কৈ? সেই একমাত্র সতী। অবশ্য তার এক দূর সম্পর্কের বোনকেও আনা হয়েছে। বিয়ের সময় তেতলার বারান্দায় অতীন যাকে দেখেছিল সেই মেয়েটি। সে নাকি ভালো গান জানে। সেই জন্যই তাকে আনা। গান ছাড়া কি বাসর জমে? অবশ্য ভালো গান জানে,—এমন কি গান গেয়ে সারা দেশে খ্যাতি অর্জন করেছে এমন অনেক মেয়ে-পুরুষেরই এ'বাড়িতে যাতায়াত আছে। কিন্তু তাদের কারোকেই বলা হয়নি। তারা যথেষ্ট পরিচিত ব'লেই হয়তো বলা সঙ্গত মনে করা হয়নি। এ' মেয়েটি এই বাড়িতে এই প্রথম এলো। একমাত্র সতী ছাড়া কারো সঙ্গেই তার পরিচয় নেই। সতীর সঙ্গেও যে তার খুব ঘনিষ্ঠতা আছে তা' মনে হয় না। বাইশ-তেইশ বছর বোধ হয় বয়স হবে মেয়েটির। নাম গীতা। কুমারী।

দেখতে তেমন ভালো নয়। কালো, রোগা। সামনের দাঁত কিছু উঁচু। দাঁত যে সব সময় বা'র হয়ে থাকে তা' নয়। তবে কথা বলতে গেলে সামনের সব দাঁতগুলি বার হ'য়ে পড়ে। সেজন্য সে বোধ হয় সংকোচ বোধ করে। তাছাড়া একটু লাজুক প্রকৃতিরও মেয়েটি। তার মুখখানা যে অতীনের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত আছে এই অনুভূতিও বোধ হয় তা'কে লজ্জা দেয়। ধীরে ধীরে সে তার মুখখানা সতীর মাথার আড়ালে নিয়ে আসে। কিন্তু সেখান থেকেই অপাঙ্গে সে বার কয়েক অতীনের দিকে তাকায়। চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ নামিয়ে নেয়। অতীন বেশ আমোদ অনুভব করে।

বাসর কিন্তু একেবারেই জমে না। এই রকম লাজুক মেয়ে দিয়ে কি বাসর জমে? সতীও যেন কেমন হয়ে যায়। সুমিতা কাছে থাকার জন্যই হয়তো তার সপ্রতিভ প্রগলভতা আর দেখা যায় না।

দু'একটি সাধারণ কথার পর সতী বলে, 'আমার পেছনে লুকোলে কেন গীতা? একটা গান গাও না।'

গীতা বলে,—'গান আমি গাইতে পারি নাকি? তা' ছাড়া ক'দিন গলাটা ধ'রে আছে। গার্গল্ করেও কোনো ফল পাচ্ছি না।' গীতা গলায় হাত বুলোয়।

—'গলা আবার কোথায় ধরেছে? এই তো বেশ কথা বলছো।'

অতীন স্মিতমুখে বলে,—'ওটা কিছু নয়। যাঁরা গান জানেন প্রত্যেকেই ঐরকম কথা বলেন। উনি যে ভালো গাইতে পারেন ওটা তারি লক্ষণ।'

গীতা সলজ্জ দৃষ্টিতে অতীনের দিকে একবার তাকায়। তারপর তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয়। সতী হারমোনিয়মটা টেনে একেবারে তার কোলের কাছে এনে দেয়।

গীতা যথাসম্ভব সতীর দেহের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে হারমোনিয়ম টেনে নেয়। কিছুক্ষণ এমনি বাজায়। তারপর বার কয়েক গলা পরিষ্কার ক'রে গান শুরু ক'রে : রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

"এত আলো জ্বালিয়েছো এই গগনে
কী উৎসবের লগনে॥
সব আলোটি কেমন ক'রে ফেল আমার মুখের 'পরে,
আপনি থাক আলোর পিছনে॥
প্রেমের বাতি জ্বালি হৃদয় গগনে
কী উৎসবের লগনে।"

গীতা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার গায়। সুরের মায়ায় সমস্ত ঘর ডুবে যায়। অদ্ভুত মাধুর্য ও লাবণ্য তার কণ্ঠস্বরে। অতীন মুগ্ধ হয়ে শোনে। প্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে।—এত ভালো মেয়েটির গলা!—অতীন মনে মনে ভাবে।

অনেকক্ষণ পর গীতা থামে। সুরের দীপ্তিতে তখন সমস্ত ঘর ঝলমল করছে।

কিন্তু আর সে গায় না। অনেক সাধ্য-সাধনা করা সত্ত্বেও চুপ করে বসে থাকে। সুতরাং বাসর আবার ঝিমিয়ে পড়ে। সকলেই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক পর মহামায়া এসে সকলকে রেহাই দেন। হাসিমুখে বলেন,—'সুন্দর গান হচ্ছিল, আমি শুনেছি।'

দু'হাতে দু'গ্লাস শরবৎ নিয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। অতীনের দিকে চেয়ে সস্নেহে বলেন,—এই শরবৎটুকু খেয়ে নাও বাবা, অনেক কষ্ট হয়েছে আজ।'—তিনি অতীনকে এক গ্লাস শরবৎ দেন। সুমিতাকেও আর এক গ্লাস দেন। সুমিতা প্রথমে খেতে চায় না।

মহামায়া তার মুখের কাছে মুখ এনে অনুচ্চকণ্ঠে বোধ হয় তাকে মিনতি করেন। তারপর সে গেলাস মুখে তোলে।

কী দিয়ে করা হয়েছে কে জানে। লেবুর গন্ধের আভাস দেওয়া চমৎকার শরবৎ। অতীন এক নিঃশ্বাসে পান করে। তার তেষ্টাও পেয়েছিল খুব।

মহামায়া বলেন,—'আর জেগে কাজ নেই। তোমরা এবার বিশ্রাম করো বাবা।'—তিনি ঘর হতে বার হয়ে যান।

গীতাকে নিয়ে সতীও উঠে পড়ে। স্মিতমুখে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তারা চলে যায়।

ঘরে শুধু সুমিতা ও অতীন। আর কেউ না। এক অপূর্ব অজানা অনুভূতি অতীনের সমস্ত অন্তর ছেয়ে ফেলে। অজানা কিন্তু বড় মধুর এই অনুভূতি।

এতক্ষণ অন্য সকলে ঘরে থাকায় অতীন সুমিতার দিকে ভালোভাবে তাকাতে পারেনি। এখন এই নির্জন ঘরে সে মুখ ফিরিয়ে পরিপূর্ণভাবে তার দিকে তাকায়। ছ্যাখে সুমিতা দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে একইভাবে চুপচাপ ব'সে আছে। তা'কে বড় ক্লান্ত মনে হয়। অতীনের কেমন মায়া লাগে। বলে,—'আপনি বসে রইলেন কেন? শুয়ে পড়ুন না। বিশ্রাম করুন।'—ব'লে সে একটা বালিশ সুমিতার দিকে এগিয়ে দেয়।

সুমিতা দ্রুত মুখ ফিরিয়ে অতীনের দিকে তাকায়।

বিয়ের সময় সুমিতা সমস্তক্ষণ চোখ নিচু ক'রে ছিল। শুভদৃষ্টির সময়ও সে অতীনের দিকে তাকায়নি। অতীন ভেবেছিল অতীত জীবনের কথা স্মরণ ক'রে সুমিতা বোধ হয় লজ্জায় তার দিকে চাইতে পারছে না।

এই প্রথম ছু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হয়। অতীন একেবারে অবাক হয়ে যায়। এ কী দৃষ্টি! ছু'চোখে এত ঘৃণা ও অবজ্ঞা বোধ হয় জীবনে সে আর কখনো দেখেনি।

সুমিতা গম্ভীর ভাবে বলে,—'আমার ব্যবস্থা আমি নিজে করতে পারবো। আমার জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।' ব'লে সে অতীনের দেওয়া বালিশটা আবার অতীনের দিকে ঠেলে দেয়। তারপর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বলে,—'আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি জানেন তো এ 'বিয়ে নামে মাত্র বিয়ে?' একটু থামে সে। তারপর আবার তেমনি বলে যায়।—'আমাদের মধ্যে কখনো স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ থাকবে না। সে-আশা আপনি কখনো করবেন না। এ' বাড়ির ড্রাইভার বা বাজার সরকারের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তারচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যদি কখনো আপনি আমার সঙ্গে স্থাপন করার চেষ্টা করেন তা'হলে অপমানিত হবেন।—বুঝেছেন?' ব'লে সে মুহূর্তের জন্য মুখ ফিরিয়ে তীব্রদৃষ্টিতে ঘৃণা বিচ্ছুরিত ক'রে অতীনের দিকে তাকায়। তারপর সম্পূর্ণ পিছন ফিরে একটা ছোটো তাকিয়ায় মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

অতীনের কাছে এটা একেবারে অভাবিত ব্যাপার। এমন কথা যে সুমিতা তাকে বলতে পারে তা' সে স্বপ্নেও ভাবেনি। এক মুহূর্তেই তার অন্তরের সমস্ত মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। তার পরিবর্তে রাগে ও অপমানে সমস্ত শরীর জ্বালা করতে থাকে। অকারণে তা'কে এ'ভাবে অপমান করার কী প্রয়োজন ছিল সুমিতার? সেতো সবই শুনেছে। সুমিতার সর্তের কথা শুনেই তো সে এ' বিয়েতে রাজী হয়েছে। স্বাভাবিক বিয়ে হলে সে নিজেই রাজী হতো না। সকলেই কি সুজয়ের মত নারী-মাংস লোভী? কোনো আকর্ষণ নেই তার সুমিতার

প্রতি। তবে কিসের এত অহংকার এই মেয়েটির? রূপ? অর্থ? তা' সে যাই থাক, তবু সে যে সমাজের পাঁচজনের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য কলঙ্কিত উচ্ছৃঙ্খল একটি মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয় সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি ও শিক্ষাও কি নেই তার?

অতীন ভাবে, তা ছাড়া ঐ কথাগুলি কি ভদ্রভাবে বলা চলতো না? আসলে অত্যন্ত অভদ্র, অত্যন্ত হীন এই মেয়েটি। এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধও নেই। তাকে বাঁচাবার জন্য অতীন যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করছে,—এই বিয়ের ফলে সে ও তার বাপ-মা যে কতটা উপকৃত হবে সেটাও কি বোঝে না এই অভদ্র অহংকারী মেয়েটা?

রাগে অতীনের সমস্ত শরীর আগুণ হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেয় সুমিতাকে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখে। কিন্তু সারা রাত আর সে একেবারে ঘুমতে পারে না। একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে সে কোনক্রমে রাত কাটায়। রাত্রেই সে ঠিক করে এখানে থাকবে না। যা হয় হোক এদের,—এখান থেকে সে পালিয়ে যাবেই।

পরদিন বিবাহের অবশিষ্ট অনুষ্ঠান সে যন্ত্রের মত ক'রে যায়। তারপর সুযোগ পাওয়া মাত্র সকলের অলক্ষ্যে গৃহ হতে বার হ'য়ে পড়ে। উদ্‌ভ্রান্তের মত কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। অনুশোচনায় তার নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। ঈশ্! কী ভুলটাই না সে করেছে! কী দরকার ছিল তার এদের উপকার করতে যাওয়ার? দেশে কী আর মানুষ ছিল না! না, না,—ও'সব উপকার-টার কিছু নয়। আসলে ধনীর গৃহজামাতার স্থূল শারীরিক সুখ ও আরামের প্রতি সে লুব্ধ। সেই জন্যই সে এ' বিয়ে করেছে। কিংবা সুমিতার রূপ ও যৌবনপুষ্ট দেহের ছবি দেখে সে লুব্ধ হয়েছিল।

হয়তো তাই। নাহলে নির্বোধের মত এমন কাজ সে করতে যাবে কেন? সে লোভী, কামুক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন। তাকে সুমিতা তো অপমান করবেই। আরো অপমান করা উচিত ছিল। তার যেমন কর্ম তেমনি ফল হয়েছে।—নিজেকে অতীন যা' মনে আসে তাই ব'লে গালিগালাজ করতে থাকে।

ঘুরতে ঘুরতে টালিগঞ্জের লেকের কাছে গিয়ে সে উপস্থিত হয়। দুপুর বেলা এ' দিকটা একেবারে নির্জন। ছোটো ছোটো দুটি লেক পাশাপাশি। যদিও স্নান করা নিষেধ, তবুও দু' একজন লোক এসে স্নান করে। সাঁতার কাটে। অতীন চেয়ে চেয়ে দেখে। একটা গাছের নীচে শুয়ে সে প্রায় সারাটা দুপুর এইভাবে কাটিয়ে দেয়।

একটা কোকিল কোথায় যেন ডাকছে। সেই ডাক দূর হতে অতীনের কানে ভেসে আসে। কোকিলের ডাককে লোকে কেন এত মধুর বলে? কী আছে এই কুহু ডাকে! এককালে কবিরাই বা কেন এত কাব্যি করেছেন এ' নিয়ে? অতীন বোঝে না। এর চেয়ে বরঞ্চ ঘুঘুর ডাক বেশ। নিস্তব্ধ দুপুরে দূরাগত ঘুঘুর ডাক মনে এক অদ্ভুত ভাবের সাড়া তোলে। মনে হয় বড় করুণ সেই ডাক। এক রহস্যময় অনুভূতির ছোঁয়া লাগে মনে।

সারাদিন যে কিছু খাওয়া হয়নি অতীনের সে খেয়ালই থাকে না। নানা চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। সেখানে শুয়ে শুয়ে সে ঠিক করে যে রাত্রি একটু বেশি হলে সে লুকিয়ে মেসে গিয়ে তার স্যুটকেসটা নিয়ে আসবে। তারপর একেবারে সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে যাবে। যে-ট্রেণ পাবে তাতেই উঠে পড়বে। এখনকার মত এদের হাত থেকে পালাতেই হবে। তারপর দেখা যাক তার ভাগ্যে কী আছে।

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হতেই কিন্তু অতীন উঠে পড়ে। ভাবে এখনই সে লুকিয়ে স্যুটকেসটা নিয়ে আসতে পারবে। এর চেয়ে বেশি দেরি করলে হয়তো সারাটা রাত আবার হাওড়া স্টেশনে কাটাতে হবে। তাছাড়া খিদেও বেশ পেয়েছে। এখন কিছু খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পকেটে একটিও পয়সা নেই যে কিছু কিনে খায়। সে ধীরে ধীরে মেসের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

মেসের কাছে এসে সে দূর থেকে ভয়ে ভয়ে তার ঘরের দিকে তাকায়। তার এই বিয়ের জামা-কাপড় দেখে মেসের সবাই কী ভাববে কে জানে। কাউকেই সে কিছু খুলে বলেনি। বিনয়কেও না। বিনয়কে শুধু বলেছিল এক বড়লোকের বাড়িতে সে টিউশনি পেয়েছে। তাদের সঙ্গে হয়তো সে কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে পারে। যদি যায়—বিনয় যেন চিন্তা না করে। ভেবেছিল পরে বিনয়কে সব কথা খুলে বলবে। এ'কথা শুনলে বিনয় যে খুব রেগে যাবে সে তো জানা কথা। অথচ সে মহামায়াকে কথা দিয়ে ফেলেছে। বিনয় তাকে এই বিয়ে করতে বাধা দিতে পারে এই ভয়েই সে বিনয়কে তখন কিছু বলেনি। কিন্তু এখন? কী যে তার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল কে জানে। তখন বিনয়কে সব কথা খুলে বললে আজ আর এই অবস্থা হয় না। মহামায়াকে কথা দেওয়া সত্ত্বেও বিনয় নিশ্চয়ই বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে এই ধরণের বিয়েতে বাধা দিতো। আর বিনয়ের ইচ্ছাশক্তি অতীনের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং তার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ হতো।

ভাবতে ভাবতে অতীন মেসের দরজার কাছে এসে উপস্থিত হয়। কে জানতো যে মেসের সামনে যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে মহামায়া বসে আছেন।

অতীনকে দেখেই মহামায়া গাড়ি হতে বার হয়ে আসেন।

তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলেন,—'বাবা, তোমার জন্যে সেই বিকেল থেকে বসে আছি।—উনি সারাদিন খোঁজ ক'রে গেছেন।'—তারপর একটু থেমে আবার বলেন,—'লক্ষ্মীবাবা, বাড়ি চলো।'

অতীন প্রথমে একটু থতমত খায়। তারপর সোজা জবাব দেয়,—'মাপ করবেন, আমি আর আপনাদের ওখানে যেতে পারবো না।'

মহামায়া বলেন,—'আমি সব শুনেছি। সমস্ত কথা হবে। আগে তুমি বাড়ি চলো।'—তিনি একরকম জোর ক'রে অতীনকে গাড়িতে ওঠান। রাস্তায় কথা-কাটাকাটি করলে লোক-জানাজানি হবে এই আশঙ্কায় অতীনও বেশি কথা বলতে সাহস পায় না। বাধ্য হয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে।

বাড়ি এসে মহামায়া বলেন,—'একটু বিশ্রাম ক'রে হাতমুখ ধুয়ে আগে খেতে বোসো বাবা। তারপর কথাবার্তা হবে। ঈশ্, কী হয়েছে ছাখো দেখি, মুখ শুকিয়ে একেবারে কালি হয়ে গেছে। পাগল ছেলে! কোথায় ছিলে সারাদিন বলো তো! আমরা সব ভেবে সারা।'—তিনি সস্নেহে অতীনের উসকো খুসকো চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে থাকেন।

অতীন কোনো কথা বলে না। শুধু মহামায়ার হাতটা আস্তে সরিয়ে দেয়।

মহামায়া বলেন,—'আর রাগ ক'রে থেকো না বাবা। আমি শান্থর হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। ওকে তুমি এবারের মত ক্ষমা করো।'

অতীন গম্ভীরভাবে বলে,—'ও সব কথা থাক।'

মহামায়া অতীনের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন,—'আচ্ছা থাক।—তুমি এখন হাতমুখ ধুয়ে দুটি মুখে দাও তো।'

তিনি খাবারের ব্যবস্থা করতে চলে যান।

আহারাদি শেষ হলে একটু ইতস্তত ক'রে মহামায়া আবার অনুনয় করেন,—'শান্তুর কথা কিন্তু আর তুমি মনে রেখো না বাবা। ও'সব তুমি ভুলে যাও। বুঝেছো।'—তিনি কাতর দৃষ্টিতে অতীনের মুখের দিকে তাকান।

অতীন মুখ নিচু করে। কী জানি কেন তার মনে হয় তার রাগ যেন অনেকটা কমে গেছে। পেট ভ'রে খাওয়ার জন্যই কিনা কেজানে। সে শুধু বলে,—'সে সব কথা আপনারা শোনেননি, কল্পনাও করতে পারবেন না সে-সব কথা।'

মহামায়া বলেন,—'আমি সব শুনেছি। তুমি চলে যাওয়ার পর শান্তুকে জিজ্ঞেস ক'রে সব জেনেছি।'—তারপর তিনি গত রাত্রে সুস্মিতা অতীনকে যা বলেছিল সেই কথাগুলি মোটামুটি বিবৃত করেন। বিষণ্ণ গলায় বলেন,—'এই কথা বলেছে তো। খুব অন্যায় করেছে। আমি এর জন্য আবার ক্ষমা চাইছি।—তবে একটা কথা তুমি ভেবে ছ্যাখো বাবা। যে-দুর্ঘটনা শান্তুর জীবনে সম্প্রতি ঘটে গেছে তার ফলে সমস্ত পৃথিবীই ওর কাছে বিস্বাদ হ'য়ে উঠেছে। সুজয় ওর সঙ্গে যে হীন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার ফলে সমস্ত পুরুষজাত সম্বন্ধেই ওর মনে এখন ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নেই। ওর মন এখন খালি পুরুষজাতকে আঘাত দিতে চায়। এটা অসুস্থ অস্বাভাবিক অবস্থা। মনের এই অবস্থাতেই তোমাকে অপমান করেছে। কিছুদিন পর মনের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে এ'জন্য ও খুবই অনুতপ্ত হবে। নিজেই তখন তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে।'

অতীন বাধা দিয়ে বলে,—'থাক, ও সব কথা শুনে আমার কোনো

লাভ নেই। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমার পক্ষে এখানে থাকা আর সম্ভব নয়।'

মহামায়া কথা না-বলে অতীনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। একটুপর সস্নেহে আবার বলেন,—'লক্ষ্মী বাবা আমার, ছেলেমানুষি কোরো না। এখন তুমি এখান থেকে চলে গেলে কেলেঙ্কারি আরও প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারবো না। গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে আমাকে।—তুমি কি চাও তোমার মা এ'ভাবে মরুক ?'—তাঁর গলা কাঁপতে থাকে।

অরবিন্দ বলেন,—'শানুকে ডেকে এখনি তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়াতে পারতাম। কিন্তু ওর এই মানসিক অবস্থায় ওকে কিছুই আমরা জোর ক'রে বলতে সাহস পাচ্ছি না।—তবে আমি তোমায় সত্যি বলছি, শানু অভদ্রও নয়—অকৃতজ্ঞও নয়। ও যে তোমাকে অপমান করেছে তা' সত্যিই অসুস্থ মানসিক অবস্থার জন্য, অন্যকারণে নয়।

অতীন তবুও মুখ গোঁজ ক'রে বসে থাকে।

মহামায়া বলেন,—'শানু তোমাকে আর কিছু বলবে না। তোমার কোনো কথায় সে আর থাকবে না। সে আমায় কথা দিয়েছে। তুমি ওর কথা আর মনে রেখো না। তুমি আমার কাছে থাকবে। তোমার মায়ের কাছে থাকবে। নিজের মনে পড়াশোনা করবে। তোমার অন্য কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন কী ? মনে করো তুমি যা' করেছো তা' শুধু আমাদের জন্যই করেছো, আমাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা করার জন্যই করেছো,—শানুর জন্য নয়। তা'হলেই তোমার মন শান্ত হবে। —লক্ষ্মীবাবা, অবুঝ হ'য়ো না।'—ব'লে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড ক'রে বসেন। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের মা যেমন বুকের

মধ্যে জড়িয়ে ধরে তেমনি ক'রে তিনি অতীনের মাথাটা সস্নেহে নিজের বুকের মধ্যে টেনে আনেন। অতীন বিস্মিত হওয়ারও অবকাশ পায় না। কেমন অভিভূত হয়ে পড়ে। একেবারে শিশুর মত মনে হয় নিজেকে। একটা বাষ্পের ডেলা যেন তার গলার কাছে এসে আটকে গেছে বোধ হয়। সে যথাসাধ্য আত্মসংবরণ করার চেষ্টা করে।

কয়েক মুহূর্তপরে নিজেকে সে আস্তে আস্তে মুক্ত ক'রে নেয়। তার মধ্যে যে সত্যিই এক চিরন্তন দুর্বল শিশু আছে তার পরিচয়ে সে যেমন বিস্মিত হয় তেমনি লজ্জিতও হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। সে আটকা পড়েছে বেশ বুঝতে পারে। শুধু যে মহামায়ার স্নেহের বন্ধনে তাই নয়। আরো আছে। আরো অনেক কিছু আছে। ঠিক সে নির্দেশ করতে পারে না। কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে তা অনুভব করে।

শূন্যদৃষ্টিতে অতীন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। তারাখচিত কালো আকাশের খানিকটা দেখা যায়। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। মনে হচ্ছে রাত্রি যেন মুখ টিপে টিপে হাসছে। বড় অদ্ভুত রহস্যময় সেই হাসি। চিন্তার গভীরে তার স্পর্শ এসে লাগে।

তিন

দেওঘরের এই বাড়িতে অতীনের অখণ্ড অবসর। প্রায় মাসখানেক হলো এখানে সকলে চলে এসেছেন।

ঠিক ছিল বিয়ের পর বর-কনে শ্যামবাজারের একটি বাড়িতে এসে উঠবে। তারপর ছোটখাটো সব অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সকলে মিলে অরবিন্দের এই দেওঘরের বাড়িতে চলে আসবে। অতীনকেও সে-কথা জানানো হয়েছিল। বিয়ের পরের পরের দিনই মহামায়া অতীনকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—'জানো বাবা, একসময় আমার শ্বশুরঠাকুর খুব সস্তায় দেওঘরে একটা পুরনো বাড়ি সমেত কিছুটা জমি কিনে রেখেছিলেন। তারপর জায়গাটা স্বাস্থ্যকর দেখে উনি সেই বাড়ি ভেঙে নতুন ক'রে আবার বাড়ি করেন। মাঝে মাঝে আমরা সেখানে চেঞ্জে যাই। কিছুদিন থেকে শরীর সারলে চলে আসি। আমি ঠিক করেছি শান্তুকে নিয়ে এখন বছর দেড়-দুই সেখানে গিয়েই থাকবো। তুমি কি বলো?'

অতীন ঔদাস্যের সঙ্গে বলেছিল,—'বেশ তো।'

মহামায়া বলেছিলেন,—'কিন্তু তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। কিছু দিন থাকতে হবে সেখানে। অবশ্য তোমার সেশন শুরু হলে এম-এ ক্লাশে ভর্তি হয়ে অনায়াসেই কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করতে পারবে। তবে মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় তোমার দেওঘরে যেতে হবে। নাহলে পাঁচজনে হয়তো পাঁচরকম সন্দেহ করবে।—তা' মন্দ কী, জায়গাটা তো বেশ স্বাস্থ্যকর। মাঝে মাঝে এই চেঞ্জে তোমারও স্বাস্থ্যের উপকার হবে।—কী বলো, তোমার কোনো আপত্তি আছে?'

—'আপত্তি আর কী।'—অতীন নির্বিকারভাবে বলেছিল।

সত্যিই আপত্তি আর কিসের? এই বিয়ে যখন শেষপর্যন্ত হলোই এবং সুমিতার ও'রকম অপমানের পরও যখন সে এঁদের সংস্রব ছিন্ন করতে পারলো না তখন আর এ'সবে তার আপত্তি কিসের? কোনো আপত্তি নেই। এখন চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে সবকিছু মেনে নেওয়াই ভালো। সবকিছু মেনে নিয়ে দেখা যাক শেষপর্যন্ত কী হয়। কী আছে তার অদৃষ্টে।

প্রকৃতপক্ষে তাই সে করেছে। মহামায়া যা' বলেছেন কোনোরকম চিন্তাভাবনা না-করে তাই করে গেছে। তবে এই অদ্ভুত বিয়ের কথা বারবার চিন্তা না-ক'রে পারেনি। দেওঘরে এসেও সেইকথা সে বহুবার চিন্তা করেছে।

এই ক'দিনের মধ্যে তার জীবনে কী অঘটনটাই না ঘটে গেলো। এইভাবে এ'রকম অদ্ভুত ধরণের বিয়ে যে তার হবে সে কি তা' কোনদিন ভাবতেও পেরেছিল? এই বিয়েতে সম্মত হওয়াটা এখনো তার কাছে [illegible] ব্যাপার বলে মনে হয়। কেন সে সম্মত হলো, কেন? কী এর অন্তর্নিহিত কারণ? এই নির্বোধ আত্মঘাতী উপচিকীর্ষার কি কোনো অর্থ হয়?—নাকি চারবছর বেকারজীবন কাটিয়ে জীবন সম্বন্ধে সে এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে তা' নিয়ে এমনি এক হেলাফেলার খেলায় রাজী হয়ে গেলো?—

অরবিন্দ-মহামায়ার ঐকান্তিক অনুরোধ এড়াতে না-পেরেই কি সে এ'বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে? তার চরিত্রের একটা দিক সত্যিই এত নমনীয় ছিল যে কেউ একটু চাপ দিলেই তা নত হয়ে পড়বে?—নাকি শৈশবে মাতৃহারা তার মহামায়াকে দেখে মায়ের মত মনে হয়েছে। তার পুরুষ হৃদয়ের চিরন্তন শিশু কি মহামায়ার স্নেহাকাঙ্ক্ষী? তা যদি না হবে তাহলে সুমিতার ও'রকম অপমানের পরও সে কেন এঁদের সংস্রব

ত্যাগ করতে পারলো না? এ'ছাড়া আর কিসের জন্য?—নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করার লোভ?—নাকি অন্য কিছু?—অতীন নানাভাবে চিন্তা করেছে, নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছে, তবু এ'ব্যাপারটা কিছুটা যেন রহস্যই থেকে গেছে তার কাছে।

দেওঘরের এই বাড়িতে কলকাতা হতে ঝি-চাকরদের কারোকেই আনা হয়নি। এমন কি অনেক দিনের পুরনো চাকর শিবুকেও না। কলকাতা থেকে শুধু এসেছে অরবিন্দের এক বন্ধুর বাড়ির অত্যন্ত বিশ্বস্ত ড্রাইভার অনাদি দাস। অনাদি শুধু দক্ষ ড্রাইভারই নয়, যথেষ্ট কাজের লোকও। বাজার দোকান করা থেকে শুরু করে গাড়ি চালানো পর্যন্ত সব কাজেই তার সমান দক্ষতা। তার উপর যে-কোনো কাজের ভার দিয়েই নিশ্চিন্তে থাকা যায়। কাজে তার কোনো ক্লান্তি নেই। এখানে মহামায়ার সে দক্ষিণহস্তসরূপ।

সকলের সঙ্গে অরবিন্দও এখানে এসেছিলেন। তিনি দিন কয়েক থেকে চলে গেছেন। তাঁর এখানে পড়ে থাকলে চলবে কেন। তাহলে তাঁর অফিস দেখবে কে। অন্যান্য কর্মচারীরা থাকলেও এতদিন তাঁর দূরে থাকা সম্ভব নয়। তাই দিন পনেরো-কুড়ি পরই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর মন এখানেই পড়ে রয়েছে। তিনি বলেও গেছেন তাই। যাওয়ার পূর্বে মহামায়াকে বলেছেন,—'আমি যাচ্ছি, কিন্তু আমার মন এখানেই পড়ে রইলো। প্রতিমাসে আমি আসবো। এসে দু'চারদিন ক'রে থেকে যাবো। তোমরা সকলে খুব সাবধানে থাকবে। আমি চিন্তার মধ্যে রইলাম।'

মহামায়ার মনে শঙ্কা থাকলেও আশ্বাস দিয়ে বলেছেন,—'চিন্তার কী আছে। অনাদি আছে, অতীন রয়েছে। তোমার কোনো চিন্তা নেই।'

অরবিন্দ বলেছেন, 'অতীন ছেলেমানুষ। ওর সংসারের কী জ্ঞান আছে।—অনাদি কাজের এবং বিশ্বস্তও। কিন্তু, গড্ ফরবিড, যদি কোনো বিপদ-আপদ হয়, ওর বুদ্ধিতে কি সব কুলোবে?'

মনে যাই থাক, মহামায়া তবুও মুখে আশ্বাসই দিয়েছেন,—'কী যে বলো তুমি, আপদ-বিপদ আবার কী হবে। তুমি কিছু ভেবো না।'

তবু অরবিন্দ নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। অবশ্য তিনি ব্যবস্থাদি ভালোমতই করেছেন। তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য তাঁর সামর্থ্যের বাইরে যেতেও তিনি প্রস্তুত। প্রতিমাসে তাঁর সঙ্গে কলকাতা থেকে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার এসে সুমিতাকে দেখে যাবেন এবং সন্তান হওয়ার মাস খানেক পূর্ব হ'তে তিনি এখানেই থাকবেন, এ'ব্যবস্থাও অরবিন্দ করেছেন। তাঁর একমাত্র গাড়িটিও তিনি এখানে রেখে গেছেন।

ডাক্তারের মতে সুমিতার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে গাড়ি ক'রে চারদিকে নিসর্গের শোভা দেখে বেড়িয়ে বেড়ানো ভালো। প্রতিদিন কিছুটা ক'রে পায়ে হাঁটাও তার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন।

সুমিতা কিন্তু কোনোখানেই যেতে চায় না। শুধু ঘরের কোনে বসে বসে নানা রকম বই পড়ে। এ' নিয়ে মহামায়ার সঙ্গে প্রায় রোজই কথা কাটাকাটি হয়।

বিকেলবেলা রোদ পড়ে গেছে। মহামায়া এসে বলেন,—'শানু ওঠ, অনাদি গাড়ি বার করেছে।'

সুমিতা ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বই পড়ছিল। বিরক্ত ভাবে তাকায়,—'গাড়ি বার করেছে তো আমি কী করবো?'

—'চল, যাবি না?'

—'আজ না।'

—হ্যাঁ, রোজই তোমার আজ না। এ'রকম করলে শরীর থাকবে?'

সুমিতা চুপ ক'রে থাকে।

—'কী, যাবি না?'—মহামায়া আবার জিজ্ঞাসা করেন।

—'তুমি যাও।'—সুমিতা বলে।

মহামায়া রাগ করে বলেন,—'আমি যাবো! উনি যে গাড়িটা এখানে রেখে গেছেন, কলকতায় ওঁর অফিস যেতে কত অসুবিধা হচ্ছে তবু গাড়িটা নিয়ে যাননি, সেকি আমার বেড়াবার জন্যে?—তোমাকে না ডাক্তার বলেছেন সকাল বিকাল বেড়াতে। ডাক্তারের কথা না-শুনলে শরীর থাকবে?'

সুমিতা ঝাঁজিয়ে ওঠে,—'শরীর না থাকে না-থাকবে, তুমি যাও দেখি, বকবক কোরো না।—পড়তে দাও।'

এমনি আরো অনেক ব্যাপার নিয়েই লাগে। মেজাজটাই সুমিতার বিশ্রী হয়ে গেছে। কেন যে এমন হয়েছে মহামায়াও তা' বোঝেন। তাই বেশি রাগারাগি তিনি করেন না। তবু মেয়েলি স্বভাববশতই হয়তো এক একদিন একটু বেশি কথা-কাটা-কাটি হ'য়ে যায়।

সকালবেলা সুমিতা স্নানের পর কোনোক্রমে কাপড়টা ছেড়েই আবার যথারীতি বই খুলে বসেছে। মহামায়া বিরক্ত হ'য়ে কাছে এসে দাঁড়ান। মেয়ের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর আর সহ্য করতে না পেরে বলেন,—'তোমার কি পরীক্ষা নাকি? দিনরাত যে বই মুখে?—তা' যাক গে যাক। কিন্তু মাথায় সিঁদুর দেওয়া হয়নি কেন?'

সুমিতা কোনো কথা বলে না।

—'কী, কথা কানে যাচ্ছে না ?'

—'কী বলছো কী ?'—বই থেকে মুখ তুলে রাগতস্বরে স্থমিতা বলে।

—'মাথায় সিঁদুর দিসনি কেন ?'

—'মাথায় সিঁদুর আর আমি দেবো না।'

—'দিবি না ?'—মহামায়ারও ভীষণ রাগ হয়ে যায়। বলেন,—'কেলেঙ্কারিটা পাঁচ জনকে আর না জানালে হচ্ছে না, না ?'

—'কেলেঙ্কারি ? কিসের কেলেঙ্কারি ?'—স্থমিতা রাগে সোজা হ'য়ে বসে। বলে,—'তুমি যদি আর কখনো এই সব কথা বলো তাহলে তখুনি আমি এ'বাড়ি থেকে চলে যাবো।'—উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে।

মহামায়া ভয়ে চুপ ক'রে যান। সারাদিন আর মেয়েকে কিছু বলেন না। নানাভাবে মেয়ের মন রাখার চেষ্টা করেন। তবু হয়তো পরদিনই আবার একটু খিটিমিটি লাগে। এমনিই চলে।

দিনে দিনে ধীরে ধীরে স্থমিতার দেহের পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার চিন্তা-ভাবনা আরো বাড়তে থাকে। অনেক সময় তিনি অকারণেও চিন্তা করেন,—দড়িকে সাপ মনে ক'রে ভয় পান। অনেক সময় অবশ্য তাঁর উদ্বেগের কারণও থাকে।

সকালবেলা স্থমিতা যথারীতি বই পড়ছিল। হঠাৎ উঠে তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। খানিকটা বমি করে। তারপর ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় মহামায়া তরকারি কোটার তদারক করছিলেন। বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—'কী, বমি করলি ?—তোর কি সবই বাড়াবাড়ি! এখনো বমি!'

মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেও মহামায়া উদ্বিগ্নভাবে মেয়েকে

অনুসরণ ক'রে ঘরে এসে ঢোকেন। —'আঃ, আবার বই নিয়ে বসলি কেন? এখন একটু শো না। আমি বাতাস করছি।'

বিরক্তভাবে সুমিতা বলে,—'যা করছিলে তাই করো গিয়ে। আমাকে জ্বালাতে এসো না।'

—'হ্যাঁ, আমিই তো তোমায় জ্বালাচ্ছি। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তুমি আমায় খাক্ করলে।'

বড় বড় আয়ত চোখে স্থির দৃষ্টিতে সুমিতা মায়ের দিকে তাকায়। মহামায়া ভয় পেয়ে যান। সান্ত্বনয়ে বলেন,—'লক্ষ্মী মা আমার, এখন একটু শো। শরীর তো ভাল নয়, মাথা ঘুরে পড়ে গেলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'—ব'লে তিনি মেয়ের গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

মুখটা একটু ফ্যাকাশে হওয়া ছাড়া অবশ্য বাইরের দিক হ'তে সুমিতাকে দেখলে স্বাস্থ্য খারাপ মনে হয় না। বরঞ্চ তার নিটোল তন্বীদেহ আরও কিছুটা ভারি হয়েছে। বুক ও শরীরের মধ্যদেশ দেখলে বেশ বোঝা যায় যে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা।—দূর হতে অতীন এটা বারবার লক্ষ্য করে আর বিচিত্র এক ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলতে থাকে। নিজের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয় সে।—সুমিতা তার কে? সত্যিকার কেউ নয়। কোনো দুর্বলতাও নেই তার এই অভদ্র মেয়েটির প্রতি। তবে তার এ'মনোবিকার কেন? নিজেকে বারবার সে প্রশ্ন করে এবং যা' খুশি ব'লে ধিক্কারও দেয় নিজেকে।

সুমিতাকে অবশ্য সে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। সুমিতার ঘর দোতলায় আর অতীনের একতলায়। ইচ্ছে করেই অতীন এক তলায় থাকে যাতে সুমিতার সঙ্গে মুখোমুখি তাকে না হতে হয়। তবু

বাড়িতে থাকিলে সুমিতার সঙ্গে একবার-না-একবার মুখোমুখি বা চোখাচোখি হয়ে যায়ই। বহুবার হয়েছেও তাই। আর কোনো বারই সেটা তার পক্ষে সুখের হয়নি।

একদিন ভোরে ঘুম ভেঙেছে। আলোকোজ্জ্বল প্রসন্ন প্রভাত। অতীনের মন অকারণ আনন্দে পরিপূর্ণ।

বাড়ির চারদিকে পাঁচিল ঘেরা বিরাট বাগান। বাগানের পথের দু'পাশে দীর্ঘ ঋজু ইউকলিপটাসের সারি। অতীন গুণগুণ করতে করতে সেই পথে পায়চারি করছে। বাতাসে ইউকলিপটাসের মৃদু গন্ধ। মন তার আপনা হতেই আত্মহারা।

বাগানের একদিকে ফুলে ফুলে ভরা একটা চাঁপা গাছ। তার একপাশে দুটো করমচা গাছের ঝোপ। অতীন হাঁটতে হাঁটতে এক সময় করমচা গাছের কাছে এসে দেখে চাঁপা গাছের তলায় সুমিতা বসে বসে কী যেন পড়ছে। তার পরণে রাত্রের এলোমেলো বাসী কাপড়। ঈষৎ সোনালী চুল উসকো-খুসকো। খোঁপায় সদ্য-আহরিত দু'টি চাঁপা ফুল।

এই প্রসন্ন প্রভাতে, এই পরিবেশে, এই সৌন্দর্য উপেক্ষা করার ক্ষমতা বোধ হয় অতীনের ছিল না। করমচা গাছের পাশ হতে মুগ্ধ বিস্ময়ে সে সুমিতার দিকে চেয়ে থাকে। সুমিতার সুন্দর সুগৌর মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। তার মুখ ঈষৎ আনমিত। কোলের পরে রাখা বই-এর দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে। একটা ছবি। অদ্ভুত অপরূপ এ'ছবি।

কতক্ষণ যে অতীন এইভাবে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল কে জানে। হঠাৎ তার চমক ভাঙে বাগানের মালী রুহুয়ার ডাকে। হাত

পনেরো দূর হতে ফমুয়া চেঁচিয়ে বলে,—'দাদাবাবু, মা আপনাকে ডাকতেছেন।'

অতীনের মুখ ফেরাবার আগেই সুমিতা মুখ ফেরায়। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে অতীনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। দৃষ্টিতে তার সেই ঘৃণা আর ভৎর্সনা। অতীন লজ্জায় অপমানে এতটুকু হয়ে যায়। মাথা নিচু ক'রে পালিয়ে আসে।

এমনি আরো কয়েকবার হয়েছে।

বাড়িতেই তাই অতীন থাকতে চায় না। নিজের মনে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। একা একাই সে আজ ত্রিকূট পর্বত, কাল দীঘরিয়া পাহাড়, পরশু অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায়।

ত্রিকূট পাহাড়ের সে একেবারে চূড়ায় উঠেছে। পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। চূড়া থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে সে ভয়ে, বিস্ময়ে আনন্দে প্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে। নিচের আল দিয়ে ঘেরা বিস্তীর্ণ ক্ষেতগুলি দেখে মনে হয় যেন সবুজ মাটির 'পরে জ্যামিতির রেখাঙ্কন। বাড়ি ঘরগুলি দেখে মনে হয় কোনো একটি ছোটো মেয়ে যেন খেলা ঘর তৈরি করে রেখেছে। বিপুলশরীর মহিষ চরছে নিচে, মনে হচ্ছে যেন ছাগলছানা চরে বেড়াচ্ছে। বিরাট বিরাট গাছগুলিকে মনে হয় ছোটো ছোটো ঝোপের মত।

ত্রিকূট পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় উঠতে একটা স্থান বড় দুর্গম। কিছু ধরবার নেই। গুল্মহীন ঢালু পাহাড় কয়েক শো ফিট নিচে পর্যন্ত নেমে গেছে। একবার পা ফসকালে হাজার হাজার ফিট নিচে গড়িয়ে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হতে হবে। নিচের দিকে তাকালেও মাথা ঘুরে যায়। সেই জায়গায় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে যেতে কীজানি কেন অতীনের মুহূর্তের জন্য সুমিতার কথা মনে পড়েছে। মনে হয়েছে এই জায়গায়,

এই অবস্থায় সুমিতা যদি তাকে দেখতো!—পরমুহূর্তে অবশ্য সে নিজের 'পরে বিরক্ত হয়েছে, সুমিতার চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়েছে।

তবু বাড়ি এসে মহামায়াকে বিস্তারিত গল্প না-ক'রে পারেনি। আরোহনপথ যতটা বিপদশঙ্কুল তার চেয়ে বোধ হয় কিছু বাড়িয়েই বলেছে। মহামায়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রায় মা ও ছেলের মত। মহামায়া যে সত্যিই তাকে খুব স্নেহ করেন সেটা সে অন্তর দিয়ে অনুভব করে। তার হৃদয়ও মহামায়ার স্নেহাকাঙ্ক্ষী। সেটাও সে বোঝে। তাতে সে বিরক্ত হয় না। মহামায়াকে তারও খুব ভালো লাগে।

বিস্ফারিত চোখে মহামায়া সব শোনেন। তারপর ভীতকণ্ঠে বলেন,—'ও'রকম জায়গায় কেন তুমি গিয়েছিলে?—ডাকাত ছেলে। আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো আর কখনো ও'সব জায়গায় যাবে না।' —তিনি তাঁর বাঁ হাতটা এগিয়ে দেন অতীনের ছোঁয়ার জন্য।

অতীনের ভারি ভালো লাগে। হেসে বলে,—'আপনি দেখছি বড় ভীতু। ভয়ের কী আছে বলুনতো। কত লোক যাচ্ছে।'

—'তা' যাক, তুমি যেতে পাবে না।'

তবু এর পরও অতীন আরো অনেকবার পাহাড়ে গেছে। মহামায়ার স্নেহভীত নিষেধটুকুই সে শুনতে চায়, নিষেধ মানতে নয়।

দীঘরিয়া পাহাড়েও সে কয়েকবার গিয়েছে। সেখানে গিয়েছে সে এক অদ্ভুত আশা নিয়ে। উন্মুক্ত খোলা জায়গায় জীবন্ত বনের বাঘ দেখবে এই আশা। ছেলেমানুষি সন্দেহ নেই। অবশ্য ছেলেবেলাতে শোনা গল্প থেকেই এই আশার উদ্ভব। তার এক আত্মীয় নাকি

দীঘরিয়া পাহাড়ে বাঘ দেখেছিলেন। গল্পটা এই রকম। জন পনেরো মিলে তাঁরা নাকি পাহাড়ে উঠেছিলেন। সে অবশ্য অনেক দিন আগের কথা। তাঁরা সকলে পাহাড় থেকে নামছেন একটু ঘোরা পথ দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আবছা আবছা আলো। গোধূলি বলা চলে। নামতে নামতে তাঁরা হঠাৎ দেখেন পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে পথের ঠিক পাশে একটা ঝোপের কাছে এক বিশাল বাঘ। শুয়ে আছে। বোধ হয় ঘুমচ্ছে। নিচে নামতে হলে সেই বাঘের পাশ দিয়েই যেতে হবে। অনেক ঘুরে অন্যপথ দিয়ে তখন আর নামা চলে না। অনেক রাত্রি হয়ে যাবে।—সুতরাং তাঁরা আর কী করেন, অন্যকোনো উপায় না-দেখে সকলে মিলে একসঙ্গে হো-হো-ক'রে ভীষণ চীৎকার শুরু ক'রে দেন। এই দারুণ কোলাহলে বাঘের ঘুম ভেঙে যায়। মুখ তুলে সকলের দিকে একবার তাকায়। তারপর পরম নিশ্চিন্তে বিরাট এক হাই তোলে। এদের তখন হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেছে। ভয়ে আরো ভীষণ জোরে চীৎকার করতে থাকেন। বিরক্ত হয়ে বাঘ মুহূর্তের জন্য সেই কোলাহলকারী জনতার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর কী মনে ক'রে উঠে আস্তে আস্তে বনের মধ্যে ঢুকে যায়।

এই গল্প অতীন ছেলেবেলায় একাধিকবার শুনেছে। শুনে ভীত হয়েছে, রোমাঞ্চিত হয়েছে। কৈশোর-যৌবনের কল্পনাশ্রিত দুঃসাহস সেই অবস্থার সম্মুখীন হতে চেয়েছে। সেই বহুদিনের পোষণকরা ছেলেমানুষি আশাই বোধ হয় বিশেষ ক'রে তাকে দীঘরিয়া পাহাড়ে কয়েকবার নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাঘ দেখা দূরের কথা একটা বনবিড়ালও সে দেখতে পায়নি। অবশ্য সত্যিই যদি সে পাহাড়ের কোনো নির্জন স্থানে বাঘের সম্মুখীন হতো তাহলে যে কী করতো তা' বোধ হয় সে ভালো ক'রে একবারও চিন্তা করে দেখেনি।

শুধু পাহাড়ে নয়, উদ্দেশ্যহীনভাবে অতীন আরো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কোথায় কোথায় ঘোরে সময়-সময় স্নানাহারেরও ঠিক থাকে না। কেউ তার কোনো ইচ্ছায় বাধা দেয় না। তবে খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হলে মহামায়া অনুযোগ করেন। সস্নেহ তিরস্কারে বলেন,—'তোমরা দু'জনে কি আমায় একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না?—এ'রকম করলে শরীর ঠিক থাকবে!'

অতীন একটু লজ্জিত হয়। তবু স্মিতমুখে বলে,—'এ শরীর এত সহজে বেঠিক হওয়ার নয় মা।'

—'তোমার মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে কি তুমি এ'ভাবে শরীরের ওপর অত্যাচার করতে পারতে?'—ব্যথিত দৃষ্টিতে তিনি অতীনের দিকে তাকান।

বিব্রত হ'য়ে হাসি মুখেই অতীন বলে,—'আহা, এটা তো বেড়াবারই জায়গা। আচ্ছা, এবার থেকে খাওয়া-দাওয়া ঠিক সময়ই করবো।'

মহামায়ার এই সব অনুযোগ-অভিযোগ অতীনের ভালোই লাগে। হয়তো মায়ের বয়সী এই সুন্দরী নারীর সস্নেহ তিরস্কার শুনবারও একটা আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে অতীন শিমুলতলা, ঝাঁঝা এবং অন্যান্য কাছের স্থানগুলিও ঘুরে আসে। বন্ধুর সাঁওতাল পরগণার নিসর্গ শোভা তার বেশ লাগে। এখানে-ওখানে ঝাউ আর ইউকলিপ্‌টাস গাছের আকাশ-ছোঁয়া ঔদ্ধত্য। আ[illegible]রে পর্বত যেন ঘন নীল মেঘের মত আকাশের গায়ে লীন। অনেকা[illegible]ত অন্তরের পাহাড় দেখলে মনে হয় এই তো কাছে আকাশের গায়ে ঠেস দিয়ে বুঝি

দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এগিয়ে গেলে বোঝা যায় তা' নয়,—তা' দূরে, বেশ দূরে।

বেড়িয়ে আর কবিতা লিখে দিন কাটে অতীনের। ছেলেবেলা থেকেই তার সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক। তখন থেকেই সে গোপনে লেখার চর্চা করে। এখানে অনুকূল পরিবেশ ও অবসর পেয়ে এ দিকে সে আরো বেশি মন দেয়।

সকালে উঠে চা-খেয়েই সে বাড়ি থেকে বার হয়ে যায়। আধ মাইলটাক দূরে একটা বড় ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছের নীচে বিরাট একটা পাথরের পর গিয়ে বসে। বই খাতা নিয়ে যায়। কখনো পড়ে, কখনো লেখে; কখনো শুধু চুপচাপ বসে থাকে। দূরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। ছোটো ছোটো টিলায় ভর্তি উঁচুনিচু দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের দিকে চেয়ে কত কথা তার মনে আসে। যা' কোনোদিন সে ভাবেনি। কোনোদিন চিন্তা করেনি।

পাখিরা গাছে কলরব করে। হঠাৎ আকাশে উড়ে কোন্ দূরে চলে যায়। আবার অকারণে হয়তো ফিরে আসে। সে চেয়ে চেয়ে দেখে। তার কবি প্রকৃতি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অহেতু আনন্দের উত্তাপ হৃদয়ে অনুভব করে।

কবিতা লিখে লিখে একটা খাতা প্রায় ভর্তি ক'রে ফেলেছে অতীন। কয়েকটি কবিতা বেশ ভালো হয়েছে। তার নিজেরই ভালো লেগেছে।

এ'গুলো ছাপালে কেমন হয়? তাহলে সবাই পড়তে পারে। সবাই।—অতীন আপন মনে কল্পনার জাল বুনে চলে।

মোটামুটি আনন্দেই দিন কাটে তার। শুধু মাঝে মাঝে সুমিতা সম্পর্কিত ছোটোখাটো ব্যাপার তার মনের শান্তি নষ্ট করে দেয়।

বিকেলে সুমিতা বাগানে পায়চারি করছে। দোতলার বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে অতীন দেখে বারান্দায় ডেক-চেয়ারের ওপর একখানা বই উপুড় করা রয়েছে। পড়তে পড়তে সুমিতা উঠে গেছে। আন[illegible] সত্ত্বেও অতীন চেয়ে দেখে মলাটের 'পরে একটি সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট শিশুর ছবি। বইটির নাম বড় বড় ক'রে ইংরেজিতে লেখা—'ইওর বেবি'। কৌতূহল দমন করতে না পেরে অতীন বইটি হাতে নেয়। খুলে দেখে একজন অ্যামেরিকান ডাক্তারের লেখা শিশুপালন বিষয়ক বই।

বুকের ভিতরটা অতীনের জ্বালা করতে থাকে। কী জানি কেন অসহ্য রাগ হয় তার। সেই সঙ্গে ঘৃণা,—যুক্তিহীন অন্ধ ঘৃণা।

যে-লম্পট বিশ্বাসঘাতক ফাঁকি দিয়ে সুমিতার দেহ ভোগ করেছে তারই সন্তান পালন করার জন্য সুমিতা এখন থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। আশ্চর্য! মেয়েরা কি একেবারে জানোয়ার? পিতা যে-ই হোক না কেন, যেমন করেই হোক না কেন, সন্তানের প্রতি সেই গরু-ছাগলের মত অন্ধ স্নেহ। এমন কি অজাত অবস্থাতেও স্নেহ! এরই নাম মাতৃত্ব? এরই নাম দেবীত্ব?—হতে পারে তা, কিন্তু মনুষ্যত্ব নয়, কখনই নয়।

সুমিতার প্রতি ঘৃণায় তার মনও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঘৃণা কি শুধু ঘৃণারই জন্ম দেয়? তার প্রতি সুমিতার ঘৃণা কি ধীরে ধীরে তার মনেও সুমিতার প্রতি ঘৃণার জন্ম দিচ্ছে?

অতীন বারে বারে নিজেকে সুমিতা সম্বন্ধে উদাসীন করার চেষ্টা করে। কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয় না।—সুমিতা কী করে, কী বই পড়ে, বিশেষ ক'রে বই সম্বন্ধে একটা অসভ্য কৌতূহল সে একেবারে দূর করতে পারে না।

একদিন সুমিতাকে নিয়ে মহামায়া গেছেন মন্দিরে। অখেয়ালবশতঃ অতীন এসে সুমিতার ঘরে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই তার খেয়াল হয়। নিজেকে হঠাৎ সুমিতার ঘরে আবিষ্কার করে সে লজ্জিত হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘর হতে বার হ'তে পারে না। সুমিতার খাটের পাশে ছোটো টেবিলের উপর সজ্জিত বইগুলি দেখে তার ভিতরের কৌতূহল জাগ্রত হয়। নেড়ে চেড়ে দেখে। সবার উপরের বইটি গীতাঞ্জলি। এর পরেরটি সঞ্চয়িতা। এরপর আধুনিক কবিতার একটি সংকলন।—কবিতার বই দেখে অতীন বিস্মিত হয়। এই অভদ্র অহঙ্কারী মেয়েটা তাহলে কবিতাও পড়ে!

এ' ধারে সেই সন্তান পালন বিষয়ক বইটি। ও' বিষয়ে লেখা আরও একটি বই তার নিচে। ও'দিকে কতকগুলি বই থাক দিয়ে সাজানো। অল্প অল্প ধূলো জমেছে তার পরে। বোঝা যায় বইগুলি বেশ কিছুদিন নাড়াচাড়া করা হয়নি। প্রথম বইখানা বাইবেল। তার পরেরটা ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট, এরপর দু'খণ্ড কথামৃত। একটি শ্রীঅরবিন্দের গীতাও আছে তার মধ্যে। এ'ছাড়া কয়েকটি ডাক্তারী জার্নাল ও কিছু বাংলা সাময়িক পত্র। অতীন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখে।

চলে আসার সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ে বালিশের তলায় রক্ষিত একটি বই-এর কালো মলাটের একটুখানি। অন্যায় বুঝলেও বালিশের তলা থেকে টেনে নিয়ে বইটা দেখে অতীন।—আশ্চর্য, একটা যৌনতত্ত্বের বই!—এটিও একজন অ্যামেরিকানের লেখা। প্রায় সাত-আটশো পৃষ্ঠার বিরাট বই। অসংখ্য ছবি ও ডায়াগ্রামে ভর্তি। পেজ্ মার্ক দেখে বোঝা যায় প্রায় চোদ্দ আনা পড়া হয়ে গেছে বইটির। দিন তিনেক পূর্বে বোম্বাই-এর একটি বই-এর দোকান থেকে যে বুক-পোস্টটি এসেছিল খুব সম্ভব তার মধ্যে এই বইটিও ছিল।

বিস্মিত হ'য়ে অতীন ভাবে সুমিতা যৌনতত্ত্বের বই পড়ে! বাইশ-তেইশ বছরের এম-এ-পড়া মেয়ে,—তা'কে তো যৌনতত্ত্বে পারঙ্গমই ধ'রে নেওয়া যায়। সে কিনা মনের এই অবস্থাতেও যৌনতত্ত্বের বই আনিয়ে পড়ছে! আশ্চর্য, মেয়েদের চরিত্র কি সত্যিই রহস্যময়!!

ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, সুমিতাকে অতীন আরো নানাভাবে লক্ষ্য করেছে। তার মেজাজটাও তার বড় বিশ্রী লেগেছে। মহামায়া অবশ্য বলেন যে এ'রকম সে আগে ছিল না। তার জীবনের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার জন্যই এ'রকম হয়েছে। এটা সাময়িক। সে যাই হোক, অতীন দেখেছে সুমিতার মেজাজের ভয়ে বাড়ির ঝি-চাকর সবাই তটস্থ। বিশেষত এরা নতুন ঝি-চাকর। এরা বোধ হয় এ'রকম রূপও কখনো দেখেনি, এ'রকম মেজাজও না। সুমিতা যে খুব চেঁচামেচি করে তা' নয়। বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত। তার গলার স্বর কদাচিৎ শোনা যায়। বেশি কথা সে কখনো বলে না। বিরক্ত-ভাবে শুধু দু'একটি ঝাঁজালো কথা বলে। তবে বিরক্তি তার লেগেই আছে। কোনো কিছুই বোধ হয় তার মনঃপূত হয় না। আর তা না-হলেই সে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। তাতেই প্রায় সকলে ভয় পেয়ে যায়। তার রূপ, তার অহংকার, তার বাক্-সংযম তাকে এক বিশেষ ব্যক্তিত্বদান করেছে। এই ব্যক্তিত্বের কাছে অনেকেই সংকুচিত হয়। অতীন পর্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়ে।

এ' বাড়িতে একমাত্র লখিয়ার সঙ্গে সুমিতার ভাব। লখিয়া এ' বাড়ির মালী ফগুয়ার চার বছরের মেয়ে। মেয়েটি দেখতে বেশ। রঙ

শ্যামবর্ণ হলেও মুখে চোখে বেশ একটা শ্রী আছে। কচি মুখের কথাগুলোও বেশ মিষ্টি।

দেওঘরের এই বাড়ি মালী ফস্থয়ার হেপাজতে সারা বছর প্রায় খালিই পড়ে থাকে। কোনো বছর শীতকালে কিছু দিনের জন্য অরবিন্দ সপরিবারে এখানে থাকেন। কোনো বছর তাঁর আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে কেউ বায়ু-পরিবর্তনের জন্য এখানে আসেন।

অথচ বাড়িটি বিরাট। দোতলা এবং অনেকগুলি ঘর। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগানও বেশ বড়। ঝাউ, ইউকলিপটাস এবং সৌখিন ফুলের গাছ হতে আরম্ভ ক'রে নানারকম ফলের গাছও আছে বাগানে।

আধুনিক সব সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাও যথাসম্ভব আছে বাড়িটাতে। নিচে ও উপরে শ্বেতপাথরে বাঁধানো দুটি সুন্দর বাথরুম দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তবে জল ইঁদারা থেকে আনতে হয়। বড় বড় বাথটবে ভারী জল দিয়ে যায়।

বাগানের এক ধারে অবস্থিত ইঁদারাটিও বেশ সুন্দর ও বৃহৎ। এরই কিছু দূরে টালি দিয়ে ছাওয়া একখানি ঘরে মালী ফস্থয়া থাকে। ফস্থয়া, তার বৌ, বছর আটের একটি ছেলে ও চার বছরের মেয়ে লখিয়া,—এই নিয়ে তার সংসার।

এই লখিয়ার সঙ্গেই একমাত্র স্থমিতার এখানে ভাব। তার কাছেই সে কেবল তার সদা-বিরক্তি ও গাম্ভীর্যের আবরণ উন্মোচিত করে। লখিয়ার সঙ্গে সে যখন আবোল-তাবোল নানা কথা বলে তখন এক রহস্যময় যাদুতে তার মুখের সমস্ত রুক্ষ কর্কশ রেখাগুলি কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। তার বদলে এক আশ্চর্য কোমলতায় সারা মুখ স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন তাকে দেখে কে বলবে যে

এ-ই সেই বদমেজাজী মেয়েটা। ও' অবস্থায় তাকে দেখলে তার সম্বন্ধে ধারণাই বদলে যায়।

ভাগ্যক্রমে অতীনেরও প্রায় তাই হয়।

একদিন বিকেলবেলা অতীন বাগানের ইউকলিপটাস গাছগুলির নিচে থেকে কয়েকটি ঝরা পাতা কুড়িয়ে নিচ্ছিল। এই পাতা হাতে ঘসলে হাতে যে গন্ধ হয় সেই গন্ধ তার বেশ লাগে। পাতা কুড়োতে কুড়োতে সে দেখে বাগানের একদিকে সুমিতা রোজকার মত লখিয়াকে পাকড়াও ক'রে তার সঙ্গে নানারকম খুনসুটি শুরু করেছে। অতীনের সেখানে দাঁড়াবার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু সুমিতার একটা কথা তাকে বোধ হয় একটু আকর্ষণ করে। মুহূর্তের জন্য সে উৎকর্ণ হয়। উৎসুক হ'য়ে ও'দিকে তাকায়। তারপর কখন যে সে তার অজ্ঞাতসারে সেই করমচা ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে খেয়াল তার নেই।

—'লখিয়া তোকে সবচেয়ে কে বেশি ভালোবাসে রে?'—সুমিতা প্রশ্ন করে।

কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে লখিয়া গম্ভীরভাবে বলে,—'ফগুয়া।'

বাপকে গম্ভীরভাবে নাম ধ'রে উল্লেখ করায় সুমিতা বেশ কৌতুক অনুভব করে। খিলখিল করে সে হেসে ওঠে।—'ফগুয়া?—ফগুয়া তোর কে হয়রে?'—হাসতে হাসতেই সুমিতা আবার প্রশ্ন করে।

এবারও পূর্বের মত গম্ভীরভাবে লখিয়া বলে,—'লড়কা।'

—'ওমা, তাই নাকি? তোমার আবার একটি লড়কাও আছে?' —সুমিতা দু'হাতে ধুলোমাখা লখিয়াকে কোলে তুলে নেয়। গা টিপে, গাল টিপে, নানাভাবে আদর ক'রে তাকে একেবারে উদ্‌ব্যস্ত ক'রে

তোলে। তারপর তার হাতে একমুঠো দামী টফি দিয়ে বলে,—'এবার বল্‌তো তোকে কে বেশি ভালোবাসে?'

একসঙ্গে দু'তিনটি টফি মুখে পুরে অস্পষ্ট উচ্চারণে আবার লখিয়া বলে,—'ফমুয়া।'

—'তবে রে অকৃতজ্ঞ মেয়ে।'—কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে সুমিতা তা'কে কোল থেকে নামিয়ে দেয়।

লখিয়া ঘাসের উপর ব'সে প'ড়ে মুখ নিচু ক'রে একমনে টফি খেতে থাকে। সুমিতার প্রতি আর মনোযোগ দেয় না।

সুমিতাও বাগানের ঘাসের পরে বসে পড়ে। আবার তার সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করে।—'দুপুরে তুই কী খেয়েছিস লখিয়া?'

—'ভাত ঔর রোটি।'

—'দূর্‌,—তুই তো ছাতুখোর।'

ছাতুখোর অপবাদ তাকে সুমিতা প্রায়ই দিয়ে থাকে। লখিয়াও এখন বোঝে এটা সুমিতার একটা ছল। তাই সে ঘাড় নেড়ে নেড়ে তার নবোদ্‌ভিন্ন ক'টি সাদা দাঁত বার ক'রে হাসিমুখে বলে,—'নহী নহী।'

সুমিতা আবার অন্য প্রশ্ন ক'রে,—'এখন তুই কী খাচ্ছিস?'

—'তোফি।'

—'আমাকে একটা দিবি?'

—'নহী।' লখিয়াকে খুবই সিরিয়াস্‌ মনে হয়।

তখন কী আর করে সুমিতা, দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে টফি না-পাওয়ার দুঃখে কাঁদতে শুরু করে।

লখিয়া হতভম্ব হ'য়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। গম্ভীরভাবে সুমিতাকে নিরীক্ষণ করে। বোধ হয় তার মনে দয়ার উদ্রেক হয়।

বাঁহাতের ঘামে-ভেজা একটা টফি স্থমিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে,—'রোও মৎ মেমসাহেব,—এই লেও।'

—'আমি মেমসাহেব নাকি?—এক মুহূর্তে কান্না ত্যাগ ক'রে খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে স্থমিতা। তারপর অপ্রতিভ লখিয়াকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে তার মলিন গালে চুমোর পর চুমো এঁকে দেয়।

দূর থেকে অতীন এ'সবই দেখে। সে খুব উপভোগ করে। সেই বাসর ঘরের ঘটনার পর এই প্রথম বোধ হয় স্থমিতাকে তার বেশ লাগে। অজান্তেই তার সমস্ত মুখ নীরব হাসিতে উজ্জল হয়ে ওঠে।

লখিয়াকে নিয়ে এমনি স্থমিতা প্রায় প্রতিদিনই নানারকম ছেলেখেলায় মেতে ওঠে। অতীনের চোখে পড়লে লুকিয়ে লুকিয়ে সে তা' দেখে। পূর্বের সব সংকল্প বিস্মৃত হয়ে যায়।

লখিয়ার সঙ্গে কথায় বার্তায় স্থমিতা খুব ভালো থাকে। মেয়ের মুখে হাসি দেখে মহামায়াও খুশী হন। স্থমিতা নানারকম জিনিষপত্র লখিয়াকে কিনে দেয়। দিয়ে আনন্দ পায়। এ সব দেখে অতীনও আনন্দ অনুভব করে। মালীর মেয়ে ব'লে লখিয়াকে তো স্থমিতা ঘৃণা করে না, অবজ্ঞাও করে না, বরঞ্চ ভালোই বাসে।

স্থমিতার আর একরূপ যেন ধীরে ধীরে অতীনের চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়। না, স্থমিতা একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে-ও মোটামুটি দোষেগুণে মিশ্রিত স্বাভাবিক মানুষ। অন্তত তার কিছু কিছু আভাস এখনই দেখা যাচ্ছে। ধনীর একমাত্র সন্তান, তার'পর এই অসামান্য রূপ, কিছুটা উদ্ধত, কিছুটা অহংকারী তার পক্ষে হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য না-হলে খুবই ভালো হতো। কিন্তু ক'জনের

মধ্যেই বা সে-রকম দেখা যায়? তা ছাড়া মনে হয় এটা তার আসল প্রকৃতিও নয়,—এটা হয়েছে সে যে-ভাবে বেড়ে উঠেছে তার ফলে। সুতরাং জীবনের ঘটনা ও পরিবেশের পরিবর্তনে এই স্বভাবেরও পরিবর্তন হতে পারে। তার রুক্ষ অভদ্র আচরণও হয়তো সত্যিই কিছুদিন পূর্বে তার জীবনে যে-দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তারই মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল। হয়তো এটা সত্যিই সাময়িক।

সুমিতা সম্পর্কে যে-কথা অতীন অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ক'দিন পূর্বে নিজেকে বোঝাতে সক্ষম হয়নি এখন তার যৌক্তিকতা যেন অনেকখানিই তার মর্মে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। এই সামান্য ব্যাপারে সুমিতার প্রতি তার আবার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি হওয়াতে সে আশ্চর্যও হয় প্রচুর।

তবে কি একজন তা'র মধ্যে থেকে অবিরত তাকে সুমিতার দিকে ঠেলে দিতে চায়? কে সে? কী তার ইচ্ছে? কী তার উদ্দেশ্য?—অতীন ভালো ক'রে কিছুই বোঝে না।

তবে সত্যিই ধীরে ধীরে সুমিতার প্রতি তার অন্তরের ঘৃণা বা তিক্তভাব যে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এটা সে বেশ অনুভব করে। সুমিতাকে সে ঘৃণা করতে চায়ও না। তার প্রতি সুমিতার ঘৃণাও দূর হোক এটাও তার কাম্য। না, সে সুমিতার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী নয়। সে আকাঙ্ক্ষা তার নেই। অবশ্য এটা সুমিতার প্রাক্-বিবাহ-যুগের কলঙ্কের জন্য যে তা' নয়। ওটাকে সে নির্বুদ্ধিতা মনে করতে পারে, কিন্তু গর্হিত কিছু একটা কখনই ভাবতে পারে না। বরঞ্চ একজন পুরুষ যে তাকে এ'ভাবে প্রতারিত করেছে সেজন্য পুরুষ হিসাবে সে কিছুটা লজ্জাও অনুভব করে।

আজকাল তাই অতীন আড়াল থেকে সুমিতা ও লখিয়ার কৌতুক

খেলা প্রায়ই দেখে। কত রকমের ছেলেমানুষিই যে সুমিতা করে লখিয়ার সঙ্গে! দেখে আশ্চর্য হতে হয়। লখিয়াকে সুমিতা সত্যিই ভালোবাসে! অতীন বিস্মিত হয়,—আনন্দিতও হয়। লখিয়াকে সুমিতা ভালোবাসলে অতীন কেন আনন্দ পায় তার রহস্যটা ভালো ক'রে বোঝা যায় না। অতীনও বোঝেনা, তবু তার আনন্দ পাওয়াটা অব্যাহতই থাকে।

এমনি ভাবে দিন যায়। এবং দিনে দিনে লখিয়ার প্রতি সুমিতার স্নেহ-ভালবাসাও আরো বাড়তে থাকে। দু'দিনের জন্যও লখিয়া তার দিদিমার কাছে গেলে সুমিতার ভালো লাগে না। ফজুয়াকে দিয়ে ডাকিয়ে আনে।

কিন্তু যে-লখিয়া সুমিতার এত প্রিয়, যে-লখিয়াকে সুমিতা এত ভালোবাসে সে-ই একদিন সুমিতার কাছে তার মৃত্যুকে ডেকে আনে। সত্যিই বড় অদ্ভুত এই জীবনের গতি ও প্রকৃতি!

সকাল গোটা নয়েক বোধ হয় হবে। সুমিতা যথারীতি দোতলার বারান্দায় ডেক-চেয়ারে আধ-শোয়া অবস্থায় বসে বই পড়ছে। মাঝে মাঝে সে বুকের ওপর বই উপুড় ক'রে রেখে অলসদৃষ্টিতে বাগানের দিকে চেয়ে থাকে। ত্যাখে তারই দেওয়া খেলনা নিয়ে বাগানের একদিকে লখিয়া খেলা করছে। সুমিতা অ-[illegible]বে তাই চেয়ে চেয়ে দেখে।

লখিয়াকে ছোটো ছোটো লোহার হাঁড়ি-কড়াই নিয়ে গাছ-পাতা, ধুলো-কাদা দিয়ে একমনে রান্নাবান্না করতে দেখা যায়। রান্না করতে করতে বোধ হয় তার জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জল কৈ? লখিয়া

জলের প্রত্যাশায় চারিদিকে তাকায়। দেখে কেউ কোথাও নেই। কী মনে ক'রে ধীরে ধীরে সে ইদারার কাছে চলে যায়। ইদারাটা প্রায় সব সময় লোহার শিক দিয়ে তৈরি একটা ঢাকনি দিয়ে ঢাকা থাকে। কিন্তু এখন,—কিছুক্ষণ আগে ভারীরা জল তুলে যাওয়ায় খোলা আছে। সুমিতা প্রথমে খেয়াল করেনি। সে ভাবতেই পারেনি ঐটুকু মেয়ে ঐ বিরাট ইদারা থেকে জল তোলার চেষ্টা করবে। যখন তার খেয়াল হয় ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে লখিয়া সিমেণ্টে বাঁধানো ইদারার উপর উঠে পড়েছে। মোটা কাছিতে বাঁধা বিরাট বালতিটাও কোনোক্রমে সে ঠেলে ইদারার মধ্যে ফেলে দেয়। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুমিতা লক্ষ্য করে। লখিয়া ঝুঁকে প'ড়ে অনেক নিচে ইদারার জল দেখার চেষ্টা করে। সুমিতা বারান্দা হ'তেই চিৎকার ক'রে ডাকে,—'লখিয়া—ওরে লখিয়া পড়ে যাবি।'

এর ফল আরও খারাপ হয়। লখিয়া হঠাৎ উপর দিকে মুখ তুলে দেখতে গিয়ে টাল খেয়ে ইদারার মধ্যে প'ড়ে যেতে যেতে কোনোক্রমে রক্ষা পায়। একটা হিম স্রোত সুমিতার মেরুদণ্ড দিয়ে ব'য়ে যায়। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে যায়। তারপর তার সব ধোঁয়া মনে হয়, সব অন্ধকার। তারপর আর কিছু মনে পড়ে না তার।

একটা হৈচৈ শুনে অতীন এসে দেখে সিঁড়ির কাছে ভীষণ ভিড়। লখিয়াকে কোলে নিয়ে লখিয়ার মা-ও সেখানে দাঁড়িয়ে। একটু উপরে উঠে অতীন যা' দেখে তা'তে তার মাথা ঘুরে যায়। দোতলা থেকে একতলার ঠিক মাঝে সিঁড়ির চাতালে সুমিতা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আর রক্ত! রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। মানুষের

শরীরে এত রক্ত থাকে! মাথা ঝিম ঝিম ক'রে [illegible]। প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারে না। পরক্ষণে অবস্থাটা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সে দু'হাতে সুমিতার সংজ্ঞাহীন দেহটাকে কোলে ক'রে দোতলায় বিছানায় এনে শুইয়ে দেয়।

মহামায়া ছুটে আসেন। ভয়ে তাঁর মুখ সাদা হয়ে যায়। প্রথমে তিনিও ভালো ক'রে কিছু বুঝতে পারেন না। সুমিতাকে ডাকেন। তারপর রক্ত দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠেন। সুমিতার বুকের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। কান্নাভেজা গলায় বিলাপ করেন ;—ওরে শান্তুরে, চোখ মেলে চা,—তাকা একবার আমার দিকে। তোকে আর কখনো কিছু বলবো নারে।'—বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁর গলা রুদ্ধ হয়ে যায়। সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপতে থাকে।

কান্না বোধ হয় খুবই সংক্রামক। অতীনের চোখও সজল হয়ে ওঠে।—সুমিতা কি মারা গেছে?—অতীন নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দেখে ধীরে ধীরে বিছানার মোটা গদিটাও রক্তে ভিজে যাচ্ছে। ঘৃণা নয়, ভয় নয়, দুঃখ নয়, কী একটা ভোঁতা অনুভূতি অতীনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সে শুধু সুমিতার দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ তার খেয়াল হয়। সুমিতা তো বেঁচে আছে! অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও এখনো ধীরে ধীরে তার শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে সে নিচে নেমে যায়। ডাক্তার ডাকতে হবে। গাড়ির কথা তার আর মনে থাকে না। সেই রক্ত মাখা অবস্থাতেই দৌড়তে থাকে।

বাজারের কাছে ডাক্তার অধিকারীর ডিসপেনসারি। রুদ্ধশ্বাসে অতীন এসে সেখানে পৌছয়। যা' অ[illegible] করেছিল তাই। ডাক্তার

অধিকারী কল্-এ বেরিয়েছেন। তবে এখনি আসবেন। কমপাউণ্ডার আশ্বাস দেয়।

অতীন চঞ্চলভাবে পায়চারি করে। ভাবে, ডাক্তার বসাকের কাছে যাবে কিনা। না, ডাক্তার বসাককে দিয়ে হবে না। অতীন পাশের ছোটো ঘরের টেবিলের পরে রক্ষিত মাইক্রোসকোপটার দিকে চেয়ে দেখে। কে একজন স্লাইড রেডি করছে। হঠাৎ অতীনের মনে হয় সুমিতা যদি মারা যায়?—বুকের ভিতরটা কেমন খালি বোধ হয় তার। মাথাটা ঝিম ঝিম করে। সত্যিই কি এমন হতে পারে? সত্যিই?—সুমিতা আর থাকবে না, এখানে না, কলকাতায় না, কোথাও না!—অতীনের চোখ জ্বালা করতে থাকে। চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। চোখ হতে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ে। কে জানতো যে সুমিতার জন্যও তার গোপন অশ্রু গ্রন্থিতে এত জল সঞ্চিত হ'য়েছিল!

এই ক'মাসে কটাই বা কথা হয়েছে তার সুমিতার সঙ্গে? কয়েকটা মাত্র। সেই একদিনই যা, আর না। সে তো কথা নয় যেন বিষের তীর। সমস্ত দেহমনে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। এখনো তার কিছু জ্বালা আছে তার রক্তে। এখনো সে ভুলতে পারেনি সে-কথা। সেই দৃষ্টির ঘৃণা আর সেই কথার জ্বালা সে বোধ হয় জীবনে কোনোদিন ভুলতেও পারবে না। তবু তারি জন্য এই অশ্রু! আশ্চর্য, সত্যিই বড় আশ্চর্য! —হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে অতীন বার বার চোখ মুছতে থাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার অধিকারী এসে পড়েন। তাঁর মধ্যে কিন্তু কোনো চাঞ্চল্য দেখা যায় না। স্টেথোস্কোপটা নাড়াচাড়া করতে করতে বেশ শান্তভাবে তিনি অতীনের সব কথা শোনেন। তারপর হঠাৎ হাঁক ছাড়েন,—'বিপিন প্লাজ্‌মা আছে?'

—'না স্যার।'—কম্পাউণ্ডার বিপিন দে বিনীতভাবে উত্তর দেয়।

ডাক্তার আপন মনে গজ গজ করেন। তারপর বলেন,—'অন্ত কোথাও পাওয়া যাবে?'

—'এখানে ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে স্যার!'—কম্পাউণ্ডার ডাক্তারকে আপ্যায়িত করে।

—'তবু তুমি একবার ছাখো।'—ডাক্তার অধিকারী বলেন।

বিপিন সঙ্গে সঙ্গে বার হ'য়ে যায়।

ডাক্তার অধিকারী নিজের জিনিসপত্র গোছাতে থাকেন। একটু পর বিপিন ফিরে এলে ওষুধপত্র, ডাক্তারী সরঞ্জাম ও একজন সহকারীকে নিয়ে ধীরে সুস্থে রিক্সায় গিয়ে ওঠেন।

সুমিতাকে দেখার পর কিন্তু ডাক্তারের ব্যবহারের পরিবর্তন হয়। গম্ভীর মুখে দ্রুত হাতে কাজ করে চলেন তিনি। প্রথমেই বলেন,—'জল গরম করুন।'

তারপর কোন্ এক অজানা অজ্ঞাত শক্তির সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

সমস্ত বাড়ি নিঝুম। শুধু স্টোভের একটা একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ ও ডাক্তারী যন্ত্রপাতির টুং টাং শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

নিঃশব্দে,—অতি ধীর পদক্ষেপে সময় অতিক্রান্ত হয়।

রক্ত,—রক্ত লাগবে। রক্ত দিতে হবে সুমিতাকে। এখনই।

ইচ্ছে করলে মহামায়া দিতে পারেন রক্ত।

মহামায়া? শরীরের শেষ রক্তবিন্দু নিয়ে নিন না ডাক্তার। তাঁর প্রাণ দিয়ে যদি শান্তুকে বাঁচানো যায় তো তাই করুন ডাক্তার।

কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে মহামায়ার রক্তের সঙ্গে সুমিতার রক্তের গ্রুপ মেলে না। না, মহামায়ার রক্ত সুমিতাকে দেওয়া যাবে না।

তাহলে? তাহলে কী হবে?

অতীনের তো সুন্দর স্বাস্থ্য। অতীন কি দিতে পারে রক্ত?

নিশ্চয়ই। অতীন হাত এগিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে জানা যায় রক্তের গ্রুপ মিলেছে। দু'জনেরই এ-বি গ্রুপের ব্লাড। সঙ্গে সঙ্গে অতীনের শরীর থেকে তিন শ' সি. সি. রক্ত নিয়ে সুমিতার দেহে দিতে শুরু করেন ডাক্তার।

কিন্তু আরো, আরো রক্ত চাই। অনেক রক্ত।—এ-বি. গ্রুপের এত রক্ত এখানে কোথায় খোঁজ করবেন ডাক্তার?

এক উপায় আছে। কলকাতায় ব্লাড-ব্যাঙ্ক্ থেকে রক্ত আনা যায়।

—'আপনার স্ত্রীকে যদি বাঁচাতে চান অতীনবাবু তাহলে এখুনি কলকাতায় চলে যান। ব্লাড-ব্যাঙ্ক্ থেকে রক্ত আনুন।

স্ত্রী! স্ত্রী কে! অতীন ভারি আশ্চর্য হয়। ওহো, অতীনই বোধ হয় এক সময় ডাক্তারকে বলেছে যে সুমিতা তার স্ত্রী। হ্যাঁ, সে-ই বলেছে। তবু কথাটা একটা মধুর গুঞ্জন তোলে তার মনের মধ্যে।

—'যেভাবে হোক পনেরো-ষোল বোতল রক্ত নিয়ে আসুন। কিছু রক্ত নষ্টও হয়ে যেতে পারে পথে। যান। এখনই যান।'

অতীন দেরি করে না। সেই মুহূর্তেই অনাদি দাসকে গাড়ি বার করতে বলে। তারপর গাড়ি ছোটে,—সমস্ত গাছপালা, পথপ্রান্তরকে পিছনে ফেলে, গতি সম্পর্কে সমস্ত আইন লঙ্ঘন ক'রে অবাধ ও তীব্র গতিতে ছুটে চলে। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে।

পরের দিনই রক্ত নিয়ে ফিরে আসে অতীন। রক্ত জোগাড় করতে

অবশ্য তার কম হাঙ্গামা পোহাতে হয়নি। ব্লাড-ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখে সেখানে মাত্র দশ বোতল এ-বি, গ্রুপের ব্লাড মজুত আছে। অথচ তার চাই ষোলো বোতল রক্ত। সুতরাং কী আর করে, ব্যাঙ্ক থেকে প্যানেল ডোনারদের ঠিকানা নিয়ে তাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়। যারা মাঝে মাঝে প্রায়ই রক্ত দেয় তাদের ঠিকানা, রক্তের গ্রুপ, বয়স, শরীরের ওজন,—সবকিছুই ব্লাড-ব্যাঙ্কের খাতায় লেখা থাকে। অতীন জন ছয়েকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে তাদের ব্যাঙ্কে নিয়ে আসে। একজনের বৌ তো জানতে পেরে কিছুতে তার স্বামীকে রক্ত দিতে দেবে না। পঞ্চাশ টাকায় আড়াইশো সি.সি. রক্ত, তা-ও সম্পূর্ণ টাকা সে পাবে না। দরকার নেই তার ও' টাকায়। বলে, 'রক্ত দিলেই ওর শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। এই তো ক'মাস আগে রক্ত দিয়েছে। এখন আর আমি রক্ত দিতে দেবো না। কেমন যাক দেখি আমাকে না-বলে।'

অতীন প্রমাদ গণে। অনেক করে সুমিতার কথা বলে। একটি মেয়ের জীবন যে এই রক্ত দেওয়ার ওপর নির্ভর করছে সে কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলে। তবু কিছু হয় না। শেষে তার আসল কথাটা মনে পড়ে যায়। বলে—'ব্লাডের পঞ্চাশ টাকা ছাড়া আরো কুড়িটাকা আমি ফল খাওয়ার জন্য দেবো। তাহলে আর শরীর খারাপ হবে না।

এই কথায় কাজ হয়। অবশেষে উপরন্তু কুড়িটা টাকা তার স্ত্রীর হাতে দিয়ে তবে সে তাকে ব্লাড-ব্যাঙ্কে আনতে পারে।

অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় এমনিভাবে ছুটোছুটি ক'রে প্রয়োজনীয় রক্ত সংগ্রহ ক'রে অতীন যখন আবার দেওঘরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় তখন সৌভাগ্যক্রমে সুমিতার রক্তপাত প্রায় বন্ধ হয়েছে। ক্লান্ত অবসন্ন সুমিতা চোখবুজে শুয়ে আছে। বোধ হয় ঘুমচ্ছে। ডাক্তার

অধিকারীর মুখ উজ্জ্বল।—'আর ভয় নেই'—ফিস ফিস করে বলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে রক্ত দেওয়া শুরু হয়। ফোঁটায় ফোঁটায় তা' সুমিতার শরীরে প্রবেশ করতে থাকে। ধীরে ধীরে তার মুখের চেহারার পরিবর্তন হয়। ক্রমে জীবনের স্পর্শ লাগে সেখানে।

সামান্য কিছু মুখে দিয়েই অতীন একটা চেয়ার পেতে সুমিতার পাশে এসে বসে। মহামায়া তাকে বিশ্রাম করতে বলেন। কিন্তু অতীন তা গ্রাহ্য করে না। তার মন বলে, অনিদ্রা? পরিশ্রম? তা' স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য এ'টুকুও সে করবে না? সুমিতা কি তার স্ত্রী নয়? সুমিতা যা' খুশি বলুক। সে ছেলেমানুষ। বাইশ-তেইশ বছর বয়স হয়েছে ব'লেই কি সে ছেলেমানুষ নয়?—তাছাড়া খাটের উপর শায়িত এই যে অসহায় দুর্বলদেহ অর্দ্ধনিদ্রিত মেয়েটি,—এ'কি সমস্ত হৃদয় দিয়ে মূক আকুলতায় তারই উষ্ণ আশ্রয় কামনা করছে না? অন্তরের গোপন রহস্যলোকে অতীন যেন তার মৌন-আবেদন অনুভব করে। গভীর মমতায় সে সুমিতার দিকে চেয়ে থাকে। একটি হাত সুমিতার ক্লান্ত দুর্বল হাতের 'পরে রাখে। সুমিতা হাত সরিয়ে নেয় না। তেমনি চুপচাপ পড়ে থাকে।

সারা রাত্রি অতীনের এমনিভাবে সুমিতার পাশে বসে কেটে যায়। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হয়। পূর্বদিক ফরসা হয়। ধীরে ধীরে তা ঘন আরক্ত হয়ে ওঠে। সেই রক্তিমা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। নিমীলিতনেত্র সুমিতার গণ্ডেও যেন সেই রঙের আভাস লাগে। নিদ্রাহীন চোখে অতীন বার বার সেদিকে চেয়ে দেখে।

বাতাসে র'ভের ফুল ও ইউকলিপটাসের মিশ্রিত মধুর গন্ধ। জানালা

দিয়ে সেই শীতল সুরভিত প্রভাতী হাওয়া ফুর ফুর করে ঘরে এসে ঢোকে। অত নের মাথায় মুখে গায়ে লাগে। তার বিনিদ্র শ্রান্ত স্নায়ুতে যেন একটা আবেশে সৃষ্টি করে। স্বপ্নালু চোখে সে বাইরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়।

চারিদিকে পাখির কলরব শুরু হয়েছে। ছোটো ছোটো অজস্র পাখি বাসা ছেড়ে অন্তরের কী এক অজানা আনন্দে অকারণে শব্দ ক'রে উড়ে চলে যাচ্ছে। আবার উড়ে উড়ে ফিরে আসছে। বাগানের ঘাসের 'পর নেচে নেচে খেলা করছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন এক অপূর্ব আনন্দের সুরে অকস্মাৎ ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বেজে উঠেছে।

অতীনের সবকিছুই অদ্ভুত সুন্দর মনে হয়।

সকাল গোটা নয়েকের সময় শুকমুখে অরবিন্দ এসে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে আসেন তাঁর বাল্যবন্ধু ডাক্তার সেন, গাইনোকোলজির প্রফেসর। আর আসেন বিখ্যাত সার্জন ডাক্তার ভাটা, এম. এস., এফ. আর. সি. এস.। তাঁরা সকলে রাত্রের ট্রেনে এসেছেন। ট্রেন কিছু লেট ছিল, তাই এই দেরি।

ডাক্তার সেনকে দেখলে তিনি যে একজন বড় ডাক্তার, কলেজের প্রফেসর তা সহজে বোঝা যায় না। ছোটো খাটো অত্যন্ত সাধারণ চেহারা তাঁর। কথাও খুব কম বলেন। একটু মুখ চোরাই মনে হয়।

ডাক্তার ।টা কিন্তু একেবারে তাঁর বিপরীত। ছ'ফিটের ওপর লম্বা এবং সেই অনুযায়ী চওড়া। বিরাট মঙ্গোলিয়ান ফেস্‌। চিক্‌বোন্‌ দুটো উঁচু। গায়ের রঙও সেইরকম হল্‌দেটে ফরসা। ড্রিঙ্ক্‌ করার অভ্যাস আছে। একটু বেশিই বোধ হয় চলে। সব সময়ই তাই গালদুটো টকটকে লাল।

তাঁর চেহারা দেখলে রোগী ভরসার চেয়ে ভয়ই বোধহয় বেশি পায়। অপারেশনের পূর্বে মুখে মাস্ক্ বাঁধা অবস্থায় ছুরি হাতে তাঁকে দেখলে অত্যন্ত সাহসী লোকেরও ভয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

ডাক্তার ডাটা জেনারেল সার্জন। সব রকম অপারেশনই তিনি করেন। তিনি ঠ্যাঙ্‌ও কাটেন, আবার লাঙ্‌ও অপারেশন করেন। হাতে সময় থাকলে কোনো কেসই তিনি ছাড়েন না। হাসপাতালে অত্যন্ত খারাপ অবস্থার রোগীর ওপরও তিনি অস্ত্রোপচার করেন। দুঃসাহসী সার্জন ব'লে তার খ্যাতি আছে। তাঁর হাতে প্রচুর রোগী ভালো হয়েছে। আবার মারাও গেছে প্রচুর। খারাপ হয়েছে তার চেয়েও বেশি। তবু তাঁর খ্যাতি এতটুকু কমেনি, উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

তিনি এসেই সুমিতাকে পরীক্ষা করেন। অরবিন্দ ও অতীন ঘরের একপাশে জানালার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন। তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করতে থাকেন। সুমিতার শরীরের ও রকম অবস্থাতেও তাকে প্রায় একটা রবারের বড় পুতুলের মত নেড়েচেড়ে দেখেন তিনি। তবে বেশি সময় নেন না। দ্রুত পরীক্ষা শেষ করেন। তারপর অরবিন্দকে ডেকে গম্ভীর ভাবে পাইপ টানতে টানতে বলেন,—'বেশ, ঠিক আছে। এখুনি আমি অপারেশন করবো।'

—'অপারেশন?—অপারেশনের কী প্রয়োজন?'—অতীন অত্যন্ত বিস্মিত হয়।

ডাক্তার ডাটা কটমট ক'রে অতীনের দিকে তাকান।—'আপনি ডাক্তার?'—গুলির মত তিনি কথাটা অতীনকে লক্ষ্য ক'রে নিক্ষেপ করেন।

বিরক্ত হলেও অতীন বিনীত ভাবেই জানায় যে সে ডাক্তার নয়।

—'তবে?'

অতীন আমতা আমতা ক'রে বলে,—'পেসেণ্ট তো এখন ভ আছে।'

—'ভালো আছে আপনি ঠিক জানেন?'—ডাক্তার ডাটা আবার কটমট ক'রে তাকান। অ্যালকোহল-আরক্ত মুখ তাঁর আরো আরক্ত হয়ে ওঠে।—'এখুনি যদি অপারেশন না-করান তাহলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই পেসেণ্ট এক্সপায়ার করবে। এই আমার ওপিনিয়ন। এখন আপনারা যা খুশি করতে পারেন। ছাট্স্ আপ্ টু ইউ।'—ব'লে তিনি অরবিন্দের দিকে তাকান। অতীনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন।

একে এই বিশ্রী ব্যবহার, তার উপর স্থমিতার সামনেই সে এক্সপায়ার করবে বলে ভয় দেখানোতে অতীনের মাথা গরম হয়ে ওঠে। হঠাৎ কিছু না-ভেবেই বোধ হয় সে দৃঢ়স্বরে বলে,—'অপারেশন করতে আমি দেবো না।'

স্থমিতা কী ভাবে কে জানে। সে শুধু নির্জীবের মত বিছানায় পড়ে থাকে। অরবিন্দ অধোমুখে অতীনের কথায় সায় দেন। বলেন,—'অতীন যখন বলছে তখন আমি অপারেশনে মত দিতে পারি না।'—মহামায়াও তাতে মৌন সম্মতি দেন।

ডাক্তার ডাটা একটুক্ষণ সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে থাকেন। তারপর ক্ষুব্ধস্বরে বলেন,—'বেশ, আপনারা যা' ভালো মনে করেন তাই করুন। আমার কী?'—নিখুঁত বিলিতি কায়দায় তিনি শ্রাগ্ করেন।

একটু পর ডাক্তার সেনের দিকে তাকিয়ে আবার বলেন,—'সেন, হোয়াটস্ ইওর ওপিনিয়ন?'

মুখচোরা ডাক্তার সেন আমতা আমতা ক'রে বলেন,—'দেখুন ডক্টর ডাটা, আমার মনে হয় অপারেশনের আর দরকার হবে না। দেখাই যাক না কী হয়।'

বিরস কণ্ঠে ডাক্তার ডাটা বলেন,—'বেশ, দেখুন। তবে আমাকে এতদূর না আনলেই ভালো হতো। আমার বহু পেসেণ্ট সাফার করলো।'—ব'লে তিনি তাঁর নিভে-যাওয়া পাইপে অগ্নি সংযোগ করেন।

অতঃপর প্রচুর দক্ষিণা নিয়ে পরের ট্রেনেই ডাক্তার ডাটা কলকাতা রওনা হয়ে যান।

ডাক্তার সেন থেকে যান। কিছুপর তিনি ঘর থেকে সকলকে বার ক'রে দিয়ে আবার ভালোভাবে স্মিতাকে পরীক্ষা করেন। স্মিতা তাঁর বন্ধুর মেয়ে। তাঁরও মেয়ের মত। স্মিতাকে পূর্বে তিনি বহুবার দেখেছেন। বেশ পরিচয়ও আছে। তাঁর কাছে স্মিতা বোধ হয় একটু লজ্জা পায়। তিনি সস্নেহে বলেন,—'লজ্জা কী মা। লজ্জার কিছু নেই। একটু দেখি এখানটা।'—অত্যন্ত সাবধানে তিনি সব কিছু পরীক্ষা ক'রে দেখেন।

পরীক্ষান্তে আশ্বাস দিয়ে বলেন,—'কোনো ভয় নেই। এইবার তুমি ভালো হয়ে উঠবে। এখন নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোও দেখি। আমি ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি।'

তিনি ডাক্তার অধিকারীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চিকিৎসার ব্যবস্থা দেন।

সযত্নে নিজের হাতেই ইঞ্জেক্শন দেন স্মিতাকে। তেমনি ধীরে ধীরে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত দেওয়া চলতে থাকে। ডাক্তার সেন শুধু ড্রিপ্‌টা একটু বাড়িয়ে দেন। স্ট্যাণ্ডের' পরে রক্তের [illegible] দুপাশে

ঝোলানো হট্-ওয়াটার ব্যাগটা গরম আছে কিনা দেখেন। তারপর নিশ্চিন্তে তিনি সুমিতার খাটের পাশের চেয়ারে ব'সে পড়েন।

সুমিতা তেমনি আধো ঘুমন্ত, আধো জাগরিত অবস্থায় চোখ বুজে শুয়ে থাকে। তাকে খুব ক্লান্ত মনে হয়। কিন্তু তার মুখে, তার দেহে নতুন জীবনের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

তারপর দিন যায়, রাত্রি আসে। রাত্রি যায়, দিন আসে। কলকাতার বিখ্যাত সার্জনের ভবিষ্যৎবাণী অগ্রাহ্য ক'রে আটচল্লিশ ঘণ্টা পরও সুমিতা বেশ ভালোভাবেই বেঁচে থাকে। এবং দিনের পর দিন ধীরে ধীরে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে।

চার

অতীন এসে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। যদিও তার বয়স মাত্র ছাব্বিশ, তবুও এই বয়স সম্পর্কেই তার একটা সংকোচ ছিল। কয়েক দিন ক্লাস করার পর সে-সংকোচ তার দূর হয়েছে। তার বয়সী এবং তার চেয়েও বয়সে বড় অনেক ছাত্রই তাদের ক্লাসে আছে। তা' ছাড়া যে-কয়জন মেয়ে তাদের সঙ্গে পড়ে তাদের মধ্যে অনেকেই তার বয়সী বা তার চেয়ে বয়সে বড়। অন্তত তার তাই মনে হয়েছে।

একজন ভদ্রমহিলা আছেন তাঁর মেয়েই এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে। ক্লাসের সকলের তিনি অঞ্জলিদি। তিনি বই খাতার সঙ্গে এক ডিবে পানও নিয়ে আসেন। ডিবেটি দেখতে অনেকটা ছোটো-খাটো একটা বই-এর মত। তাই খাতার সঙ্গে নিয়ে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না। ছেলেদের তাঁর পানের প্রতি খুবই লোভ। তিনিও তা' অকৃপণ হস্তে সকলকে দান ক'রে থাকেন। এ' বিষয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্য সুবিদিত। তিনি খুব মিশুক প্রকৃতিরও। ছাত্রছাত্রী সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেশেন। শুধু নামে দিদি নয়, সকলকেই প্রায় তিনি ছোটো ভাইবোনের মত দেখেন। অনেকে তাঁর বাড়ি গিয়েও উৎপাত করে। তিনি হাসিমুখে প্রসন্ন অন্তরেই তা' সহ্য করেন।

—'অঞ্জলিদি আজ কী খাওয়াবেন বলুন।'—কয়েকটি ছেলে হয়তো তাঁর বাড়ি গিয়েই উপস্থিত।

তিনি স্মিতমুখে বলেন,—'কী খাবে বলো।'

ছেলেরা যার যা' মনে আসে ফরমাশ করে। তিনি হাসিমুখে তা' শোনেন। তারপর ঘরে যা' আছে তাই খেতে দেন। ছেলেরা খেয়েদেয়ে

কৃত্রিম অসন্তোষ দেখিয়ে বলে,—'বেশ তো, চাইলাম মাংস আর লুচি, আর খাওয়ালেন পরোটা আর চা। এ' হবেনা। আর একদিন এসে মাংস আর লুচি খেয়ে যাবো।'

তিনিও সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে বলেন,—'বেশ তো হবে আর একদিন।'

আর একদিন হয়তো সত্যিই মাংস লুচি খাইয়ে দেন কিংবা দেন না। কিন্তু যা-ই দেন আন্তরিকতার সঙ্গে দেন। তাঁর আন্তরিকতায় কোনো খাদ নেই। অতীনের তাঁর এই অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি ও এই আন্তরিক ব্যবহার অত্যন্ত ভালো লাগে। যদিও সে একটু লাজুক প্রকৃতির এবং চটক'রে সকলের সঙ্গে মিশতে পারে না, বিশেষত স্ত্রীলোক হলে তো কথাই নেই,—তা সত্বেও অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে সেও মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। অঞ্জলিদিও তাকে যেতে বলেন এবং ঠিক ছোটো ভাই-এর মতই স্নেহ করেন।

সুমিতারা এখনো দেওঘরে আছে। সে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে উঠেছে। তবে মহামায়া ঠিক করেছেন আরো কিছুদিন তাকে নিয়ে ওখানে থাকবেন। অবশ্য অতীনের সঙ্গে যথারীতি পরামর্শ করেই এটা স্থির করেছেন তিনি। অতীনের কলকাতায় আসার কয়েকদিন পূর্বে তার সঙ্গে তাঁর কথা হয়।—'ছাখো বাবা, গরমকালটাই যদি কষ্ট ক'রে এখানে থাকলুম তখন একেবারে শীত কাটিয়ে শাম্বর শরীরটা ভালো-ভাবে সারিয়ে যাওয়াই ভালো। তুমি কি বলো?'

তিনি সুমিতা সম্পর্কে সব কথাই আজকাল অতীনকে জিজ্ঞাসা করেন। আর জিজ্ঞাসা যখন করেন তখন অতীনও একটা উত্তর দেয়। অবশ্য তাঁর মনের ভাব বুঝে তাঁর মনোমত উত্তরই দেয়।

এ' কথার উত্তরেও তাই সে বলেছে—'বেশ তো থাকুন না। এখানে শীতকালটাতো খুবই ভালো শুনেছি।'

—'পূজোর ছুটিতে তুমি আসবে তো।'

অতীন বলেছে,—'আসবো।'

পূজোর পর অতীন দেওঘরে আবার গিয়েওছিল। কিন্তু দিন পনেরো থেকেই পালিয়ে আসে। সুমিতাকে সে এখনও এড়িয়ে চলতে চায়। তবে এখন অন্যকারণে। সুমিতার কাছে গেলেই তার হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হ'য়ে ওঠে। সুমিতাকে সে যে ভালোবেসে ফেলেছে এ'কথা আজ আর তার কাছে গোপন নেই। এবং এ'ভালোবাসা যে ক্ষণিকের ভাবপ্রবণতা নয়, এ'কথাও সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে।

এই স্বল্পকালের মধ্যেই এই রক্তক্ষয়ী ভালোবাসা যে কী ক'রে সম্ভব হলো তা' সে বুঝতে পারে না। যে-নারী তাকে আঘাত, অবজ্ঞা ও ঘৃণাই শুধু দিয়েছে, সেই নারীই অগোচরে ধীরে ধীরে কী ক'রে তার সমস্ত অন্তর অধিকার ক'রে বসলো তা-ও তার কাছে এক পরম বিস্ময়। হয়তো ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার মত ভালোবাসার জন্যও মানুষ ব্যাকুল। উভয় তৃষ্ণাই আদিম এবং সমানভাবে স্বাভাবিক। এ'যাবৎ নারী-সান্নিধ্য-হতে-বঞ্চিত অতীনের হৃদয়ে এ' তৃষ্ণা হয়তো এতদিন সুপ্ত ছিল। আজ সুমিতাকে কাছে পেয়ে তা' অকস্মাৎ উদগ্র হ'য়ে উঠে ধীরে ধীরে তাকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

অতীন অনেক চেষ্টা করেছে অন্তর থেকে সুমিতার আসন অপসারিত করতে। কিন্তু পারেনি। তাই সে তাকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে চায়, তার কাছ হতে যতদূর সম্ভব দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করে। এই অত্যল্পকালের মধ্যেই সে অনুভব করেছে যে প্রেম

একেবারেই সুখের নয়। গভীর প্রেম বোধহয় গভীর দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ছ' মাস হলো অতীন বালিগঞ্জের এই বাড়িতে আছে। অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। অরবিন্দের সঙ্গেও অতীনের যেন নতুন ক'রে পরিচয় হয়। মেয়ের সামনে তাঁকে যেমন ব্যক্তিত্বহীন দুর্বলচিত্ত মনে হয় আসলে তিনি সে-রকম নন। তিনি খুবই দৃঢ়চিত্ত এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অতীন ভালো ক'রে দেখেছে মেয়ের কাছে তাঁর একরূপ আর অন্য সকলের কাছে আর একরূপ। আসলে মানুষটা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। এই স্নেহই তাঁর বুদ্ধি, দৃঢ়তা ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট ক'রে দেয়।—অতীনকেও তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেন এবং তার সঙ্গে প্রায় বন্ধুর মতই ব্যবহার করেন। অতীনও তাঁকে শ্রদ্ধা করে। পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছরের এই সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়কে তার খারাপ লাগে না। তবু সে তাঁকে কিছুটা এড়িয়েই চলে।

এ' বাড়িতে তার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে হরেনের বৌ সতীর সঙ্গে। হরেনকে সে হরেনদা বলে আর সতীকে বলে বৌদি। এই অল্পদিনের মধ্যেই তাদের ঘনিষ্ঠতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে মনে হয় যেন কতদিনের পরিচয়। এর সব কৃতিত্বটা অবশ্য সতীর প্রাপ্য। তার সংকোচহীন প্রগলভ ব্যবহারের ফলেই এটা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছে।

দেওঘর থেকে যেদিন অতীন এখানে প্রথম এসেছে সেই দিনই সতী তার স্বভাবসুলভ রঙ্গরসিকতার সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করেছে। বলেছে, —'বাবু তো চলে এলেন, কিন্তু এখানে কি মন টিঁকবে? দেওঘরেই তো সকলে রইলেন।'

অতীন বলেছে,—'হ্যাঁ, মা এখন ওখানেই থেকে গেলেন।'

—'ওঃ, মায়ের জন্য যেন কত মন কেমন করছে! কচি ছেলে কিনা!'—সতী চাপা হাসি হেসেছে।

অতীন আমতা আমতা ক'রে বলেছে,—'তা',—মায়ের অভাব—'

সতী আর তাকে কিছু বলতে দেয়নি। খিল খিল ক'রে হেসে উঠেছে।

দু'দিন বাদেই সতী আবার রসিকতার রঙ ছড়িয়েছে।

কী জানি কেন অতীনের রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। উঠতে একটু বেলা হয়েছে।

দু'বার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় সতী নিজে এসে জিজ্ঞাসা করেছে,—'কী, এত বেলা হলো যে উঠতে!'

অতীন সত্যি কথাই বলেছে,—'রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি।'

শুনে সতী মুচকি হেসেছে।—'তা তো হবে না-ই।—রাত্রে খালি একজনের কথা মনে পড়ে, তাই না?'

অতীন অপ্রস্তুত হয়ে বলেছে,—'কার কথা আবার মনে পড়বে?'

—'কার কথা তা' বলে দিতে হবে?'—সতী চোখ দিয়ে হেসেছে। —'নিজের বুকের মধ্যে একবার চেয়ে দেখুন না, তা' হলেই দেখতে পাবেন। আমাদের মত বাজে লোক নন তিনি।'

অতীন বোকার মত না-ভেবে চিন্তেই বলেছে,—'কেন, আপনার কথা কি আমার মনে পড়তে পারে না?'

—'আমার কথা? ওমা তাই নাকি!—রাত্রে, একা একা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ'পাশ ও'পাশ করতে করতে আমার কথা মনে পড়ে?'—সতী মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে।

অতীন একেবারে আকণ্ঠ রাঙা হয়ে উঠেছে। —'আহা, রাত্রের কথা আমি বলিনি। অন্য সময়—'

এমনিভাবেই দিনে দিনে অতীনের সংকোচ কিছুটা কমেছে। ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য দ্রুত হলেও ধাপে ধাপে হয়েছে এটা, একদিনে নয়। তাহলেও স্পষ্টতই তা' সতীর নিঃসংকোচ প্রগলভ ব্যবহারের জন্যই এত তাড়াতাড়ি হয়েছে। নাহলে অতীনের মত ছেলের পক্ষে কোনো দিন আদৌ ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

সতী দু'টি সন্তানের জননী। বড় ছেলে বাসুর বয়স ছয়, ছোটো তিলুর বয়স দুই। অতীনের চেয়ে দু'এক বছরের বোধ হয় বড়ই হবে সে। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী ঈষৎ স্থূল হাসিখুশি এই যুবতী নারীর সঙ্গ অতীনের খারাপ লাগে না। বরঞ্চ সময় সময় বেশ ভালোই লাগে। পড়াশুনার অবসরে তাই সে প্রায় সতীর ঘরে গিয়ে হাসিগল্পে সময় কাটায়।

অরবিন্দের বালিগঞ্জের এই বাড়িটি অনেকখানি জমির উপর তৈরি। গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। দেশী-বিদেশী নানারকম ফুলের গাছ সেখানে। একপাশে ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট। চারপাশে তার মানুষের বুক পর্যন্ত উঁচু সুকর্তিত গাছের বেড়া। বাড়ির পিছন দিকে অল্প একটু উন্মুক্ত জমিতে একটি ফলের গাছও আছে।

বাড়িটিও বিরাট। একতলায় ড্রইংরুম, অফিস, লাইব্রেরী ইত্যাদি। দোতলায় একটি বিরাট ঘর উৎসবাদিতে ডাইনিং হলরূপে ব্যবহৃত হয়। তেতলায় অরবিন্দ বাস করেন।

অরবিন্দের প্রাসাদতুল্য এই বাড়ি দেখলে তাঁর যা অবস্থা তার চেয়েও তাঁকে ধনী মনে হয়। বস্তুত বাড়ির ব্যাপারে তাঁকে কিছু

সৌখিনই বলা চলে। দেওঘরের বাড়িটিও চমৎকার। অবশ্য বালিগঞ্জে এত বড় বাড়ি করা সম্ভব হয়েছে প্রধানত তাঁর বাবার দূরদর্শিতায়। এখানকার জমিও তিনি অনেকদিন পূর্বে খুব সস্তায় কিনে রেখেছিলেন। অরবিন্দই একদিন অতীনকে সেকথা বলেছেন।

কী কথায় যেন অতীন বাগান সমেত এই বাড়িটির প্রশংসা করেছিল। বিশেষ ক'রে বাগানের কথাই বলেছিল। কলকাতায় ক'জনের বাড়িতেই বা এমন সুন্দর বাগান, খেলার জায়গা ইত্যাদি আছে? যাঁরা খুব ধনী তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

সে-কথা সমর্থন ক'রে অরবিন্দও বলেছিলেন,—'হ্যাঁ, সত্যিই তাই। তবে এ' বাড়ি কি আর আমার মত মানুষের পক্ষে করা সম্ভব হতো? ইচ্ছে থাকলেও হতো না। বাবার জন্যই হয়েছে।—আমি তখন ছোটো। সে-সময় এখানে ঝোপ, জঙ্গল, ডোবা, খানা আর সবজির ক্ষেত ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। এখানে-ওখানে বড় জোর দু'একটা কুঁড়ে ঘর দেখা যেতো। পায়ে হাঁটা রাস্তা ছাড়া রাস্তার তেমন কোনো বালাই ছিল না বল্লেই হয়। সেই সময় বাবা অত্যন্ত সামান্য টাকায় এই সমস্ত জমিটা কিনে রাখেন। তখনই তিনি বুঝেছিলেন যে অল্পদিনের মধ্যে এখানটা সহর হয়ে যাবে। জমির দাম বহুগুণ বাড়বে।—বাড়ি করার চিন্তা অবশ্য তিনি তখন করেননি। কারণ নেবুতলায় আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে আমাদের ছোটো সংসারের স্থান ভালোভাবেই সংকুলান হচ্ছিল।—তাছাড়া বাবা ছিলেন সাত্বিক প্রকৃতির মানুষ। আরাম ও আড়ম্বর একেবারে পছন্দ করতেন না। ইউরোপের কাছ হতে পাওয়া এই আধুনিকতা ছিল তাঁর দু'চক্ষের বিষ। সনাতন ভারতবর্ষের সরল জীবন যাপনের আদর্শই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ।'

অরবিন্দের বাড়িতেও বোধ হয় তাই দু'রকম কৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বাইরেটায় ইওরোপের ছোঁয়া-লাগা আধুনিকতার ছাপ। ভিতরে কিছু পরিবর্তিত সেই চিরদিনের ভারতবর্ষ। অফিস, লাইব্রেরী, ড্রইংরুম প্রভৃতি আধুনিক টেবিল চেয়ার সোফা কৌচে সাজানো। মেঝেতে দামী কার্পেট পাতা। ভিতরে কিন্তু একটি ঘরেও কার্পেট নেই। নিত্য ধোয়া-মোছা হয়। ঠাকুর ঘরে ঠাকুর আছেন। রান্না-ঘরেও ঠাকুর। রান্না করে।

নিচের তলায় পিছনের দিকে ঝি-চাকরেরা থাকে। দোতলায় একখানি বড় ঘরে অতীন থাকে। ইচ্ছে করেই সে দোতলার ঘর বেছে নিয়েছে। হরেন ও সতীর সংসারও এই দোতলায়। সেজন্য তাদের মধ্যে মেলামেশাটা খুবই হয়।

সকালবেলা অতীন কোথায় যেন বার হচ্ছে। সতী এসে পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়। বলে,—'ঠাকুর পো, শোনো।

আজকাল আর সতী তার কথায় বার্তায় সুমিতার কোনো ইঙ্গিত করে না। দু'চার দিন মাত্র সে সুমিতার বিষয় নিয়ে অতীনের সঙ্গে ঠাট্টা পরিহাস করেছিল। তারপর আর করেনি। অতীন কিছুটা বিব্রত বা বিরক্ত হয় বলেই সে তা' করে না কিংবা সে নিজেই আর তা' পছন্দ করে না তা' ঠিক বোঝা যায় না।

অতীনকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাসিমুখে সতী বলে,—'একটা কথা রাখবে ঠাকুরপো ?'

অতীন জিজ্ঞাসা করে,—'কী ?'

'আগে বলো কথা রাখবে।'

—'বেশ তো, না-জেনে বলি কী করে ?'—অতীন সহাস্যে বলে।

—'এত জানার কী আছে ? আমি কি তোমাকে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে বলবো ?'—সতী স্মিতমুখে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে। হয়তো অভ্যাস বসেই।

অতীনের মুখ সামান্য লাল হয়ে ওঠে। বিব্রত হয়ে বলে,—'আহা, আমি তাই বলেছি নাকি ?'

হরেন তক্তপোষের উপর ব'সেছিল। বাসুকে সে পড়াচ্ছিল। সে বোধহয় মনে মনে বিরক্ত হয়। কিন্তু সতীর ভয়ে তা' প্রকাশ করে না। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম ক'রে বলে,—'কেন ছেলেমানুষকে লজ্জা দিচ্ছ ? বলই না কী কথা।'

—'ছেলেমানুষ !'—সতী অতীনের বলিষ্ঠ দেহের সারা অঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে চাপা হাসি হাসে। অতীন এবার পুরোপুরি লাল হয়ে ওঠে।

—'বেশ, কথা দিলে তো ?'—সতী আবার প্রশ্ন করে।

অতীন নিরুপায়ভাবে বলে,—'আচ্ছা দিলাম।' শঙ্কিত হয়ে সে ভাবে কে জানে কী হুকুম করবে সতী। সম্পূর্ণ সংকোচহীন এই রহস্যময়ী নারীকে সে ভালো বুঝতে পারে না।

স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে সতী বলে,—'ছায়াশ্রীতে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' হ'চ্ছে। নিয়ে যাবে ?'

—'সীনেমা ? হরেন দা নিয়ে যান না।'

—'কে, আমি ?'—ভীতভাবে হরেন বলে, 'আমি ও'সব পারি না।—তুমি নিয়ে যাও ভাই। ছ'টা থেকে নটা, এই তো সময়। তোমার কী খুব অসুবিধা হবে ?'

অতীন বিব্রত হয়। ভাবে, সতী নিঃসম্পর্কীয়া রমণী। তাছাড়া পরিচয়ও বেশি দিনের নয়। অবশ্য এর মধ্যেই ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাকে নিয়ে একা সিনেমায় যাওয়া কি

উচিত হবে? ফিরতে বেশ রাত্রি হবে। কে কি মনে করবে কে জানে। তা ছাড়া সতীর মত প্রগলভ নারীকে নিয়ে একা কোথাও যেতে তার ভয়ও করে।

অতীনকে চিন্তিত দেখে সতী বলে,—'কথা দিয়েছো কিন্তু। এখন খেলাপ করলে চলবে না।'

হরেনও আবার বলে,—'যাও না ভাই, কতক্ষণেরই বা ব্যাপার।'

অতীন আর কী করে, সামনে বাসুকে দেখে বলে,—'যাবি বাসু সীনেমায়?

বাসু তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে ওঠে।—'যাবো যাবো'—সে ফার্স্ট বুক উল্টে ফেলে দিয়ে নাচতে থাকে।

হরেন সেইদিকে চেয়ে শুধু ভ্রূকুটি করে।

বিকেল চারটে বাজতে-না-বাজতে সতী অতীনকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য তাগাদা দিতে থাকে। অতীনের ঘরে ঢুকে বলে,—'ঠাকুর পো, হলো তোমার?'

সতী গা ধুয়ে এসেছে। সুন্দর ক'রে খোঁপা বেঁধেছে। মাথায় কাপড় না-থাকায় খোঁপার সবটুকু অনাবৃত। তার গা থেকে কি মাথার চুল থেকে একটা মৃদু গন্ধ ভেসে আসে।

অতীন শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। উঠে বসে বলে,—'এখন কী? এখন তো সবে চারটে।'

সতী পিছন ফিরে দেওয়ালে ঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর সেইভাবে দাঁড়িয়েই বলে,—'এই ছাখো না, ঠিকঠাক হয়ে বা'র হতে-হতে পাঁচটা বেজে যাবে।'

সে পিছন ফিরে দাঁড়ানোতে তার খোঁপাটা সম্পূর্ণ দেখা

যায়। অতীন পলকের জন্য সেদিকে তাকিয়ে বলে,—'তা' আমার ঠিক হতে কতক্ষণ। পাঁচ মিনিটে ধুতিটা বদলে পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়বো। আপনিই কাপড়-চোপড় পরে প্রস্তুত হোন। বাসুকে জামা জুতো পরান।'

সতী ফিরে দাঁড়িয়ে বলে,—'ওমা, তুমি দাড়ি কামাবে না?'

অতীন গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—'দাড়ি তো কাল কামিয়েছি। আজ আর কামাবার দরকার নেই।'

সতী শাসনের ভঙ্গিতে বলে,—'ইস্, ও'রকমভাবে আমি তোমাকে যেতে দিলে তো! নাও, তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে নাও।'

সতী বেশবাস পরিবর্ত্তন করতে করতে আরো দু-একবার অতীনকে এসে তাড়া দেয়। তারই ফাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করে,—এই শাড়িটা পরবো ঠাকুর পো, না সেই নীলটা পরবো, যেটা তোমার খুব ভালো লাগে?'

অতীন প্রতিবাদ ক'রে বলে।—'আমার আবার কোনটা ভালো লাগে?'

সতীর চোখ হেসে ওঠে। বলে,—'ও, ভালো লাগে না বুঝি?—তাহলে সেইটেই পরতে হয়।'

হাসতে হাসতে সে ঘর হ'তে চলে যায়।

বাড়ি থেকে বার হতে-হতে শেষ পর্যন্ত পাঁচটাও বেজে যায়। পথে এসে সতী বলে,—'চলো ঠাকুর পো হেঁটে যাই।'

অতীন বলে,—'হেঁটে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া বাসু পারবে কেন এতটা পথ হাঁটতে।'

সতী বাসুর দিকে একটু [illegible] তাকায়। দাঁতে দাঁত চেপে

বলে,—'হতভাগা ছেলেটাকে বলেছিলুম বাড়ি থাক, তোর জন্য বল কিনে আনবো, তা' শোনা হলো না।'

বাসু ভয়ে ভয়ে অতীনের দিকে তাকায়। তার পাশ ঘেঁষে হাঁটতে থাকে।

অতীন বলে,—'ওকে কেন বকছেন?—আমিই তো ওকে আসতে বললাম।

বাসু করুণভাবে আবার অতীনের দিকে চায়। তার ভয়, এখনো বাড়ি কাছে আছে, এখনো হয়তো তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। অতীন তাকে হাত দিয়ে কাছে টানে।

দু'টো বাস ছেড়ে দিতে হয়। ভীষণ ভিড়। তিল ধরবার স্থান নেই। শেষে ট্রামে এসে ওঠে তারা। সেখানেও ভিড় কম নয়। অতীন, সতী ও বাসুকে বসিয়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেদচিকন নধরদেহ সুসজ্জিত নরনারী সব উঠছে, নামছে। কী জানি কেন অতীন তাদের চেয়ে চেয়ে দেখে। মনে মনে আন্দাজ করতে চেষ্টা করে এই সব শাড়ি ও স্যুটের কত দাম হতে পারে। এই ক্রিজ-না-ভাঙা স্যুট, এই ফিন ফিনে ধুতি পাঞ্জাবী, এই শাড়ি, ব্লাউজ, বডিস ও প্রসাধনীতে কত খরচ পড়ে প্রতি মাসে?—দেশের যে এত দুর্দিন, সেটা কলকাতার এই দক্ষিণাঞ্চলে এলে একেবারে যেন বোঝা যায় না। দেশের অধিকাংশ মানুষ নাকি ভালোভাবে খেতে পায় না। অথচ এরা এত অর্থ কোথা থেকে কী ভাবে পায় এই সব বাজে খরচের জন্য?—অতীনের ভারি বিশ্রী লাগে। সে নিজেও আছে এক ধনীর গৃহে। সেখানেও অকারণ অপচয় ও বিলাস দ্রব্যের জন্য অপব্যয় কম হয় না। ভাবতে ভাবতে সে কখন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। হঠাৎ সতীর ডাকে চমক ভাঙে। একটা

সীট খালি হওয়াতে সতী চাপা স্বরে বলে,—'সীট খালি আছে ঠাকুরপো, বোসো।'

শেষপর্যন্ত কিন্তু কিছুটা পথ হেঁটেই যেতে হয়। যেমন মাঝে মাঝে হয়, একটা জায়গায় ট্রামের তারের কী গোলমাল হয়েছে, আধ মাইলটাক সারি সারি ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে। কখন যে আবার চালু হবে তা' বলা যায় না। তার চেয়ে এইটুকু পথ হেঁটে যাওয়াই ভালো। অতীন সতীদের নিয়ে নেমে পড়ে। বাসুকে বলে,—'এটুকু পথ হাঁটতে পারবি তো বাসু ?'

বাসু অনেকখানি ঘাড় কাত ক'রে বলে,—'হ্যাঁ, হেঁটে আমি লেকের বাজারেও গেছি।'

সীনেমা হাউসে যখন তারা পৌছয় তখন শো আরম্ভ হয়ে গেছে। তবে আসল বই শুরু হয়নি। অন্য একটা ছবির ট্রেলার চলছে।

অন্ধকার হল-এ টর্চের আলো দেখে দেখে তারা নিৰ্দিষ্ট আসনের কাছে আসে। অতীন ভেবেছিল একটা ধারের সীট বোধ হয় পাবে। কিন্তু তা' পাওয়া যায়নি। একটা রো-র প্রায় মাঝা-মাঝি তিনটে সীট তাদের। সুতরাং একদিকে বাসু, একদিকে সে, মাঝখানে সতী বসে। অন্ধকার ঘরে সতীর এত কাছে বসে অতীনের কেমন যেন লাগে। সতীর দেহ হতে মেয়েলি প্রসাধনের একটা উগ্র গন্ধ নাকে এসে লাগে। কেমন ঝিম ঝিম ক'রে তার সমস্ত শরীর।

একটু পর আসল বই শুরু হয়। অতীন মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

একটু বেশি নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ হলেও ছবিটি মন্দ নয়। অভিনয়, ঘটনাবিন্যাস ও পরিচালনার গুণে বেশ ভালোই হয়েছে।

সীনেমালোকের পারিভাষায় 'হীট পিকচার'। অনেক দিন ধরে চলছে। এখনো বেশ দর্শক হচ্ছে। হয়তো আরও কয়েক সপ্তাহ চলবে।

অতীনের মন্দ লাগে না। নায়কের চরিত্রের সাহস ও বলিষ্ঠতা তাকে আকর্ষণ করে।

গল্পটা এই রকম। নায়ক হচ্ছে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা আদর্শবাদী এক যুবক। নায়িকা হচ্ছে তাদের বাড়ির অনেকদিনের পুরানো ঝিয়ের মেয়ে। এদের প্রেমের কাহিনী নিয়েই এই ছবি। মেয়েটি বেশ সুশ্রী। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়াও সে কিছুটা শিখেছে। মেয়েটির স্বভাব চরিত্রও বেশ ভালো। বাড়ির সকলেরই সে প্রিয়পাত্রী। কিন্তু তাই ব'লে বাড়ির কর্তার একমাত্র ছেলে তাকে বিয়ে করবে এমন অনাসৃষ্টির কথাই বা কে কবে শুনেছে।

ছেলের হাবভাবে কিছুটা সেইরকম আশঙ্কা ক'রে কর্তা গিন্নী মেয়েটির তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে তাকে পার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকেন। ভাল পাত্র জোটার কথা নয়। তাড়াতাড়িতে আরো খারাপ জোটে। কোথাকার কারখানার আধবুড়ো মৃতদার মাতাল এক মিস্ত্রীর সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হয়।

ধীরে ধীরে বিয়ের দিন এগিয়ে আসে। মেয়েটি শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে আর আত্মহত্যার জন্য সাহস সঞ্চয় করে। নায়ক যে তাকে সত্যিই ভালোবাসে তা' সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। কিন্তু তাই ব'লে বাপ-মা ও বাড়ির সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে যে তাকে বিয়ে করবে এমন আশা সেও করতে পারে না। নায়ক তাকে কোনোদিন সে-প্রতিশ্রুতি দেয়ওনি। চোখের ভাষায় সে-কথা বহুবার হলেও মুখে সে-কথা কোনোদিন ব্যক্ত করেনি।

কিন্তু শেষপর্যন্ত নায়ক সর্বসমক্ষে সেই কথাই ব্যক্ত করে। সে এক চরম নাটকীয় মুহূর্ত!

চেয়ারের হাতলের 'পরে রক্ষিত অতীনের হাতের ওপর কখন যে অন্যমনস্ক হয়ে সতীও হাত এনে রেখেছে সে-খেয়াল অতীনের নেই। খেয়াল হওয়াতে আস্তে আস্তে সে হাত সরিয়ে নেয়। অন্ধকারে মুখের কাছে মুখ এনে সতী ফিসফিস ক'রে বলে,—'দেখলে তো ছেলেটার কী সাহস!'

অতীন শুধু বলে,—'হুঁ।'—সে ছবির দিকে মন দেয়। তখনো শেষ হয়নি ছবি। নায়ক যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছে নায়িকা কোনোমতেই অযোগ্য নয়। সে সুশ্রী, কিছুটা শিক্ষিতাও। তাছাড়া দাম্পত্য জীবনের সুখ যার উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে সেই স্বভাব চরিত্রও মেয়েটির অত্যন্ত ভালো। এমন মেয়ে চট ক'রে কোথায় মিলবে? আর জাতের কথা? জাত আবার কী?—মানুষের সন্তান, মানুষের জাত, এইটেই তো মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

সীনেমা হল থেকে বেরিয়ে এসে তারা কিছুটা হাঁটে। ট্রাম বাস সব ভর্তি। কয়েকটা ট্রাম বাস ছেড়ে দেয়। হাঁটতে হাঁটতে সতী হঠাৎ বলে,—'তোমার মত ভীতু আমি কোনোদিন দেখিনি।'

অতীন বলে,—'ভীতু? কে আমি?'

—'তুমি নও তো কে?'—বাহুর হাতটা ভালো ক'রে চেপে ধ'রে স্মিতমুখে সতী বলে,—'এই ছেলেটাকে সঙ্গে না-নিয়ে তো আসতে পারলে না।—একা এলে আমি কি তোমায় খেয়ে ফেলতাম?'

অতীন নিরুত্তর থাকে। দৃষ্টি না-দিয়েও সে দেখতে পায় সতীর ঈষৎ-পুরু মনোরম দু'টি ঠোঁটে রহস্যময় চাপা হাসি খেলা করছে।

পরদিন ঘুম ভাঙতে অতীনের বেশ বেলা হয়। গত কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে জেগে ছিল। কিছুতে ঘুম আসেনি। রাত্রি একটার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তার খেয়াল নেই। যেটুকু ঘুমিয়েছে তাও শুধু স্বপ্ন দেখেছে। তবে কী স্বপ্ন তা' তার মনে পড়ে না। শুধু একটা ভয় ও আনন্দের অনুভূতি তার মনে এখনো জড়িয়ে রয়েছে। দুটো অনুভূতিকে যেন পৃথক করা যায় না, এমনভাবে মেশানো। অথচ কেন যে ভয় আর কেন যে আনন্দ তা' সে বোঝে না। অলস ভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে সেই কথাই ভাবে। ভাবতে ভালো লাগে। আধো ঘুমে, আধো জাগরণে আরো কিছুক্ষণ কাটে।

একটু পর সতী এসে ডাকে,—'ঠাকুরপো, ঘুম ভাঙলো?—কী ঘুম রে বাবা! আমি দু'বার এসে ফিরে গেছি।'

অতীন ওঠে না। শুয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙে। বলে,—'কী হবে উঠে। বেশ ভালো লাগছে শুয়ে থাকতে।'

সতী আর একটু এগিয়ে এসে বলে,—কাল্‌কের সীনেমার সেই নায়িকার ধ্যান করছো বুঝি।'

অতীন কী যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়। কিছু বলেনা। স্মিতমুখে শুধু সতীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মুহূর্তের জন্য সতী চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর তাগাদা দিয়ে বলে,—'ওঠো ওঠো, চা খাবে চলো।'

হাতমুখ ধোয়ার পর সতী অতীনকে তার ঘরে নিয়ে যায়। সাধারণত চা খাওয়ার জন্য সতী অতীনকে তার ঘরে ডাকে না।

বাড়ির পুরনো চাকর শিবুই তার ঘরে চা-জলখাবার দিয়ে যায়। তাই আজকের এই ব্যতিক্রমটুকু অতীনের দৃষ্টি এড়ায় না।

একটু বেলা হয়েছে। চা খাওয়ার সময় অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। হরেন কোথায় যেন বেরিয়েছে। বাসুও পড়াশোনা শেষ ক'রে নিচে খেলছে।

সতী বলে, 'ঠাকুর পো, তোমায় আজ একটা নতুন জিনিস খাওয়াবো। একেবারে গাঁয়ের দিশি জিনিস।'

অতীন হাসিমুখে বলে, 'গাঁয়ের জিনিসই যে আমার সবচেয়ে প্রিয় তাকি আপনি জানেন না?'

কাজ করতে করতে সতী বলে,—'তাই নাকি, আমি তো ভেবেছিলাম সহরের চোখ ঝলসানো রূপেই তুমি ডুবে আছো।'

অতীন বলে,—'তা' ভাবার কারণ?'

সতী অতীনের দিকে একবার শুধু তাকায়। কিছু বলেনা। তারপর টাটকা মুড়ি ঘি, নারকোল কোরা ও চিনি দিয়ে মেখে খেতে দেয়। বলে, একেবারে খাঁটি ঘি, আমার বাপের বাড়ির গাঁ থেকে এসেছে। মুড়িও টাটকা। খেয়ে ছাখো, ভালোই লাগবে। বড়লোকের বাড়িতে এ'সব জিনিস অনেকদিন খাওনি।'

অতীন বলে, 'বড়লোকের ঘরজামাই ব'লে কি কটাক্ষ করছেন?'

উত্তরে সতী কী একটা বলতে গিয়ে চেপে যায়। একটু চুপ ক'রে থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে আসে। বলে, 'কাল সীনেমায় নিয়ে গিয়েছিলে, তারই পারিশ্রমিক দিচ্ছি,—বুঝলে?—ব'লে সে মিটিমিটি হাসতে থাকে।

অতীন মুড়ির বাটিটা টেনে নিয়ে বলে,—'কিন্তু পারিশ্রমিক তো আমি কালই পেয়ে গেছি। এটা বোধ হয় ফাউ। কি বলেন?'—অতীনও চাপা হাসি হাসে।

সতী মুহূর্তের জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতীনের চোখের দিকে তাকায়। কী যেন পাঠ করার চেষ্টা করে। তারপর মাথা নিচু করে চা ঢালতে থাকে। নীরবে চা ছেঁকে চিনি মিশিয়ে অতীনের দিকে এগিয়ে দেয়।

অতীন চায়ে একটা আরামের চুমুক দিয়ে বলে,—'কী, বললেন না এটা ফাউ কি না?'

সতী সে-কথার কোনো উত্তর দেয় না। একটুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে,—'তোমার তো এখন কোনো জরুরী কাজ নেই। তুমি একটু বোসো। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নানটা সেরে আসি।'

ব'লে অতীনের দিকে সামান্য একটু পিছন ফিরে মেয়েলি দক্ষতায় আব্রু রক্ষা ক'রে তাড়াতাড়ি ব্লাউজটা খুলে ফেলে। তারপর তেলের শিশি থেকে সুগন্ধ তেল ঢেলে ক্ষিপ্র হাতে চুলে তেল দিতে থাকে।

তার দ্রুত হস্তসঞ্চালনে প্রতিক্ষণেই বসন এখানে-ওখানে সরে যেতে থাকে। কিন্তু সেদিকে সে তেমন ভ্রূক্ষেপ করে না।

সতীর এ'রকম আচরণ অতীন ইতিপূর্বে আর কখনো দেখেনি। মুখে সে যতই ঠাট্টাপরিহাস করুক যুবতী নারীর স্বভাবসুলভ শালীনতায় দেহের আব্রুরক্ষা সে সব সময়ই ক'রে এসেছে। আজকেই এর প্রথম ব্যতিক্রম।

অতীন লুব্ধ হয়। উত্তেজিত হয়। সেই সঙ্গে বিরক্তও হয়। সতী কি তাকে বাসুর মত শিশু মনে করে যে তার সামনে সতর্ক বস্ত্রশাসনেরও প্রয়োজন নেই? নাকি অন্য কিছু? নারীদেহের অংশবিশেষের আভাস দিয়ে সতী তাকে লুব্ধ করতে চায়, আকর্ষণ করতে চায়? ছি ছি, তা কি সম্ভব?—অতীন মুখ তোলে না, মাথা নিচু ক'রে চায়েচুমু ক দিতে থাকে।

শনিবার ভোরবেলা অতীন ব্যায়ামের পর বাগানে পায়চারি করছে। ব্যায়াম সে প্রতিদিন নিয়মিতই করে। বিশেষ কোনো কারণ না-হলে বড় একটা বাদ দেয় না। সকালে উঠতে দেরি হলেও করে। খুব যে একটা মুগুর-ডাম্বেল ভাঁজে তা নয়। ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ। গোটা কয়েক বুক ডন, গোটা কয়েক বৈঠক আর একটা যৌগিক আসন। তার শোয়ার ঘরেই এ-সব সেরে নেয় সে। তারপর নিচে বাগানে এসে পায়চারি করে।

আজও তেমনি সে বাগানে পায়চারি করছিল। পায়চারি করতে করতে অতীন কিছুদূরে হরেনকে দেখতে পায়। বাড়ির দরজা থেকে গেট পর্যন্ত বাগানের মাঝ দিয়ে যে সরু রাস্তা গেছে সেখানে বড় পাম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হরেন কী যেন ভাবছে। হরেন আর সতীর মধ্যে সতীর সঙ্গেই অতীনের ঘনিষ্ঠতা বেশি। হরেনকে সে হরেনদা বললেও তার সঙ্গে তার কথাবার্তা বেশি হয়নি। হরেন কথাবার্তা কিছু কমই বলে। মোটে মিশুক প্রকৃতির নয়। সে নিজের মনে থাকে, নিজের কাজ করে। কারো সঙ্গেই খুব একটা আলাপ-আলোচনা করে না। অতীনের সঙ্গে শুধু একদিন তার বেশি কথাবার্তা হয়েছে। অবশ্য মামুলী ভদ্রতা রক্ষার জন্য বা প্রয়োজনে দুটো একটা কথা প্রায় রোজই হয়। কিন্তু যাকে বলে মন খুলে আলাপ তা শুধু একদিনই হয়েছে।

একদিন দুপুরবেলা একটা ভিখারী সকলের অলক্ষ্যে গেট পেরিয়ে একেবারে ড্রইং রুমের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। দুপুরে ড্রইং রুমে কেউ ছিল না। ঢুকে সন্দেহজনকভাবে নাকি সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। কী তার উদ্দেশ্য ছিল কে জানে। হয়তো সে ভিক্ষে করার উদ্দেশ্যেই

গেট দিয়ে ঢুকেছিল। তারপর লোকজন না-দেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু দারোয়ান হঠাৎ তাকে ও' অবস্থায় দেখতে পেয়ে চোর সন্দেহ করে, কিংবা তার নিজের দোষ প্রকাশ হয়ে পড়ায় রাগে তাকে চোর অপবাদ দিয়ে ভীষণ প্রহার শুরু ক'রে দেয়। হরেন সেদিন ভিক্ষুকটাকে বাঁচিয়েছিল। এ' বাড়িতে তার কথার কেউই কোন গুরুত্ব দেয় না এটা সে জানে। সে চলেও সেইভাবে। তবে সেদিন বোধহয় সে নিজেকে আর সামলাতে পারেনি, দারোয়ানকে বেশ ধমকেছিল। অতীনকে কাছে পেয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, 'ছাখো দেখি কী অন্যায়! পেটের জালায় ভিক্ষে করতে এসে চোরের মার খেলো বেচারা। যেহেতু সে গরীব, সেই হেতু তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিশ্চয়ই সে চোর। আশ্চর্য! কী মনে করে এরা?— আর বড়লোকের বাড়ীর এই চাকরবাকরগুলো,—এরাও সব জানোয়ার। নাহলে এরাও তো গরীব, গরীবের দুঃখ বোঝে না এরা!'

সেদিন আবেগের সঙ্গে হরেন অনেক কথা বলেছিল অতীনকে। অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তার সঙ্গে।

সে-ই এক দিন। তা ছাড়া আর কোনো দিন তার সঙ্গে আর তেমন বেশি কথাবার্তা হয়নি।

বাগানের বাঁদিকটায় ব্যাডমিন্টন কোর্ট। তার চার দিকে সুন্দর ক'রে ছাঁটা গাছের বেড়া। এই বেড়ার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে হরেন অতীনের দিকেই আসতে থাকে।

হরেনের গায়ে জামা নেই। কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়ানো। তাতে তাকে আরো কৃশ, আরো রুগ্ন মনে হয়। এত রোগা কেন হরেন? অতীন মনে মনে ভাবে। কোনো রোগ আছে কি হরেনের? হরেনকে অতীন তার ঘরে বহুবার দেখেছে। কিন্তু কোনো দিনই খালি গায়ে

দেখেনি। সব সময়ই তার গায়ে একটা পাতলা হাফশার্ট থাকে। সব সময় জামা গায়ে দিয়ে থাকে কেন হরেন তা' কে জানে।

হরেন অতীনের কাছে এসে বলে,—'বেড়াচ্ছো নাকি অতীন ?'

অতীন দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'হ্যাঁ, একটু পায়চারি করছি।'

—'তুমি বুঝি রোজ নিয়মিত ব্যায়াম করো ?'

অতীন সংকোচের সঙ্গে বলে,—'না, সেরকম কিছু নয়, এই একটু-আধটু ওঠবোস করি আরকি।'

—'বেশ বেশ ভালো।' বলে হরেন অন্যমনস্ক ভাবে কী যেন ভাবে। তারপর কী বলার জন্য যেন একটু ইতস্তত করে। বেশ বোঝা যায় কাথাটা বলতে সে সংকোচ বোধ করছে। অতীন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

আরো একটু ইতস্তত ক'রে হঠাৎ হরেন বলে,—'আচ্ছা, অতীন আমাকে আজ গোটাদশেক টাকা দিতে পারো ? দু'দিন পরেই তোমাকে দিয়ে দেবো।'

অতীন অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়। লজ্জিত হয় তার চেয়েও বেশি। তাড়াতাড়ি বলে,—এখুনি এনে দিচ্ছি।—ব'লে সে একরকম দৌড়ে চলে যায় টাকাটা আনতে।

অতীনের বড় আশ্চর্য লাগে। হরেন তার কাছে টাকা চাইলো! হরেনের এত টাকার প্রয়োজন ? তাছাড়া মাত্র দশ টাকা! দশটা টাকা হরেন আর কারো কাছে পেলো না ? সতীর কাছে নেই ?—ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত লাগে তার।

কিন্তু শুধু এই একবার নয়, এর পর থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হরেন অতীনের কাছে টাকা চাইতে থাকে। কোনোবার পরদিনই

ফেরত দেয় কোনোবার ফেরত দিতে ভুলে যায়। কী করে এতটাকা হরেন? তার ও তার পরিবারের মোটামুটি দুবেলা খাওয়ার খরচ তো লাগে না। দক্ষিণ ভারতের কী একটা ধূপ-কোম্পানির এজেন্সি আছে হরেনের। ঘরে তার রাশিকৃত নানা সুগন্ধি ধূপের প্যাকেট সব সময়ই দেখা যায়। এই সব ধূপকাঠি সে বিভিন্ন দোকানে দিয়ে আসে। শুধু কলকাতায় নয়, মফস্বল সহরেও তার ধূপের কিছু কিছু চাহিদা আছে। সেখানেও ধূপ পাঠায়। নিজেও যায় মাঝে মাঝে সেখানে। এ' থেকে তার আয় একেবারে মন্দ হয় ব'লে মনে হয় না। তবু তার প্রায়ই টাকা ধার করতে হয় কেন,—তা-ও আবার অতীনের কাছে?

ক্রমে হরেনের চরিত্র বড়ই বিচিত্র মনে হয় অতীনের। সাধারণত সে খুব কম কথা বলে। সতীর সঙ্গে সে কখন কী কথা বলে কে জানে। তবে বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে তাকে দুটো-একটার বেশি কথা বলতে কখনো দেখা যায় না। শুধু বাড়ির পুরনো চাকর শিবুর সঙ্গে তাকে কখনো কখনো মন খুলে গল্প সল্প করতে দেখা যায়। অবশ্য তা-ও খুব বেশি নয়। কিন্তু সে-ই আবার যখন কোনোক্রমে কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে তখন তার সঙ্গে এত বেশি কথা বলে যে তা' প্রায় বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। তখন বোঝা যায় যে স্বভাবত সে বাচালই, শুধু সংকোচের জন্য অপরের সঙ্গে বেশি কথা বলে না।

এ'ছাড়া তার আরো একটা দিক ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায়। প্রথমে তার সঙ্গে আলাপ করলে মনে হয় বড়লোক আত্মীয়ের আশ্রিত ব'লে সে বুঝি খুবই সংকুচিত। মনে হয় তার নিজের সম্বন্ধে তার বুঝি খুব হীন ধারণা। নিজেকে সে বুঝি খুবই সামান্য মনে করে। কিন্তু একটু ভালোভাবে মিশলেই স্পষ্ট বোঝা

যায় যে সেটা সম্পূর্ণ ভুল। নিজের সম্বন্ধে তার অদ্ভুত উঁচু ধারণা। নিজেকে সে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি মনে করে। তার ধারণা সে যে ম্যাট্রিকটা'ও পাস করতে পারেনি সেটা শুধু সুযোগের অভাবে। সুযোগ পেলে তার জীবন একেবারে অন্যরকম হ'তো।

তার বাল্য জীবন যে কী কষ্টে কেটেছে তাকি অতীন জানে? সে সময় তার খবর কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করেনি। তার এই দূর সম্পর্কের ধনী মামা অরবিন্দও না।—শুধু সুযোগের অভাব। সুযোগ পেলে এতদিনে নিশ্চয়ই সে দেশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠতো।

হরেনের কথা শুনে অতীনের উত্তরোত্তর বিস্ময় বাড়ে। কী এমন যোগ্যতা আছে হরেনের? তাকে সব দিক থেকেই অতি সাধারণ মনে হয় অতীনের। বুদ্ধিও তার খুব তীক্ষ্ণ বলে মনে হয় না। বরঞ্চ একটু স্থূলবুদ্ধিই মনে হয় তার। তবে কিছু কিছু পড়াশোনা সে করে। একেবারে ধূপের ব্যবসা করেই দিন কাটায় না। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এমন কি ডিকেন্সের লেখাও মাঝে মাঝে তাকে অবসর সময়ে পড়তে দেখা যায়।

হরেন সম্বন্ধে অতীন খুবই কৌতূহলী হয়। ক্রমে সে জানতে পারে হরেন রেস খেলে। সেই জন্যই প্রতি সপ্তাহে, বিশেষ করে শনিবার তার এত টাকার প্রয়োজন।

রেস কেন খেলে হরেন? সে কি বড়লোক হতে চায়?—না, হরেন বড়লোক হতে চায় না। বড়লোকদের সে ঘৃণাই করে। তবে তার টাকার বড়ই প্রয়োজন। অনেক টাকার। সে তাদের গ্রামে একটা আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। হাই স্কুল। সেখানে বিনা মাইনায় সব দরিদ্র ছেলেরা পড়তে ও থাকতে পাবে। বইখাতা

পর্যন্ত তাদের কিনতে হবে না। ক্রমে সেই স্কুল কলেজেরও জন্ম দেবে। সেইজন্যই তার এত টাকার প্রয়োজন। অনেক টাকার।

—'মাইনের টাকার অভাবে, বইখাতার অভাবে আমি ভালোভাবে পড়তে পারিনি। ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করতে পারিনি। সে যে কী দুঃখ শুধু আমি জানি। আমাকে তাই গ্রামের দরিদ্র ছেলেদের সেই দুঃখ ঘোচাতে হবে। হবেই।'—আবেগকম্পিত গলায় হরেন একদিন অতীনকে বলেছিল এ'কথা।

অতীন ভাবে, হরেন কি পাগল? হয়তো তাই। নাহলে রেস খেলার টাকায় এই ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কেউ দেখে!

দিনে দিনে হরেন আরো অনেক কথা বলেছে অতীনকে। শুধু টাকা ধার চাইবার সময় নয়, এমনিও অনেক সময় সে অতীনকে তার মনের কথা খুলে বলেছে। হরেনের মত লোক বোধহয় বাস্তব জগতে অল্পক্ষণই থাকে। অধিকাংশ সময়ই বোধহয় তার কল্পনার জগতে মনোরম বিচরণ। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়ে সে বোধহয় এইরকম বাস্তব বিমুখ হ'য়ে পড়েছে। সংগ্রাম করার শক্তি অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা প্রথমাবধিই তার সংগ্রাম করার শক্তি ও কাণ্ডজ্ঞান অল্প। তাই রেসের টাকার এই শর্টকাট্ পথে সে তার স্বপ্নকে সার্থক ক'রে তুলতে চায়। তার চরিত্রের দোষত্রুটি ও বাস্তববোধের অভাব সত্ত্বেও তার এই দরিদ্রদের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতির জন্য অতীনের তাকে একেবারে খারাপ লাগে না। হোক সে কাণ্ডজ্ঞানহীন দুর্বল চরিত্রের লোক, কিন্তু যে-স্বপ্ন সে দেখে সেই স্বপ্নের প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারে না অতীন। অতীনের নিজের চরিত্রও খুব সবল নয়। সে নিজে সে-বিষয়ে পূর্ণ সচেতন। তাই হরেন যখন তাকে তার অদ্ভুত পরিকল্পনার কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা

বকবক ক'রে বলে যায় তখন তা' যতই বিরক্তিকর হোক অতীন মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। সে যা ভাবে তা যে সে কোনোদিন করতে সমর্থ হবে না সে-কথা অতীন বোঝে। সে শক্তি হরেনের নেই। কোনোদিন হবেও না। তবু যদি সে সে-কথা একজনকে ব'লে একটু শান্তি পায় তো পাক না। অতীনের নয় কিছুটা সময় নষ্টই হলো।

দিনে দিনে ধীরে ধীরে এই রুগ্ন দুর্বল ও কল্পনাচারী হরেনের প্রতি অতীন বেশ একটা মমতা অনুভব করে। তার সঙ্গ যতই বিরক্তিকর হোক, তবু সে তার খোঁজে মাঝে মাঝে তার ঘরে যায়। অতীনকে দেখলে হরেনও খুশী হয়। সদাসর্বদা তার উপর যে একটা সংকোচের আবরণ থাকে তা' আপনা থেকে অপসারিত হয়। অতীনও হরেনের ঘরে গিয়ে একরকম আনন্দ অনুভব করে এই ভেবে যে সে হরেনকে কিছুটা সঙ্গদান করছে। অবশ্য সে ঘরে সতীও থাকে। তার সঙ্গেও কথাবার্তা হয়। তবু শুধুমাত্র সতীর সঙ্গে কথা বলার জন্যই যে সে সেখানে গেছে এ' কথা ভাবতে তার ভালো লাগে না।

সেদিন দুপুরে কী একটা প্রয়োজনে হরেনের খোঁজ করতেই গিয়েছিল অতীন। গিয়ে দেখে হরেন নেই। সতী প্রচুর কলহাস্যের সঙ্গে একটা কাগজের টুকরো নিয়ে হরেনের কীরকম গ্রাম-সম্পর্কের ভাই বনমালীর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছে। কাগজের টুকরোটা সতীর মুঠোর মধ্যে। বনমালী সেই মুঠোশুদ্ধ হাত চেপে ধরে জোর ক'রে মুঠোটা খোলার চেষ্টা করছে। বনমালী বাইশ-তেইশ বছরের যুবক। তার গায়ে খুবই জোর। আবার সতীও একেবারে দুর্বলা অবলা নয়। সুতরাং ধস্তাধস্তিটা বেশ হয়। সতী কোলের কাছে হাত দুটো

টেনে এনে জোরে ধরে থাকে। সে খিল খিল ক'রে হাসে। বলে,—'ছাড়ো বলছি, না হলে কীকরি তোমার গ্যাখো।'

বনমালীও হাসতে হাসতে বলে,—'ও'সব চলবে না। আমার চিঠি দিন। নাহলে সত্যিই জোর করবো। তখন কিন্তু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারবেন না।'

সতী বলে,—'ঈশ, ভারি জোর। ওর জোরে আমি কাঁদবো! —ছাড়ো বলছি এখনো।'—সতী এক হ্যাঁচকা টান মারে। বনমালী প্রায় হুমড়ি খেয়ে সতীর গায়ে গিয়ে পড়ে।

সতী আবার খিল খিল ক'রে হাসে।

অতীনের ভারি বিশ্রী লাগে এই দৃশ্য।

আজকাল একটা জিনিস অতীন ভালোভাবে লক্ষ্য করছে। বাড়ীর ভিতর কোন যুবক পুরুষ এলেই সতী তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে নিঃসংকোচে তার সঙ্গে হাসিতামাশা শুরু ক'রে দেয়। এর পর ঘনিষ্ঠতা একটু বৃদ্ধি পেলে অনেক সময় হাসাহাসির সঙ্গে কিছুটা হাতাহাতিও শুরু হয়ে যায়। যেমন আজ হচ্ছে। এটাই তার স্বভাব। প্রথমে অতীন এটা তেমন লক্ষ্য করেনি। তার সঙ্গে সতীর ঘনিষ্ঠতাটাকে সে সতীর জীবনের একক ঘটনা বলেই মনে করতো। পরে সে লক্ষ্য ক'রে দেখেছে নির্দিষ্ট কোনো একজনের প্রতিই যে সতীর বিশেষ আকর্ষণ তা' নয় প্রায় সমস্ত পুরুষের প্রতিই তার বিশেষ আগ্রহ। হয়তো এই আগ্রহ, এই মেলামেশা, এই হাসিতামাশা সম্পূর্ণ নির্দোষ। তবু সতীর এই মাত্রাতিরিক্ত পুরুষ-ঘেঁষা ভাবটা তার তেমন ভালো লাগেনা।

অল্প বয়সে তার এক বন্ধুর বৌদিকে সে অনেকটা এই রকম স্বভাবের দেখেছে। তখন সে স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। সে সময় বিপিন নামে

একটি ছেলে তাদের সঙ্গে পড়তো। বিপিনের এক বৌদি ছিল। তাকে তারাও বিপিনের মতই রাঙা বৌদি বলে ডাকতো। ভদ্রমহিলার তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে বোধ হয়। তখনো তিনি নিঃসন্তানা। সেই জন্যই বোধ হয় বেশ স্বাস্থ্যবতী এবং কিছুটা স্থূল। তিনিও এই সতীর মতই অত্যন্ত পুরুষ-ঘেঁষা ছিলেন। এই রাঙা বৌদিকে একদিন তার স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে অতীন অত্যন্ত বিশ্রী অবস্থায় দেখে ফেলেছিল। সে কথা মনে হলে আজো তার কান দুটো লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

অবশ্য সতীকেও যে সে ঠিক সেই রকম মনে করে তা নয়। তবে বনমালীর সঙ্গে তার এই অতিরিক্ত মাখামাখির ভাবটা অত্যন্ত বিশ্রী লাগে তার। বিশেষত বনমালী সতীর কে? কেউ নয়। হরেনের গ্রাম-সম্পর্কে পাতানো ভাই। কয়েক মাস পূর্বে তার সঙ্গে কোনো পরিচয়ই ছিলনা সতীর। তাকে নিয়ে এত কেন। বাইশ-তেইশ বছরের ছেলেটার সঙ্গে সতী এমন ব্যবহার করে যেন সে আট-দশ বছরের শিশু। অথচ সতীর আচরণের তারতম্যের জন্য তো আর বাইশ-তেইশ বছরের একটি যুবক সাত-আট বছরের শিশু হয়ে যেতে পারে না!

বনমালাকেও কী জানি কেন অতীন একেবারে সহ্য করতে পারে না। ছেলেটা অত্যন্তই স্বাস্থ্যবান। তার স্বাস্থ্যের কাছে অতীনের স্বাস্থ্যও ম্লান হ'য়ে যায়। অতীনের ব্যায়াম-পুষ্ট শরীরেও যথেষ্ট নমনীয়তা কমনীয়তা আছে। কিন্তু এ' ছেলেটার শরীর আগাগোড়াই পরুষ, কঠিন। মনে হয় এতটুকু মেদ নেই শরীরে, শুধুই মাংসপেশি। মুখখানাতেও তার এতটুকু কমনীয়তা নেই। কী রকম চোয়াড়-চোয়াড় ভাব।

তার গায়ের রঙও প্রায় নিগ্রোদের মত কালো। ঠোঁট দু'টি অসম্ভব পুরু। নিগ্রোদের মতই কোঁকড়ানো চুল উপর দিকে উল্টানো। তার আচার-ব্যবহারও কীরকম রূঢ়, অমার্জিত। সে নাকি এম. এস. সি. পড়ে। অতীনের বিশ্বাস হয় না।

অতীনকে দেখে সতী বলে ওঠে,—'দেখেছো ঠাকুর পো, চিঠির জন্য কীরকম করছে এই ছেলেটা'। বলতে বলতে অকারণ হাসিতে ভেঙে পড়ে সতী।

বনমালী অতীনকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়। একটু থতমত খায়। তারপর সতীর দিকে তাকিয়ে বলে,—'দিন, আমার চিঠি দিন।'

—'ইস্, এতটুকু ছেলের আবার গোপন চিঠি!' সতী কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে ধমক দেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারে না। হেসে ফেলে।

—'বেশ, নাও দিকি কেমন নেবে চিঠি।' সতী হাতের মুঠোর মধ্যে রক্ষিত একটুকরো কাগজ তাড়াতাড়ি তার ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে স্থূল বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সমস্ত ব্যাপারটাই অতীনের অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকে। হঠাৎ সে বলে,—'হরেনদা আছেন বৌদি? হরেনদার খোঁজে এসেছিলাম।'

—'তোমার দাদা আবার কবে দুপুরবেলা বাড়ি থাকে?' বলে সতী আবার অকারণে খিল খিল ক'রে হাসে।

অতীনের গা জ্বলে যায়। ভারি অশ্লীল মনে হয় সতীর এই হাসি। দ্রুতপদে সে চলে আসে। পিছন হ'তে সে সতীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়: 'বিকেলে এখানে চা খাবে ঠাকুর পো, ভুলো না।'

।কেল হতে-না-হতে অতীন চা খেয়ে নেয়। সতীর ঘরে যায় না। তারপর জামাটা গায় দিয়ে ভাবে কোথায় যাবে। শেষপর্যন্ত সে কোথাও যায় না। একটা বই নিয়ে ইজি-চেয়ারে পা এলিয়ে পড়তে শুরু ক'রে দেয়।

কিছুক্ষণ পর বাড়ির পুরনো চাকর শিবু এসে ডাকে,—'দাদাবাবু, বৌদি আপনাকে চা খেতে ডাকছেন।

নিস্পৃহভাবে অতীন বলে,—'আমি চা খেয়ে নিয়েছি শিবুদা, বৌদিকে গিয়ে বলো।'

কিছুক্ষণ পর সতী স্বয়ং আসে। বলে,—'আচ্ছা ছেলে যা'হোক। বললুম, গেলে না যে!'

অতীন বলে,—'মনে ছিল না বৌদি, চা খেয়ে নিয়েছি।'

—'আচ্ছা, আর এক কাপ খাবে। চলো।'

—'বেশি চা খেলে আমার ঘুম হয় না।'

—'দু' কাপ চা বেশি নয়। ওঠো শীগগির।' সতী জেদ ধরে।

অতীনের ওঠার লক্ষণ দেখা যায় না। সামনের জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়।

তখন সতী বলে,—'এত কষ্ট ক'রে যে কড়াই শুঁটির কচুরিগুলো করলুম,—সেগুলো কি আমি খাবো?'

অতীন বলে,—'খাওয়ার লোকের আবার অভাব?'

—'তবু যার নাম ক'রে করেছি তা'কে না-দিয়ে কি আর কারোকে দেওয়া যায়?'—সতীকে কেমন যেন মন মরা মনে হয়।

হাসিমুখে অতীন বলে,—'আমার নাম ক'রে করেছেন?—আচ্ছা মন-রাখা কথা বলতে পারেন আপনি। বেশ চলুন।' ব'লে সে একটা আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ায়।

ঘরে এসে অতীন দেখে তখনও কচুরি ভাজা হয়নি। স্টোভে গরম গরম ভেজে দেবে এই সতীর ইচ্ছে। তাই করে সতী। অতীনকে বসিয়ে একটা-একটা ক'রে কচুরি ভেজে দেয়। তার সঙ্গে আলুর দম।

খেতে খেতে অতীন বলে,—'এত সব কখন করলেন? এই তো কিছুক্ষণ আগে হৈচৈ করতে দেখে গেলাম।'

কড়ার মধ্যে আর একটা কচুরি ফেলে দিয়ে সতী বলে,—'তখনই তো করছিলাম। তুমি রাগ ক'রে চলে না-গেলে দেখতে পেতে।'

অতীন মৃদু প্রতিবাদ করে,—'রাগ ক'রে গেলাম কে বললে?'

কড়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সতী বলে,—'ও'আবার ব'লে দিতে হয় নাকি?' এটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার নেই?—তা' বনমালীকে অনেকেই সহ্য করতে পারে না।'

অতীন বিরক্ত হয়ে বলে,—'সহ্য করতে পারবো না কেন?'

সতী বলে,—'যেরকম বিশ্রী চেহারা ওর। বাবাঃ যেন একটা বুনো মোষ!'—সতী মুখ বিকৃত ক'রে হাসে।

কারো চেহারা নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ করে বা বিরূপ মন্তব্য করে এটা অতীন পছন্দ করেনা। চেহারাকে সুন্দর করার ক্ষমতা তো কারো নিজের হাতে নেই। সুতরাং ও' নিয়ে সমালোচনা করার মধ্যে একটা হীনতা আছে বলে সে মনে করে। কিন্তু আজ সতীর এই কথাটা তার একেবারে খারাপ লাগে না। সত্যিই বনমালীর চেহারাটা একটা বুনো মোষের মতই। কিন্তু সতী কি ঠিক কথা বলছে? সতীর কথা তার বিশ্বাস হয় না। বনমালীকে যদি তার বিশ্রীই লাগবে তাহলে তার সঙ্গে এত হাসাহাসি হাতাহাতি কেন?

সতী বোধ হয় অতীনের মনের ভাব কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। বলে,—'আমার হয়েছে মুস্কিল। তোমার দাদার কোন্ দূর ন-কের

ভাই, তার ঝামেলাও আমাকেই পোয়াতে হবে। আশ্চর্য !—ওর বাড়ি থেকে প্রতিমাসে যে টাকা আসে তা' আমার কাছে রেখে যায়। দরকার মত নিয়ে নিয়ে খরচ করে। আমি যদি টাকা না-রাখি তাহলে আবার তোমার দাদা রাগ করে। কী যে জ্বালা আমার। ঝক্কি না-পুইয়ে উপায় কী?—তবে হ্যাঁ, ওই আমার এক দোষ, মুখ গোমড়া ক'রে আমি থাকতে পারি না।'—সতী আড়চোখে অতীনের মুখের দিকে তাকায়।

অতীন বলে,—'নিজের কাছে টাকা রাখে না কেন?'

—'রাখলে নাকি মাসের অর্ধেকের মধ্যেই সব খরচ হয়ে যায়।'

অতীন শুধু বলে,—'হুঁ'।

সতী অন্য কথা পাড়ে। বলে,—'কেমন হয়েছে কচুরি, কিছু বলছো না যে!—সেই কখন থেকে তৈরি ক'রে বসে আছি। অথচ তোমার আসার নাম নেই।—তুমি আসছো না দেখে তার পর কত কাজ সারলুম। চুল বাঁধলুম, গা ধুলুম, আরো কত কী।'—সতী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে স্টোভের উপর চায়ের জল চাপিয়ে দেয়।

অতীন উৎসাহের সঙ্গে বলে,—'খুব ভালো হয়েছে কচুরি।'—সে চেয়ে দেখে সত্যিই সতী পরিপাটি ক'রে খোঁপা বেঁধেছে। এ' ধরণের আঁট-সাঁট চ্যাপটা খোঁপা অতীনের পছন্দ নয়। একটু সেকেলে ধরণের মনে হয়। তবু আজ সতীর এই খোঁপা তার তেমন খারাপ লাগে না। বার বার সে সেদিকে তাকায়। সতী এদিকে দৃষ্টি না দিয়েও মেয়েদের আশ্চর্য অনুভবশক্তির সাহায্যে এটা বোধ হয় বুঝতে পারে। তার গ্রীবার বিশেষ ভঙ্গিমায় তা' প্রকাশ পায়।

চা ঢালতে ঢালতে সতী হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে,—'তোমার দাদা আবার আজ সোনারপুর না কোথায় যেন গেছে। ফিরতে নাকি

অনেক রাত্রি হবে, বলে গেছে। এই রোগা শরীরে এত খাটা কি ঠিক?'—সতী তেমনি অন্যদিকে চেয়ে থাকে। অতীনের দিকে তাকায় না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে অতীন বলে,—'সত্যি, হরেনদা কেন যে এত খাটেন বুঝি না'—সে চুপ ক'রে যায়। নীরবে চা খেতে থাকে।

চাপানের পরও নীরবতা ভঙ্গ হয় না। কিছুক্ষণ একেবারে চুপচাপ কাটে। সতী হঠাৎ অত্যন্ত সংযতবাক্ হয়ে ওঠে। তার পক্ষে এটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কথার অভাব তার কোনোদিন হয় না। ভালো হোক, মন্দ হোক, অর্থ থাকুক বা না-থাকুক কথার ভাণ্ডার তার অফুরন্ত। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হয় সেও যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। নতমুখে নীরবে এমনিই বসে থাকে। সেই ভাবে বসে থেকে কী জানি কেন বার দুয়েক সে অতীনের মুখের দিকে তাকায়। অতীনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আবার চোখ নামিয়ে নেয়। এ-ও সতীর পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

অতীনেরও কেমন আড়ষ্ট বোধ হতে থাকে। সেও যেন চেষ্টা ক'রে কথা খুঁজে পায় না।

হঠাৎ সতী উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়। আপনমনে বিড় বিড় করে বলে,—'ইস, উনুনে আগুন দিয়েছে, ধোঁয়া আসছে।

সে অতীনের দিকে পিছন ফিরে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মিনিট চার-পাঁচ তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো কথা বলে না। ঘরে একটা বিশ্রী নীরবতা বিরাজ করে।

একটু পরে কী মনে ক'রে সতী পিছন ফিরে ঘরের এদিকে দ্রুত আসতে যায়। অসাবধানে তার পা লেগে বেতের ছোটো মোড়াটা ছিটকে পড়ে। একটু দূরে তার কোলের ছোটো ছেলেটা ঘুমচ্ছিল।

তার গায়ে গিয়ে লাগে। আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ছেলেটা উঠে কাঁদতে শুরু করে দেয়।

সতী তার কাছে গিয়ে তার কাঁধে দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে বলে,—'অবেলায় কিসের রে এত ঘুম!—আবার কান্না হচ্ছে। চুপ করলি, করলি চুপ!'—ব'লেই ঠাস করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পূর্বে সতীই হয়তো তাকে ঘুম পাড়িয়েছিল। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আচমকা মার খেয়ে ছেলেটা একেবারে ভীষণ চীৎকার ক'রে কাঁদতে শুরু করে। সতী তার উপর আরো ঘা কয়েক তার পিঠে লাগিয়ে দেয়। তা'তে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়।

এই দারুণ কান্নাকাটির মধ্যে অতীন কী করবে ভেবে পায় না। অবশেষে একটু ইতস্তত করে বলে,—'আমি তাহলে উঠি এবার।'

রাগে মুখ লাল ক'রে সতী বলে,—'কী হলো তোমার? একটু বসতে পারো না!'—অতীনের ওপর তাকে অত্যন্ত রেগে উঠতে দেখা যায়। অতীনের ওপর সে কোনোদিন সামান্যমাত্রও রাগ করেনা। এই প্রথম সতীকে তার উপর রাগতে দেখে অতীন। সে কিছুটা বিস্মিত না হয়ে পারে না।

সতী অতীনের দিকে আর ভ্রূক্ষেপ করে না। ক্রন্দনরত ছেলের দু'টো হাত ধ'রে ক্রুদ্ধস্বরে স্বগতোক্তি করে,—'উঃ, জ্বালিয়ে মারলো আমায় সবাই।'

মুহূর্তমধ্যে সে তার ছেলেকে জোর ক'রে নিজের কোলে শুইয়ে দেয়। তারপর অতীনের সামনেই অত্যন্ত সহজভাবে পট পট ক'রে ব্লাউজের টেপাবোতাম টেনে খুলে ফেলে।

একে স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, তায় আঁটজামা। বোতাম খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিখোলা একজোড়া উদ্যত সাপের মত পুষ্ট দু'টি স্তন বার হয়ে

পড়ে। কিন্তু সে সব সতী গ্রাহ্য করে না। ছেলের মুখে স্তন গুঁজে দিয়ে আস্তে আস্তে তার গায়ে চাপড় দিতে থাকে।

অতীন তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়। মেয়েদের বুক কি তাদের গায়ের রঙের চেয়ে এত ফর্সা হয়। ত্বক্ এত মসৃন হয়?—নারীদেহের রহস্য আজো তার কাছে অনাবিষ্কৃত। সে খুবই লুব্ধ হয়। তবু ওদিকে মুখ ফেরাতে পারে না। মুখ না-ফেরালেও সে বেশ বুঝতে পারে সতীর দেহ তার দেহকে টানছে। এক উন্মুখ নারীদেহ আর এক উৎসুক পুরুষদেহকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে। দুর্বার সে আকর্ষণ শক্তি।

অতীন বোঝে এ' ভালো নয়, এ' অন্যায়, এ' গর্হিত। তবু সে নিজেকে যেন ঠিক রাখতে পারছে না। সমস্ত শরীর উত্তেজনায় আগুণ হয়ে উঠেছে। থর থর করে কাঁপছে। এই মুহূর্তে তার দেহের অনুতে অনুতে ক্ষুধা জলে উঠেছে। তীব্র অন্ধ ক্ষুধা। দেহের জন্য দেহের স্থূল জৈব ক্ষুধা। অস্বীকার করার উপায় নেই। সে বেশ বুঝতে পারে এই ম্লান গোধূলিতে, এই নির্জন রুদ্ধ ঘরের মধ্যে সতীর দেহ তাকে চাইছে, তার দেহও তীব্র ইচ্ছার সঙ্গে সতীর পুষ্ট নরম নারীদেহ কামনা করছে। উত্তেজিত দ্রুতস্পন্দিত বুকে হাত দিয়ে সে ভাবে, কী করবে সে—কীকরবে।'

প্রাণপনে সে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে। তেমনি দেওয়ালের দিকেই মুখ ফিরিয়ে থাকে।

দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার। তার পাশে একটা বড় গ্রুপ ফটো। তাতে হরেন, সতী, মহামায়া—অনেকে আছেন। মাঝখানে পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরী সুমিতা। এ'ফটো অতীন আগে বহুবার দেখেছে। প্রথম প্রথম কয়েক দিন গোপনে বহুক্ষণ ধ'রে

চেয়ে থেকেছে ও-দিকে। কিন্তু পরে এ' ফটোর দিকে দৃষ্টি পড়লেই সে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। আজ আবার সে স্মিতার এই ফটোর দিকে তাকায়। একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরের এক নিবিড় বেদনার উৎসমুখ যেন সহসা উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর এক অনুভূতি। ক্ষুধা নয় তৃষ্ণা। মধুর বিধুর এক উজ্জল তৃষ্ণা সমস্ত চেতনায় সে অনুভব করে। আরো গভীর, আরো গোপন, আরো তীব্র সে অনুভূতি।

অতীন উঠে দাঁড়ায়। তারপর সেই চিন্তিত, উত্তেজিত, অভিভূত অবস্থাতেই একরকম দৌড়ে সে ঘর হতে বার হয়ে যায়।

সারাটা সন্ধ্যাই তার অত্যন্ত বিশ্রীভাবে কাটে। রাত্রেও ভালো ঘুম হয় না। অদ্ভুত এক দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায়। স্বপ্নে গ্যাখে সে যেন দেওঘরের সেই ত্রিকূট পাহাড়ে উঠছে। উঠতে উঠতে চূড়ার কাছে যে-জায়গাটা ভীষণ ঢালু সেই জায়গাটায় এসে হঠাৎ তার পা পিছলে গেলো। কিন্তু আশ্চর্য ; পাহাড়টা কঠিন নয়, বিশ্রীরকম থলথলে নরম। তাই সে গড়িয়ে পড়ে না। সেইখানেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।—আরো কী অদ্ভুত ব্যাপার, আর একটা পাহাড় যেন ও'পাশ থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তাকে চেপে ধরে। ভীষণ চাপ দিতে থাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, তার এতটুকু ব্যথা লাগে না। শুধু কী জানি কেন ভয় করে। ভীষণ ভয়।

ঘর্মাক্ত দেহে অতীন জেগে ওঠে। সে রাত্রে আর ঘুমতে পারে না।

পাঁচ

ফাল্গুনের শেষাশেষি সুমিতারা সকলে ফি'রে আসে। কয়েকদিন পূর্বে অরবিন্দ গিয়েছিলেন ওখানে। তিনিই সঙ্গে ক'রে আনেন।

খবর পেয়ে অতীন যায় হাওড়া স্টেশনে সকলকে নিয়ে আসতে।

ট্রেন যতক্ষণ না-আসে সে প্ল্যাটফর্ম-এর চেয়ারে বসে বসে নানাকথা ভাবে। ভাবে, সুমিতা তার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবে কে জানে? পূজোর পর যখন সে আবার দেওঘর গিয়েছিল তখনও সুমিতা তাকে একরকম উপেক্ষাই করেছে। তখনও সেই রাজেন্দ্রানীর ভাব। তবে সে লক্ষ্য করেছিল তখনই সুমিতার মুখ হ'তে রুক্ষ কর্কশ ভাব অনেকটা দূর হয়ে গেছে। তার বদলে দেখা দিয়েছে কীরকম এক মৌন বিষাদ। রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে তা' আশ্চর্য করুণ মনে হয়েছিল অতীনের কাছে।

যে-রকমই ব্যবহার করুক সুমিতা, তার আগমন সংবাদে সে যে খুবই আনন্দিত হয়েছে তা'সে বেশ বুঝতে পারে। মনে হয় এ' ক'মাস তার জীবনে কিছু কিছু উত্তেজনা থাকলেও যেন তেমন কোনো অর্থ ছিল না। এখন এক রহস্যময় তুলির একটি টানে যেন তা' অনেক অর্থ প্রকাশে উদ্যত।

অবশেষে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ট্রেন ইন করে। ভিড় পাতলা হলে একে একে সকলে অবতরণ করেন। অতীন দেখে ড্রাইভার অনাদি দাস হতে আরম্ভ ক'রে মহামায়া পর্যন্ত সকলেরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। বিশেষত সুমিতার স্বাস্থ্যের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। কে যেন তার সারা মুখে হাল্কাভাবে সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে। তার সুন্দর নিটোল [illegible] দিকে তাকালে তা'কে পূর্বের চেয়েও স্বাস্থ্যবতী মনে হয়। ট্রেন-জার্নিতে কিছুটা শ্রান্ত মনে হলেও তাকে বেশ সজীব ও

প্রসন্নই বোধ হয়। দৃষ্টি হ'তে তার ঘৃণার বিষ সম্পূর্ণই অন্তর্হিত হয়েছে। মুখেও সেই কর্কশ-কাঠিন্যের লেশমাত্র নেই, তা'র পরিবর্তে নারীসুলভ স্নিগ্ধতায় তা' কমনীয় ও রমণীয়।

অতীন বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখে।

মহামায়া বলেন,—'কেমন আছো বাবা?'

অতীন ঘাড় নেড়ে বলে,—'ভালো।'—তারপর নিচু হ'য়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

তিনি সস্নেহে চিবুক স্পর্শ ক'রে চুমু খান।

সুমিতাও বোধ হয় সহজ হতে চায়। তার ব্যবহারে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যায়। অতীনকে বোধ হয় সে একজন পরিচিত বন্ধুর মত গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। মনোরম ভঙ্গিতে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে,—নমস্কার অতীনবাবু।'—কিন্তু সহজভাবে কথাটা বলতে গিয়েও সে কেমন একটু সংকোচ বোধ করে। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখের রঙ্ একটু গাঢ় হয়।

তার এই সংকোচটুকু অতীনের ভারি মিষ্টি লাগে। হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানিয়ে সে সুমিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তা'তে সুমিতা যেন আরও সংকুচিত হয়। তারপর তার সংকোচ ঢাকার জন্যই যেন সে হঠাৎ কিছু না-ভেবেই অনেক কথা বলতে শুরু ক'রে দেয়। বলে,—'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ অতীনবাবু। আপনার জন্যই আমি এ'যাত্রা বেঁচে উঠলাম। আপনি রক্ত দিয়েছিলেন ব'লেই হয়তো—'বলতে বলতে কীজানি কেন সে মাঝপথে থেমে যায়। তারপর একেবারে আপাদমস্তক রাঙা হ'য়ে ওঠে। ঘন আরক্ত মুখে মহামায়ার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে,—'মা আমার ব্যাগ, আমার ব্যাগটা কোথায়?'—মুখ নিচু ক'রে সে মালপত্র খোঁজাখুঁজি করে।

মুগ্ধ পুলকিত অতীন সেদিকে চেয়ে থাকে। একপাত্র রক্তিম দ্রাক্ষারসের মতই বিন্দু বিন্দু ক'রে সুমিতার এই আরক্ত মধুর লজ্জাটুকু সে উপভোগ করে।

এ' বছর শীতের বিক্রম ও বিস্তৃতি কিছু বেশি। এই ফাল্গুন মাসেও সে সমানভাবে আসর জাঁকিয়ে বসে ছিল। দুর্বিনীত প্রজার মত ঋতুরাজের সবগুলি নোটিশই সে অগ্রাহ্য করে। অতঃপর ফাল্গুনের শেষে উপস্থিত হয়ে কীজানি কেন তার মতি পরিবর্তন হয়। এবারের মত সে প্রস্থানে উদ্যোগী হয়। রাস্তার কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা-ছোঁয়া. দক্ষিণ-বাতাসের অল্প অল্প আভাস পাওয়া যায়। আকাশ ঘন নীল হয়। দু'একটা মৌমাছির গুণগুনানিও শোনা যায়। অবশেষে যেন সুমিতাকে অনুসরণ করেই হঠাৎ একদিন বসন্ত এসে উপস্থিত হয়। এই কলকাতার বাগান, পার্ক ও পথের গাছেও তার কিছু কিছু স্পর্শ লাগে। হয়তো ইটের দেওয়ালে বন্দী নগরবাসীর হৃদয়ও তার ছোঁয়া থেকে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

অতীনের যেন এক নতুন জীবন শুরু হয়। সকালবেলা ঘুম ভাঙলেই প্রথমে তার মনে পড়ে সুমিতার কথা। এক অপূর্ব বেদনা ও আনন্দে তার হৃদয় কানায় কানায় ভ'রে যায়। মনে মনে সে বারবার সুমিতার নাম উচ্চারণ করে: সুমিতা, সুমিতা, সুমিতা। শানু, শানু, শানু। কিছুতে যেন তার আশ মিটতে চায় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ এক নাম নানাভাবে বারবার মন্ত্রের মত উচ্চারণ করে।

কিন্তু এ' তার অন্তরের গোপন ঐশ্বর্য। বাইরে সে সুমিতাকে এড়িয়েই চলে। তার ভয় তার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে, তার

হৃদ্‌স্পন্দনের দুরু দুরু শব্দে সুমিতা যদি এই গোপন প্রেমের কথা জানতে পারে। ছিছি। তাহলে সে আর এখানে মুখ দেখাতে পারবে না। কী ভাববে সুমিতা? বার বার তার সুমিতার সেই বাসর ঘরের কথা মনে পড়ে।

সুমিতার কথায় বা আচরণে অবশ্য সেই রূঢ় অভদ্রতা আর নেই। কিন্তু হাওড়া স্টেশনের সেই ক্ষণিকের অনিচ্ছাকৃত বা চেষ্টাকৃত প্রগলভতার পর আবার নিজেকে সে সম্পূর্ণই সংযত ক'রে নিয়েছে। চোখে তার সেই ঘৃণার চিহ্ন নেই, অতীনের প্রতি অবজ্ঞাও সে আর প্রকাশ ক'রে না। তবু সে সর্বপ্রযত্নে নিজেকে অতীনের কাছ হ'তে দূরেই সরিয়ে রাখে। একান্ত প্রয়োজন না'হলে কখনো কথা বলে না। এবং যখন কথা বলে তখন যতদূর সম্ভব সহজভাবেই বলে।

তার ভাব দেখে অতীনের মনে হয় অতীনকে সে কতকটা আশ্রিত ব্যক্তি, কতকটা একজন উপকারী বন্ধু ব'লে গণ্য করে; যার কাছে তার বাবা, মা এবং ব্যক্তিগতভাবে সে নিজেও কৃতজ্ঞ। আর সেজন্য সে তার আর্থিক সাচ্ছল্য এবং যাবতীয় সুখসুবিধার ব্যবস্থা করতেও প্রস্তুত। কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। এর অতিরিক্ত কিছু আশা করলে রূঢ়ভাবে অপমান না-করলেও ভদ্রভাবেই তা'কে তার অধিকারের সীমানির্দেশ ক'রে দেওয়া হবে।

সকালবেলা অতীন দোতলায় তার ঘরে বসে সামনে বই খুলে সুমিতার কথাই বোধ হয় ভাবছিল। দরজার ভারি পর্দা সরিয়ে মামাবাবু এসে ঘরে ঢোকেন।—'কী করছো বাবা, পড়ছো?'

অতীন তাড়াতাড়ি বই বন্ধ ক'রে বলে,—'না না, এই এমনি বসে আছি।'

—'একটা কথা ছিল বাবা।'

অতীন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকায়।

মহামায়া সস্নেহে অতীনের কপাল থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে দেন। তারপর তাঁর কোমল হাত অতীনের মাথায় গায়ে বুলিয়ে দিতে থাকেন। এই তাঁর স্বভাব। অতীনকে তিনি সন্তানের মতই স্নেহ করেন। জামাই-এর মত দেখেন না। অতীন এটা বেশ বোঝে। তাই এখন আর এতে সে তেমন সংকোচ বোধ করে না। হাসিমুখে বলে,—'কী বলবেন মা বলুন।'

মহামায়া একটু ইতস্তত করেন। তারপর বলেন, —'তুমি যদি বাবা শান্তুর পাশের ঘরে থাকো তাহলে ভালো হয়। তুমি দোতলায় এই ঘরে থাকলে পাঁচজনে কী ভাবে! বিশেষত ঝি-চাকরদের কানাঘুষো তো কিছুতে এড়ানো যাবে না।'

মহামায়া চুপ করেন। অতীনের মুখেরদিকে তাকান। অতীন কিন্তু সুমিতার পাশের ঘরে থাকতে কিছুতে সাহস পায় না। তাহলে কি আর সে নিজেকে গোপন ক'রে রাখতে পারবে?

অতীন ভাবে, ঝি-চাকরের কানাঘুষো কি কিছুতে বন্ধ করা যাবে? সুমিতা তার সঙ্গে অতি অল্প কথা বললেও,—যখনই বলে তখন অতীনবাবু ব'লেই বলে। এবং তা' সকলের সামনেই বলে। কোনো কিছু গোপন করা তার স্বভাবে নেই। সুতরাং অনর্থক পাশের ঘরে থেকে লাভ?

অতীন মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে থাকে। মহামায়া বোধ হয় তার [illegible] কারণ কিছুটা আন্দাজ করতে পারেন। বলেন, —'তুমি যা' বলতে চাও তা' আমি বুঝি।—তবু পাশের ঘরে থাকলে কিছুটা কম দৃষ্টিকটু দেখায়। তাছাড়া বাইরের কেউ এলেও কিছুটা কম আশ্চর্য হবে।

অতীন ভাবে মহামায়া কি শুধু এই জন্যই তা'কে সুমিতার পাশের ঘরে থাকতে বলছেন? নাকি তিনি মনে করেন এর ফলে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে মিলনও একদিন সম্ভব হবে? তা যদি তিনি আশা ক'রে থাকেন তা'হলে আশাভঙ্গের দুঃখ তাঁকে নিশ্চয়ই পেতে হবে।

সে চুপ করেই থাকে।

—'কী বাবা, তোমার কী খুব অসুবিধা হবে?'

অতীন আর কী বলবে? তার অন্তরের কথা তো মহামায়াকে জানানো যায় না। শেষপর্যন্ত তাই সে বলে,—'না, অসুবিধা আর কী? আচ্ছা বেশ, তাই হবে।'

তেতলায় এ' ঘরে এসে অতীনের কিন্তু সত্যিই বড় অসুবিধা হয়। দিনের মধ্যে কতবার যে সুমিতার গলার স্বর ভেসে আসে! মানুষের কণ্ঠস্বরে কি এত মাধুর্য থাকে! অনিচ্ছা সত্বেও অতীন সারাক্ষণ উৎকর্ণ হ'য়ে থাকে।

একি যন্ত্রণা! এ'ভাবে মন যদি সমস্তক্ষণ বিক্ষিপ্ত থাকে তাহলে সে কি ঠিক মত পড়াশোনা করতে পারবে? অতীন কী করবে ভেবে পায় না। সুমিতার সব কিছুই তো সে এড়াতে চায়, তবু নিজের অজান্তে সুমিতার সব কিছুই বোধ হয় সে লক্ষ্য করে।

সুমিতা যে রোজ স্নানের পরে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢোকে সেটাও তার দৃষ্টি এড়ায় না। কী করে সুমিতা ঘণ্টা খানেক ঠাকুর ঘরে? আগেও কি সে এমনি ঠাকুর ঘরে যেতো? মনে তো হয় না। তাহলে এখন কেন? —যাইহোক, স্নানের পর ভিজে এলো চুল পিঠের পরে ছড়িয়ে সুমিতা যখন ঠাকুর ঘরে যায় তখন তাকে

ভারি সুন্দর দেখায়। বহুবার দেখবে না প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও অতীন প্রায় প্রতিদিনই আড়াল থেকে দেখে।
সুমিতা আজ কাল নিয়মিত মাথায় সিঁদুর দেয়। দেওঘরে থাকার সময় তো সে এমন করতো না! মহামায়ার বকাবকিতে একদিন দিতো তো সাতদিন দিতো না। আজ কাল কেন সুমিতা নিয়মিত সিঁদুর দেয়? মহামায়া কি বারবার ব'লে ব'লে অবশেষে তাকে রাজী করতে সমর্থ হয়েছেন? অতীন যেমন বাধ্য হ'য়ে সুমিতার পাশের ঘরে আছে তেমনি পাঁচজনের যা'তে দৃষ্টিকটু না-হয় সেইজন্যই কি সে সিঁদুর পরছে? নাকি অন্যকিছু? অন্যকিছু ভাবতে কিন্তু ভরসা পায় না অতীন।

দুপুর বেলা। অতীন গেছে ইউনিভার্সিটিতে। ঘর খালি। নেহাৎ পাশের ঘর বলেই হয়তো সুমিতা দরজার ভারি পর্দা সরিয়ে ভিতরে একবার উঁকি দেয়। চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে। বাবাঃ, কী ক'রে রেখেছে ঘরটা! ছেলেটা ভারি অগোছালো তো!

সুমিতা ঘরে ঢোকে। অতীন আসার পর এ'ঘরে সে একদিনও আসেনি। দেখে ঘরের মেঝেতে জুতোর দাগ, ছেঁড়া কাগজ, সিগারেটের কয়েকটা টুকরো,—আরো কত কী। কাপড়-জামা বিছানার ওপর ছড়ানো। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত বইখাতা। একটা দেরাজ খোলা। তা'তে একরাশ শুকনো ফুল।

দেরাজের মধ্যে ফুল! সুমিতা ভারি বিস্মিত হয়। একটা ফুলদানিও জোটেনি। মা-ই বা কেমন! একটু দেখে না এ' সব।

সুমিতা চলে যেতে যেতে কী ভাবে। তারপর শুকনো ফুল সব ফেলে দিয়ে দেরাজটা পরিষ্কার করে। খাটের ওপর থেকে

কাপড় নিয়ে কুঁচিয়ে আলনায় রাখে। তারপর নিজের ঘর থেকে ফুলসুদ্ধ একটা সুন্দর ফুলদানি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখে। কী ভেবে শেষে ফুলগুলি আবার নিজের ঘরে রেখে আসে। শুধু ফুলদানিটা থাকে।

মেঝেটাও পরিষ্কার না-ক'রে যেতে তার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে। শেষপর্যন্ত তাই সে নরম ছোটো ঝাঁটা দিয়ে নিঃশব্দে ঘরটা ঝাঁট দিতে শুরু ক'রে দেয়। কিন্তু ঠিকমত ঝাঁট দিতে পারেনা। জীবনে এই প্রথম বোধ হয় সে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। অবশ্য সে মনদিয়ে সযত্নেই ঝাঁট দেয়।

কে জানতো যে সেদিন দেড়টার সময়ই অতীন ফিরে আসবে! অতীনও কী জানতো সুমিতাকে এই অবস্থায় দেখবে। দু'জনেই অবাক। অপ্রতিভ। সুমিতা লজ্জায় একেবারে রাঙা হ'য়ে ওঠে।

সুমিতার শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো। হাতে ছোটো ঝাঁটা। আরক্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাকে কী সুন্দর যে দেখায়! বিস্মিত অতীন মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কিন্তু নিজেকে সামলে নেয় সুমিতা। লজ্জিত হওয়ার জন্য বোধ হয় নিজের উপরই রেগে যায় সে। কিংবা অতীনের উপরই চটে,—ঠিক বোঝা যায় না।

ভ্রূকুঁচকে রূঢ়ভাবে বলে,—'কী বিশ্রী নোংরা ক'রে রেখেছিলেন ঘরটা! এ'রকম আর কখনো করবেন না।'—তার স্বরে বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ পায়। এ'যেন ঘর নোংরা করার জন্য ধনী বাড়িওয়ালা গরীব ভা[illegible]টেকে ধমক দিচ্ছে। অতীন এতটুকু হ'য়ে যায়।

সুমিতা দাঁড়ায় না। লজ্জিত মর্মাহত [illegible]র পাশ কাটিয়ে গম্ভীরমুখে মাথা উঁচু ক'রে সে ঘর হতে বার হ'য়ে যায়।

অতএব অত্যন্তই আহত হয়। কথাটা কিছুই নয়। কথা বলার ভঙ্গিটা, টোন্‌টাই আসল। কেন সুমিতা ও'রকম ক'রে বললো? ও'কথা কি অন্যভাবে বলা চলতো না? তা' ছাড়া এমন কি সে করেছে? মেঝেতে ছেঁড়া কাগজ আর সিগারেটের কয়েকটা টুকরো হয়তো ছড়িয়ে ছিল। কী দরকার ছিল সুমিতার তা' ঝাঁট দেওয়ার। বিকেল বেলা ঝি-ই তো ঝাঁট দিতো। দু'বেলাই তো সে ঘর পরিষ্কার করছে। কিছু প্রয়োজন ছিল না সুমিতার তার ঘর ঝাঁট দেওয়ার। আর যদি দিয়েই থাকে তো দিয়েছে। তা'তে অত কথা কী? সে কি ছেলেমানুষ যে সুমিতা ওমনি ক'রে তা'কে ধমকাবে? আসলে তা' নয়। সুমিতা বারবার তা'কে বুঝিয়ে দিতে চায় যে সে এ' বাড়িতে আশ্রিত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? মহামায়া অরবিন্দ অনেক অনুরোধ করেই কি তাকে এখানে রাখেন নি?

আর সুমিতাই বা কী রকম! দেওঘরে সুমিতার জন্য অতীন কী না করেছে? সে না থাকলে সুমিতা আজ বেঁচে থাকতো কিনা সন্দেহ। হৃদয় না-থাকুক, একটু কৃতজ্ঞতাবোধও তো থাকা উচিত। তা-ও নেই সুমিতার। আশ্চর্য!—অথচ এই সুমিতাকেই সে গোপনে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। ছিছি!

এই তো সেদিন স্টেশনে সুমিতা তাকে বলেছে—'আপনার জন্যই আমি এ'যাত্রা বেঁচে উঠলাম। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'—সব মিথ্যে কথা, সব বাজে কথা তার! তাকে বোকা পেয়ে ভুলিয়েছে সুমিতা। আর সে তাই বিশ্বাস করেছে। ছিছি, এত বোকা, এত ছেলেমানুষ সে!—

অতীনের গলার কাছে একটা বাষ্পের ডেলা এসে আটকে যায়। চোখ জ্বালা করতে থাকে। আরে, সে কি সত্যিই ছেলেমানুষ!

অতীন সেই অবস্থায়, সেই দুপুর রোদ্রেই আবার বাড়ি থেকে বার হয়ে যায়। অশান্তমন নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে একসময় শ্রান্ত হয়ে পড়ে। একটা রেষ্টুর‍্যাণ্ট দেখে ঢুকে পড়ে তার মধ্যে। কোনোদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে বলে,—'এক কাপ চা দেখি।'

নিজের চিন্তায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে সে চায়ে চুমুক দিতে থাকে।

—'আরে, অতীন না!'

অতীনের চমক ভাঙে। চেয়ে দেখে বিনয়।

বিনয় বলে,—'আশ্চর্য, কোথায় ছিলি তুই এতদিন? পশ্চিমে? —তা' একটা চিঠি দিসনি কেন? আমি ভেবে মরি,—সেই যে ব'লে গেলি কার গার্ডিয়ান টিউটর না কী হয়ে বাইরে যাচ্ছিস তারপর থেকে তোর আর কোনো পাত্তাই নেই। আমি কত চেষ্টা করেছি কোনো খোঁজ পাইনি।'

অতীন মহা অপ্রস্তুত হয়। সত্যিই আজ এই পনের-ষোলো মাসের মধ্যে বিনয়ের সঙ্গে সে একবারও দেখা করেনি। একটা চিঠি পর্যন্ত দেয়নি। অথচ বিনয় তার আশৈশব সঙ্গী। বহুদিনের সুখদুঃখের সাথী। এক পাড়ার ছেলে। বয়সে সামান্য বড় হলেও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শুধু তাই নয়, এই সেদিন পর্যন্ত এই বিনয়ই তা'কে তার মেসে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

অবশ্য এ'রকম করার তার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। এমনিই ঘটে গেছে এটা। নানা কারণে বিয়ের আগে বিনয়কে সে কিছুই জানায়নি। বলেছিল, একটি বড়লোকের মেয়ের গারডিয়ন টিউটর হয়ে সে পশ্চিমে যাচ্ছে। পাটনা না কোথাকার কথা যেন বলেছিল। তখন ভেবেছিল, ক'মাস বাদে দেওঘর হ'তে ফিরে সব কথা বিনয়কে

খুলে বলবে। কিন্তু দেওঘর থেকে আসার পর কিছুটা সতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার নেশায়, কিছুটা বোধ হয় এমনি সংকোচবশত বিনয়ের কাছে সে যায় নি। তারপর তার মনে হয়েছে এতদিন পর এখন কি আর যাওয়া চলে? ছিছি, বিনয় কী মনে করবে?—আচ্ছা, পরে একদিন ধীরেসুস্থে গিয়ে বিনয়কে সব কথা খুলে বলা যাবে। এমনি ক'রে দিন কেটে গেছে।

অতীন সত্যিই অত্যন্ত লজ্জিত হয়। বলে,—'চল বিনয় বাইরে চল। সব কথা বলবো।'

তারা একটা পার্কে এসে বসে।

অতীনের আপাদমস্তক ভালোভাবে লক্ষ্য ক'রে বিনয় বলে,—'তোর শরীর তো বেশ ভালো হয়েছে।—তা' পশ্চিমের জল-হাওয়া তো ভালো, হবে না কেন।'

অতীন সংকোচের সঙ্গে বলে,—'এখন আর পশ্চিমে থাকি না তো। এখানেই থাকি।'

সবিস্ময়ে বিনয় বলে,—'এখানে—কোলকাতায়?'

অতীন বলে,—'হ্যাঁ।'—তারপর ধীরে ধীরে সব বলে যায়। অবশ্য সুমিতার দুর্ব্যবহারের কথাটা বাদ দেয়।

বিস্মিত বিনয় মন দিয়ে শোনে। তারপর বলে,—'ঈশ—,জীবনটা এ'ভাবে নষ্ট ক'রে ফেললি!'

অতীন অধোমুখে চুপ ক'রে বসে থাকে।

বিনয় বলে,—'কেন এই বিয়েতে রাজী হয়েছিলি বলতো?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁত দিয়ে ঘাসের ডগা কাটতে কাটতে অতীন বলে,—'সেটা আজো আমার কাছে একটা রহস্য।'

বিনয় উত্তেজিত হয়ে বলে,—'রহস্য আবার কী?—এম-এ

পড়ার জন্ত, বড়লোকের বাড়ি আরামে থাকার জন্ত তুই এই বিয়ে করেছিস।'

রাগের মুহূর্তে এ'কথা অতীনও বহুবার নিজেকে বলেছে। তবু বিনয়ের মুখ থেকে সেই কথা শুনে সে কিছু আহত হয়। বলে,—'ঠিক সেজন্ত নয় বিনয়। যদিও আমি খুবই দুর্বলচরিত্রের লোক, তাহলেও শুধুমাত্র এম-এ পড়ার লোভে বা বড়লোকের বাড়ি আরামে থাকার জন্ত আমি এ' বিয়ে করিনি। আমি নিজেকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি। শুধু সে জন্ত নয়। হয়তো আমার অবচেতন মনে এই সব এবং আরো অনেক কিছুর লোভ লুকিয়ে ছিল। সে-বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। সে সম্বন্ধে আমি খুব সচেতন ছিলাম না। কিন্তু জানত,—আমি সত্যি বলছি তোকে,—একটি মেয়ের এই দারুণ বিপদের কথা চিন্তা করেই আমি এই বিয়েতে রাজী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি তো আর বিয়ে নয়। একটু অভিনয় ক'রে যদি একটি মেয়েকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তার বাপমায়ের মানসম্মান বাঁচানো যায় তাহলে ক্ষতি কী?'

বিনয় বিরক্ত হয়ে বলে,—'একটু অভিনয়? কী পাগলের মত কথা বলছিস তুই। সমস্ত জীবনটা তুই নষ্ট ক'রে ফেলেছিস।'

অতীন চুপ করে থাকে। কিছু বলে না। কয়েক ঘণ্টা পূর্বে স্নমিতার দুর্ব্যবহারে তার মনটাও বিষম তিক্ত হয়ে আছে। তাই এই মুহূর্তে মনে মনে সেও বিনয়ের কথা সমর্থন করে।

পার্কে ছোটো ছোটো ছেলেরা রবারের বল নিয়ে খেলছে। কী স্ফূর্তি তাদের। কোনো ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, কিছু নেই।

খেলতে খেলতে একবার বলটা এদিকে গড়িয়ে আসে। অতীন হাত দিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয়। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে বলে,—'সত্যিই খুব ভুল করেছি। তুই যা' বলছিস তাই হয়তো ঠিক। এম-এ পড়ার লোভেই হয়তো আমি এই বিয়েতে রাজী হয়েছিলাম। সত্যিই খুব ইচ্ছে ছিল ভালোভ'বে এম-এ পড়ার, রিসার্চ-স্কলার হিসেবে কাজ করার। কিছু না-ভেবেই হয়তো এই ফাঁস গলায় পরেছি।—যাকগে, যা' হবার হয়ে গেছে।—আর তা' ছাড়া কীই বা করতে পারতাম আমি জীবনে। কী কাজই বা আমার দ্বারা হতো!'

—'অনেক কাজ। দেশের অসংখ্য মানুষের আজ পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই। তিলে তিলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরে যাচ্ছে তারা।—অন্তত তাদের বাঁচার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যও এখন অনেক কাজ করার আছে।'

ক্লান্তকণ্ঠে অতীন বলে।—'কিন্তু আমার দ্বারা কি তা' হতো? —আমি তো নিজেকেই বাঁচাতে পারছিলাম না।'

ক্রুদ্ধস্বরে বিনয় বলে,—'তাই বলে এ'ভাবে বাঁচাবি? ধনীর অন্নদাস হয়ে নিজেকে যদি তুই বাঁচাবার চেষ্টা করিস,—দেখবি দু'দিনেই তোর চরিত্রের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। তখন আর তোকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তখন তুই শুধু একটা ক্ষুধার যন্ত্র, নানারকম দৈহিক আরাম লোভী শুধু একটা শরীর মাত্র। সামাজিক শক্তি নাহয়ে তখন তই সমাজের ভার সরূপ হয়ে উঠবি।

ধনীর অন্নদাস? কথাটা অতীনের মর্মে গিয়ে লাগে। সত্যিই কি সে তাই? —অরবিন্দের কথা মনে পড়ে,—'তুমি নয়, আমরাই তোমার কৃপার পাত্র অতীন।'—মহামায়ার সমস্ত কথাও একে একে তার মনে আসে।—কিন্তু সুমিতার ব্যবহারে তো তার সমর্থন পাওয়া যায় না। ওটা শুধুই কথার কথা তাহলে? সত্যিই তাই।—অতীন কেমন ম্লান হয়ে পড়ে।

হঠাৎ বিনয় আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, —'তুই চলে আয় অতীন। এখন তো তা'দের মেয়ে কলঙ্কমুক্ত হয়েছে! দরকার মনে করলে তারা আবার তাদের মেয়ের বিয়ে দেবে। বড়লোকদের ব্যাপারই আলাদা। ওরা সব পারে। —তোর এম. এ. পড়ার কোনো দরকার নেই। দেশের অধিকাংশ লোক যখন নিরক্ষর তখন দু'দশজনের অতি উচ্চশিক্ষা লজ্জাকর। অবশ্য উচ্চশিক্ষা সব সময়ই সমর্থন যোগ্য ;—কিন্তু একা একা বা দু'চারজনে নয়। সকলকে,—অন্তত সমাজের অধিকাংশ মানুষকে সমান সুযোগ দিয়ে। একা-একা-র দিন আজ গেছে অতীন।'

উত্তেজিতভাবে বিনয় অনেক কথা বলে। কিছু কিছু এলোমেলো অপ্রাসঙ্গিক কথাও বলে। কিছু কথা ফাঁকা বক্তৃতার মতও শোনায়। তবু অতীন তা' উড়িয়ে দিতে পারে না। সে জানে বিনয়ের কথা শুধু ফাঁকা বক্তৃতা নয়। তার কথা ভুল হতে পারে, কিন্তু সে মুখে যা' বলে, তাই সে ভাবে ; কাজেও তাই করে। ছেলেবেলা থেকে সে বিনয়কে দেখছে। একটি বামপন্থী রাজনৈতিক পার্টির সে সভ্য। একরকম এই পার্টির কাজেই সে জীবন উৎসর্গ করেছে।

অবশেষে বিনয় আবার বলে,—'চলে আয় অতীন, যেমন ছিলাম তেমনি থাকি। তারপর পেট চালাবার একটা ব্যবস্থা ক'রে সম্পূর্ণভাবে কাজে লেগে যা।'

—'রাজনীতি আমার ভালো লাগে না বিনয়।' হঠাৎ অতীনের মুখ দিয়ে বার হ'য়ে যায়।

আবার বিনয় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে,—'রাজনীতি ছাড়া সত্যমানুষের আজ চলতেই পারে না।'

—'কিন্তু রাজনীতি বড় নোংরা।'

—'নোংরা ? বেশ, যদি তাই হয়, তাকে আমাদের পরিষ্কার করতে হবে।—আসলে তা নয়। তুই অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে পড়েছিস। তাই দশজনের ব্যাপার তোর নোংরা মনে হচ্ছে।'

অনেক কথা হয়। অনেক তর্ক হয় দুই বন্ধুতে। কথা বলতে বলতে রাত্রিও অনেক হ'য়ে যায়। শেষপর্যন্ত অতীন ঠিক ক'রে যে অরবিন্দের ওখান থেকে সে চলেই আসবে। সুমিতার দুর্ব্যবহারের সে যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে অতীনের প্রায় এগারোটা বাজে। এ'পাড়ায় এটা বেশ রাত। অধিকাংশ বাড়ির আলো নিভে গেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দু'একটা বাড়িতে রাত্রির আহারের পর ঘর ধোয়ার ঝাঁটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোনো কোনো বাড়ির সামনে চাকর-বাকররা খাওয়া দাওয়ার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। কথাবার্তা বলছে।

অতীন এ'সবের দিকে তেমন লক্ষ্য করে না। সে তার সংকল্পের কথা বারবার মনের মধ্যে ঘোষণা করে। কাল সে ও' বাড়ি থেকে চলে আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। না, কোনোরকম রাগারাগি সে করবে না। বেশ ভালোভাবে কথাবার্তা ব'লে ওখান থেকে সে বিদায় নেবে। এখন এলে ওদের কোনো ক্ষতিও হবেনা। মহামায়া অরবিন্দ যা-ই বলুন এবার আর সে দুর্বল হবে না। কোনোরকম দুর্বলতা প্রকাশ করবে না। কোনো কিছুতেই সে তার সংকল্প হ'তে বিচ্যুত হবে না। সুমিতা এসে যদি ক্ষমা চায় তাহলেও না। আজ ক্ষমা চেয়ে কালই হয়তো তার ওপর ছড়ি ঘোরাবে সে। সুমিতাকে তার চিনতে বাকী নেই। এই সব ধনীর দুলালারা এই রকমই হয়। এদের কাছ থেকে দূরে থাকতে

পাওয়া যায় ততই ভালো। এদের সংস্পর্শে কোনোমতেই থাকা উচিত নয়। তাতে চরিত্রের অবনতি ঘটে।

অতীন গেট দিয়ে ঢুকে আপন মনে মাথা নিচু ক'রে হাঁটতে থাকে। বাড়ি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। অন্ধকার। দু'একটি ঘর হতে শুধু আলোর রেখা তির্যক ভাবে বাগানে এসে পড়েছে। ছোটো ছোটো নুড়ি ছড়ানো বাগানের শীর্ণ পথের 'পর দিয়ে তার চলায় বিশ্রী শব্দ হয়। নিস্তব্ধ বাড়ি যেন সে-শব্দে সচকিত হয়ে উঠছে। সত্যি রাত্রি অনেক হয়েছে। কিন্তু এত রাত্রেও স্বল্পালোকিত বাগানের পথের প্রান্তে তার সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সুমিতাকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হয়। পাশ কাটিয়ে অতীন চলে যাওয়ার চেষ্টা করে।

সুমিতা সসংকোচে বলে,—'শুনছেন,—আপনার কাছে স্যারিডন আছে? ভীষণ মাথা ধরেছে আমার।'—তার স্বর যন্ত্রণাক্লিষ্ট।

অতীন থমকে দাঁড়ায়। সুমিতার মুখের দিকে তাকায়। স্বল্পালোকে তার সুন্দর শুভ্র মুখ বড়ই করুণ মনে হয়। চোখ দুটিও চিক চিক করছে।

অতীনের বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। বড় মায়া লাগে।

মুহূর্তমধ্যে সুমিতার প্রতি সমস্ত রাগ তার দূর হয়ে যায়।

সুমিতার কি খুব কষ্ট হচ্ছে—খুব যন্ত্রণা? কিন্তু তার কাছে তো স্যারিডন নেই। এনে দেবে?

—'এখুনি এনে দিচ্ছি। আসার সময় ডাক্তারখানা খোলা দেখে এসেছি।'—

সুমিতার আয়ত করুণ দুই চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে। বলে,—'এত রাত্রে আপনি আবার যাবেন! আমি শিবুদাকে খুঁজছিলাম। সে-ই এনে দিত।'

—'না না, আমিই এনে দিচ্ছি।'—অতীন অগ্রসর হয়।

আলো-আঁধারের মায়া-লাগা বাগানের হ্রস্ব পথে সুমিতাও তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে।

অতীন সস্নেহে বলে,—'আপনি আবার কেন কষ্ট করে আসছেন?'

তবু কী জানি কেন সুমিতা অতীনের পাশে পাশে গেট পর্যন্ত আসে। তার চুল থেকে, তার শাড়ি থেকে, তার শরীর থেকে কী একটা মধুর গন্ধ ভেসে আসে। অতীনের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

দেখা যায় মহামায়াও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। ঘরে ঢোকামাত্রই তিনি প্রশ্ন করেন,—'কোথায় ছিলে বাবা এত রাত্রি পর্যন্ত? সন্ধ্যা থেকে শানু ঘর-বার করছে তোমার জন্য।'

শানু? সুমিতা? সুমিতা ঘর-বার করছিল তার জন্য? অতীনের যেন বিশ্বাস হয় না এ'কথা।

—'কী কথা নাকি শানু তোমায় বলেছিল? ওর ধারণা তুমি রাগ করেছো। এত যদি ভয়, তাহলে বলাই বা কেন ও' ভাবে? —কী বলেছিল শানু তোমায়?—মহামায়া প্রশ্ন করেন।

—'এমন কিছু নয়। ঘরটা অপরিষ্কার ছিল, তাই বলেছিলেন।'

—'ও বুঝি নিজে পরিষ্কার করছিল?'—মহামায়া তৃপ্তির হাসি হাসেন।

অতীন কেমন একটু লজ্জা অনুভব করে।

মহামায়া বলেন—'যাক ও সব কথা। তুমি এখন একটু বিশ্রাম ক'রে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও। বড় রাত হয়ে গেছে। আর দেরি কোরো না বাবা।'—তিনি সস্নেহে অতীনের দিকে তাকান।

আহারান্তে অতীন নিজের ঘরে এসে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। তার ঘুম আ-তে চায় না। ঘরে অল্প অল্প চাঁদের আলো এসে পড়েছে। অতীন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। আকাশে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। এলোমেলো নানা কথা তার মনে আসে। নির্জন অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ তার মনে হয় এ' বাড়ি ত্যাগ করে সে কোথাও যেতে পারবে না। সুমিতাকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়,—কোথাও না।

ছয়

যন্ত্রণা, শুধুই যন্ত্রণা! স্মিতার কাছে থাকাও যন্ত্রণা,—স্মিতার কাছ হ'তে দূরে যাওয়ার চিন্তাতেও যন্ত্রণা। কী যে হলো অতীনের!

সেদিনের সে ঘটনার পর স্মিতা আবার তার আত্ম-নির্মিত কঠিন দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অতীন সম্পর্কে আবার তাকে পূর্ববৎ উদাসীন দেখা যায়।

তবে সেদিনের ব্যাপারটা সহজ করবার জন্যই বোধ হয় তার পরদিনই সে অতীনের ঘরে এসে ঢোকে। তার মাথা ধরা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পূর্বেই সে হাসিমুখে নিঃসংকোচে বলে,—'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অতীনবাবু। কাল সত্যিই খুব মাথা ধরেছিল।'—তারপর একটু থেমে, সামান্য একটু ইতস্তত ক'রে বলে,—'কালকে আপনার ফিরতে দেরি দেখে মনে হয়েছিল আপনি হয়তো আমার কথায় রাগই করেছেন। হয়তো রাগ ক'রেই আসছেন না। আপনি যদি সত্যিই রাগ ক'রে না-আসতেন তাহলে মা-বাবা আমাকে আর আস্ত রাখতেন না। ওঁরা নিশ্চয়ই ধারণা করতেন যে আমি সাংঘাতিক কিছু আপনাকে বলেছি। মা তো কাল রাত্তির থেকেই আমাকে বকুনি শুরু করে দিয়েছিলেন। কী চিন্তার মধ্যেই যে পড়েছিলাম। আপনাকে আসতে দেখে তবে নিশ্চিন্ত হই।—যাক্, বাঁচা গেছে। আপনি রাগ করেননি।—কী, রাগ [illegible]লেন নাকি?'—স্মিতা একটু হাসবার চেষ্টা করে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে অন্যকথা পাড়ে।—'পড়ছেন বুঝি? আচ্ছা পড়ুন। আপনাকে আর বিরক্ত করবো না।'—ব'লে অতীনকে কিছু বলার অবসর না-দিয়েই সে ঘর হতে বার হয়ে যায়।

অর্থাৎ স্মিতা যে আগের দিন রাত্রে অতীনের জন্য বিশেষ চিন্তিত

হয়ে পড়েছিল সেটা যদি অতীন জেনেই থাকে তাহলে এটাও জেনে রাখুক যে তা' স্থমিতার বাবা-মার ভয়ে,—অন্য কারণে নয়।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? স্থমিতা কি তার বাবা-মাকে ভয় করে? বরঞ্চ তার উল্টোটাই তো মনে হয়।—তাহলে?

যাই হোক, স্থমিতা যখন তা-ই বলতে চায়, এবং অতীনকেও যখন সে এড়িয়ে চলতেই চায়, তখন অতীনেরও উচিত স্থমিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা।

বহুবার নিষ্ফল হলেও—অতীন স্থমিতা সম্বন্ধে আবার উদাসীন হওয়ার চেষ্টা করে। ক্ষণে ক্ষণে স্থমিতার গলার স্বর যা'তে কানে না-আসে সেজন্য অতীন নিজের ঘরে ঢুকেই দরজায় খিল দিয়ে দেয়। সমস্ত মন দিয়ে পড়াশোনা করে। সেই সঙ্গে তার সাহিত্য-চর্চাও চলে। অবসর সময়টা সে বেশির ভাগ বাইরেই কাটায়। কিছুটা সতীর কাছে গিয়ে হাসি-গল্পেও অতিবাহিত করে।

সতীর বেহায়াপনা বা অত্যন্ত পুরুষ-ঘেঁষা ভাবটা তার একেবারে ভালো লাগে না। সতীর দেহ ও মনের স্থূলতাও তার সূক্ষ্ম মার্জিত রুচিকে বারবার পীড়া দেয়। তবু এ'সব সত্ত্বেও সতীর প্রতি সে একটা আকর্ষণ অনুভব করে। তাই সময় সময় অসহ্য হওয়াতে পালিয়ে এলেও কারণে অকারণে বারবার সে সতীর ঘরে যায়। কথা-বার্তা হাসি-গল্পে সময় কাটায়।

সন্ধ্যাবেলা চা খেতে খেতে কথা হয়।

সতী বলে,—'ঠাকুর পো, তোমার দাদা যা' বলেছিলো তা-ই ঠিক। তুমি সত্যিই ছেলেমানুষ।' একটু থামে সতী। তারপর একটু চিন্তার ভান ক'রে বলে,—'না, ছেলেমানুষও তুমি নও। তুমি মেয়েমানুষ।'

অতীন একটু লাল হ'য়ে ওঠে। বলে—'তাই নাকি।'

—'তা'ছাড়া কী? কথায় কথায় এত লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠো কেন?'

—'লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠা কি মেয়েদের লক্ষণ?'

—'তাই তো দেখি।'—সতী মুখ টিপে হাসে।

অতীন আবার লাল হ'য়ে ওঠে। তবে এবার বোধ হয় রাগে। বিদ্রূপের স্বরে বলে,—তা'হলে তো আপনাকে মেয়েছেলে বলা চলে না। কারণ আপনাকে আমি কখনও লজ্জায় লাল হতে দেখিনি।'

—'তুমি দেখবে কী করে? মেয়েদের কাছে কি মেয়েরা কখনো লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে?'—সতী ভালোমানুষের মত আবার মুখ টিপে হাসে।

অতীন আর কথা খুঁজে পায় না। একটা বোবা রাগ তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। সে চুপ ক'রে বসে থাকে।

সতীও বোঝে অতীন রাগ করেছে। রাগাতেই কি সে চেয়েছিল? কে জানে। সে-ও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর বলে,—'ঠাকুর পো, রাগ করলে?'

অতীন উদাসভাবে বলে,—'রাগ? নাঃ, আপনার কথায় কি রাগ করা চলে? আপনার কথাবার্তা, চালচলন কোনোকিছুই আমি সীরিয়াস্‌ভাবে নিই-না। তা' যদি নিতাম, তাহলে আপনার সঙ্গে এতদিন সদ্ভাব রাখাই দুষ্কর হতো।'

—'এই তো ভীষণ রেগে গেছো। রাগের চোটে গড়গড় ক'রে কথা বার হচ্ছে। আচ্ছা লোক,—ঠাট্টাও বোঝো না!' তারপর একটু থেমে মুখটাকে যথাসম্ভব করুণ ক'রে বলে,—'সত্যি রাগ করলে?

আচ্ছা অমন ঠাট্টা আর আমি কথনো করবো না।'—তাকে খুবই অনুতপ্ত ও বিষণ্ণ মনে হয়।

এবার অতীন হাসে। হাসিমুখেই বলে,—'থাক থাক, আপনাকে আর চেষ্টা ক'রে মুখখানাকে অমন করতে হবে না। কত অভিনয়-যে আপনারা করতে পারেন!'

—'অভিনয়? মাইরি না।'—বলতে বলতে সতী হেসে ফেলে।—তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যই বোধ হয় বলে,—'জানো ঠাকুর পো, কাল কী হয়েছিল?—জানো তো তোমার দাদা ব্যবসার কাজে মাঝে মাঝে মফস্বল সহরে যায়। সেখানে দু'-চার দিন না-থেকে আসতে পারে না। কাল তেমনি গিয়েছিল। ব'লে গিয়েছিল তিন দিন পরে আসবে।—এখন হয়েছে কী, আমার ঘরের এই ফ্যানটা দিন কয় হলো খারাপ হ'য়ে গেছে। রাত্তিরে ভ্যাপসা গরমে আর ঘুমতে পারি না। দেখি সামনে দালানে বেশ হওয়া আসছে। দালানে কেউ নেইও। কী আর করি ছেলে দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে একটা মাদুর আর একটা বালিশ নিয়ে দালানে এসে শুয়ে পড়লুম।—ওমা,—মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে দেখি কে যেন পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আছে।—ও' তো বাড়ি নেই। কে তবে? তারপর ভাবলুম, যাক গে, যে হোক গে, এখন তো ঘুমই।'—ব'লে সতী খিল খিল করে হাসে। হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ে একেবারে।

অতীন ভেবে পায় না এতে হাসির কী আছে? স্বামী ঘরে নেই। যুবতী স্ত্রী গরমে ঘরের বাইরে এসে শুয়েছে। রাত্রে দেখে আর একজন পুরুষ তা'কে জড়িয়ে ধ'রে আছে। এটা হাসির ব্যাপার?

হাসি থামিয়ে সতী বলে,—'তারপর সকালে দেখি কী,—আর কেউ নয় তোমার দাদা। কাল মফস্বলে যাওয়া হয়নি। অনেক রাত্রে

ফিরেছিল তাই আর আমাকে ডাকেনি।'—একটু থেমে বলে,—'আজকে গেছে। ফিরতে দিন চারেক নাকি দেরি হবে।'—একটু চুপ ক'রে থাকে সে। তারপর স্বগতোক্তির মত বলে,—'বাবা, আজও কী গরম। আজও বাইরে শুতে হবে।'

অতীন মন দিয়ে শোনে। কী বলতে চায় সতী? কিসের ইঙ্গিত এটা? ভারি বিশ্রী লাগে তার।

রাত্রে কী জানি কেন ঘুম আসে না অতীনের। খালি এ'পাশ ও'পাশ করে। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও হাজারো চিন্তা মাথায় মধ্যে হুড়োহুড়ি করতে থাকে। ঘুমের যত রকম প্রক্রিয়া জানা আছে তার সব সে প্রয়োগ করে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। মনে মনে গড্ডলিকা প্রবাহের দিকে চেয়ে থাকে। এক, দুই, তিন ক'রে প্রত্যেকটা ভেড়া গোনে। কিন্তু একটা অবাধ্য ভেড়া কিছুতে অগ্রসর হতে চায় না। তাকে যত সে সামনের দিকে চালাতে চায় ততই সে উল্টো দিকে যায়। শেষপর্যন্ত নাজেহাল হ'য়ে সে ছেড়ে দেয়। নাঃ, ঘুম আর হবে না। ঢং ঢং ক'রে দু'টো বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ে।

এ' বাড়ি দশটার পরই প্রায় নিঝুম হ'য়ে পড়ে। দুটোর সময় সত্যিই গভীর রাত্রি। দরজা খুলে অতীন বাইরে আসে। রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করছে। হঠাৎ সে একেবারে অবাক হ'য়ে যায়। দেখে বারান্দার রেলিং ধ'রে সতী দাঁড়িয়ে আছে। তেতলায় সতী এসেছে! অতীনের বুকের মধ্যে দুর দুর করে। তারপর ভালো ক'রে চেয়ে দেখে আরও বিস্মিত হয়। সতী নয় সুমিতা। সুমিতা বারান্দার রেলিং ধ'রে পিছনের বাগানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার শিথিল আঁচল হাওয়ায় ঈষৎ দুলছে। তার খোঁপা অর্ধেক ভেঙে

পিঠের ওপর এসে পড়েছে। তার দেহের একদিকে চাঁদের ম্লান আলো প'ড়ে একটা আলো-আঁধারের রহস্য সৃষ্টি করেছে। অতীন চেয়ে দেখে। চেয়ে থাকে অতীন।

কী জানি কেন সুমিতাকে তার বড় অসুখী মনে হয়। সুমিতার দুঃখ যেন সে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করে। অতীনের সব ভুল হয়ে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে সুমিতার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তার সমস্ত অন্তর স্নেহে করুণায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। চুপি চুপি বলে,—'কী ঘুম আসছে না?'

সুমিতা প্রথমে একটু চমকে ওঠে। তারপর ব্যথাভরা দৃষ্টি অতীনের মুখের দিকে তুলে মৃদুস্বরে বলে,—'না, কিছুতে ঘুম আসছে না।'

সে মাথা নত করে। চাঁদের আলো তার চিকন চুলের 'পরে প'ড়ে ঈষৎ চকচক করতে থাকে। চুলের মাঝ দিয়ে সুন্দর সিঁথির রেখা স্পষ্ট দেখা যায়। সিঁথির গোড়ার দিকে সুস্পষ্ট সিঁদুরের আভাসও বোঝা যায়। সে তেমনি নতমুখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

অতীন কী বলবে ভেবে পায় না। রাত্রির যাদু যেন তাকে সম্মোহিত ক'রে ফেলেছে। চিন্তা করার শক্তিও যেন তার অন্তর্হিত হয়েছে। সেও স্পন্দিতবুকে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—কুমারী মেয়ের দুরু দুরু বুকের মত সময়ের বুকও বুঝি স্পন্দিত হয়।

সুমিতা আর একবার মুখ তুলে আয়ত চোখে অতীনের চোখের দিকে তাকায়। তারপর মাথা নিচু ক'রে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

অতীন তখনো তেমনি সম্মো-িতের মত দাঁড়িয়ে। একটু ঝির ঝির

করে বাতাস আসে। সেই সঙ্গে একটু চেনা গন্ধ। যেন কতদিনের কত কালের চেনা।

অতীন তেমনিভাবে সুমিতার গমনপথের দিকে চেয়ে থাকে। সুমিতা ঘরে ঢুকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। দরজা তেমনি ঈষৎ উন্মুক্ত থাকে। সে খিল দিতে আর ফিরে আসে না।

অতীন অনেকক্ষণ সেখানে সেইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস চেপে যায় সে। তারপর বাথরুমে ঢুকে মাথায় মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও তার ঘুম আসে না। একটি প্রশ্ন তার মনের মধ্যে কেবলি ঘুরপাক খেতে থাকে।—আচ্ছা, সুমিতা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো না কেন? এ' রকম তো সে কখনো করে না। শোয়ার পূর্বে প্রতি রাত্রেই সে দরজায় খিল দিয়ে শোয়। দরজায় খিল না দিয়ে সে কখনই শোয় না। তাহলে?—কেন সুমিতা দরজায় খিল দিল না? কেন? কেন?

অতীন ঘুমতে পারে না। কেবলি এ'পাশ ও'পাশ করে। নিস্তব্ধ ঘরে শুধু ঘড়ির টিকটিক শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ তার মনে হয় তৃষ্ণায় তার সমস্ত বুক শুকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার উঠে পড়ে। জানালার পাশে বালির কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল রয়েছে। অতীন ঢকঢক ক'রে এক গ্লাস জল খেয়ে ফেলে। তারপর আবার শোয়।

নাঃ, তৃষ্ণা তার যায়নি। এখনো যায়নি। এখনো তার আকণ্ঠ তৃষ্ণা। এখনো তার দারুণ তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে আছে।

অতীন পাশ বালিশটা জোর ক'রে আঁকড়ে ধ'রে তার উপর মুখ চেপে পড়ে থাকে।

সাত

একটি কালো মোটামত মেয়ে প্রায়ই সুমিতার কাছে আসে। দু'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। কোনো কোনো দিন তারা ব্যাডমিণ্টনও খেলে। এ'ব্যাপারে তারা কালাকাল বিচার করে না। ইচ্ছা হলেই মালীকে খেলার সরঞ্জাম দিতে বলে। দু'জনে যত খেলে তার চেয়ে হাসি-তামাশা করে বেশি। দুষ্টুমি ক'রে তার চেয়েও বেশি। কুড়ি পার হলেই যে মেয়েরা সত্যিই বুড়ি হয় না এটা এদের নিভৃত ক্রীড়া দেখলেই বোঝা যায়। মনে হয় দুই বন্ধুতে খুবই ভাব।

এ'বাড়ির অতিথি-বন্ধু যারা ড্রয়িংরুমেই তাদের আগমন ও স্থিতি। অতি অল্প কয়েকজনই অন্দরে প্রবেশ করে। সেই স্বল্প সংখ্যকদের মধ্যে এ' মেয়েটি একজন।

মেয়েটি নাকি ডাক্তারি পড়ে। সুমিতারই প্রায় সমবয়সী। সিঁড়িতে তার সঙ্গে অতীনের কয়েকদিন দেখা হয়েছে। কিন্তু কেউ আলাপ ক'রিয়ে না দেওয়ায় এবং অতীন একটু লাজুক প্রকৃতির হওয়ায় কোনো কথাবার্তা হয়নি।

সেদিন রবিবার। দুপুরবেলা অতীন হরেনের খোঁজে দোতলায় গিয়েছিল। কিন্তু হরেনকে না-দেখে এবং সতীকে ঘুমতে দেখে কী ভাবতে ভাবতে ফিরে আসছিল। এমন সময় তেতলায় ঠিক সিঁড়ির মাথায় মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সঙ্গে সুমিতা। অতীন যথারীতি পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল। কিন্তু সঙ্গে সুমিতা থাকার জন্যই হয়তো মেয়েটি নিজে থেকেই আজ তার সঙ্গে আলাপ করে। হাততুলে নমস্কার ক'রে হাসিমুখে সপ্রতিভভাবে বলে,—'আচ্ছা অতীনবাবু, আপনার বৌ কিছুতে আপনার সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দেয় না কেন বলুনতো?'

যথারীতি প্রতিনমস্কার জানিয়ে স্মিতমুখে অতীন বলে,—'আলাপে যোগ্য নয় ব'লে হয়তো।'

—'না, তা নয়। আসলে ওর ভয় আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'লে আমি হয়তো আপনাকে নিয়ে লুকিয়ে'—কথা শেষ না ক'রে হেসে ফেলে মেয়েটি। সুমিতার দিকে আড়চোখে চায়।

চাপা কণ্ঠে সুমিতা বলে,—'কী হচ্ছে লতু!'

লতিকা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে,—'তোর এত ভয়ই বা কেন শুনি!'

বিরক্ত হ'তে গিয়ে সুমিতাও হেসে ফেলে। বলে,—'ভয় আবার কিসের?—তুই যত পারিস আলাপ কর।' ব'লে তা'র ঘরে গিয়ে ঢোকে।

লতিকা হাসিমুখে অতীনের দিকে তাকায়। তারপর বলে,—'চলুন অতীনবাবু ঘরে ব'সে একটু গল্পগুজব করা যাক। যোষিৎ-সঙ্গে আপত্তি নেই তো?'

স্মিতমুখে অতীন বলে,—'না।' তারপর একটু ইতস্তত ক'রে লতিকাকে অনুসরণ ক'রে সুমিতার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

ঘরে সুমিতার সঙ্গে আরও একটি মেয়েকে দেখতে পায় অতীন। ষোলো-সতেরো বছর বয়স। শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা। একটু লাজুক প্রকৃতির মনে হয়।

লতিকা বলে,—'এটি আমার ছোটো বোন বীথি। আই-এ. পড়ে। সুন্দর কবিতা লেখে।'

বীথি আকণ্ঠ রাঙা হয়ে বলে,—'কী আজেবাজে কথা বলছো ছোড়দি।'

লতিকা ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলে,—'আজেবাজে কথা? কবিতা লিখিস না তুই?'

অতীন বলে,—'আপনার কবিতা একদিন শোনাতে হবে কিন্তু।'

বীথি কী যেন বলতে যায়। বাধা দিয়ে লতিকা বলে,—'ওকে 'আপনি' বলছেন? ও'তো বাড়িতে এখনও ফ্রক পরে।

কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বীথি বলে,—'আমি ফ্রক পরি?'—চোখে তার স্পষ্ট জল দেখা যায়।

সুমিতা বলে,—'আচ্ছা লতু, তুই কি কারোকে না-জালিয়ে থাকতে পারিস না? এই ছোটো মেয়েটাকে কাঁদিয়ে তোর লাভ?'

সুমিতার সহানুভূতিতে এবার বীথির সত্যিই চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

অতীন বিস্মিত হয়। এত সামান্য কারণে মেয়েদের চোখের জল পড়ে?

লতিকা কিন্তু আর এ'সব দিকে খেয়াল করে না। হঠাৎ খাটের নিচে ঢাকা-দেওয়া ক্যারামবোর্ডটার প্রতি দৃষ্টি পড়াতেই বোধ হয় ব'লে ওঠে,—'এসো ক্যারাম খেলি।'

সুমিতা বলে,—'যাঃ, বুড়ো বয়েসে ক্যারাম খেলবো কী!'

—'ও আমার বুড়ি ঠানদিরে।—ব'লে লতিকা কী একটা কথা সুমিতার কানে কানে বলে। সুমিতা আকণ্ঠ রাঙা হয়ে ওঠে।

লতিকা বলে,—'বলবো সবাইকে?'

তেমনি মুখ রাঙা ক'রেই সুমিতা বলে,—'বলবে আবার কী?—বেশ খেলতে চাও তো খ্যালো না।'

—'এই তো চারজন আছি।' বলে লতিকা ক্যারামবোর্ডটা টেনে বার ক'রে আনে।

বীথি বলে,—'আমি খেলবো না। কিছুতেই খেলবো না।'

লতিকা বলে,—'বেশ, সতী বৌদিকে ডেকে আনি।'

সতীর কথায় সুমিতা কেমন যেন একটু বিরক্ত হয়। বলে,—'সে খেটেখুটে একটু বিশ্রাম করছে। তাকে আবার ডাকা কেন?'

লতিকা বলে,—'তাহলে চারজন হয় কী ক'রে?'

সুমিতা তখন বীথির দিকে তাকায়। বলে,—'খ্যাল না বীথি।'

সঙ্গে সঙ্গে বীথি রাজী হয়ে যায়।—'বেশ, তুমি আর আমি শাস্থদি।'

লতিকা বলে,—'আসুন অতীনবাবু, আপনি আর আমি।'

অতীন বলে,—'সে কী, আমাকেও খেলতে হবে নাকি!—ক্যারাম আমি একেবারেই খেলতে পারি না।'

—'আপনি বসুন না। আপনাকে আমি জিতিয়ে দেবো।'

কী আর করে, অতীন বাধ্য হয়ে বসে।

দেখা যায় লতিকার খেলায় যেমন আগ্রহ, সে খেলেও তেমনি ভালো। সুমিতা ও বীথির খেলাও মন্দ নয়। দু'জনেই প্রায় সমান। কিন্তু অতীন একেবারেই আনাড়ি। অনেক সময় তা'র ঘুঁটি পকেটে যাওয়া দূরের কথা তা'তে লাগেই না। সুতরাং লতিকার ভালো খেলা সত্ত্বেও তাদেরই হার হ'তে থাকে।

নানা কথার মধ্য দিয়ে খেলা চলতে থাকে। মাঝে মাঝে অতীন এমন এক-একটা মার মারে যে তা' দেখলে হাস্য সংবরণ করা শক্ত। সুমিতা অনেকক্ষণ ধ'রে হাসি চাপতে চাপতে শেষপর্যন্ত হেসেই ফেলে, এবং একবার হেসে ফেলে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না। খিল খিল ক'রে হাসিতে একেবারে ভেঙে পড়ে।

অতীন এত কাছ হ'তে সুমিতাকে কখনো এমন ছোটো মেয়ের মত সরল হাসিতে ভেঙে পড়তে দেখেনি। ভারি ভালো লাগে তার। সে-ও অপ্রতিভ হাসি হাসে।

—'হাসছিস যে বড়!'—লতিকা সুমিতার প্রতি ভ্রূভঙ্গি করে।

হাসতে হাসতে সুমিতা বলে,—'তোমার পার্টনার-এর এক-একটা মার এতই চমৎকার যে'……সুমিতা কথা শেষ করতে পারে না। হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খায়।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে লতিকা বলে,—'আমার পার্টনার?—তোমার জীবনের পার্টনার,—আমায় ডোবাচ্ছেন।'

অতীন বলে,—'বেশ তো! আমি আগেই তো' বলেছিলাম আমি খেলতে পারি না। আপনি আমায় জোর করে বসিয়ে এখন রাগ করছেন!'

লতিকা বলে,—'আমি তখন ভেবেছিলাম আপনি হয়তো বিনয় করছেন। আপনি যে খাঁটি সত্যিকথা ছাড়া বলেন না তাকি আমি জানি!'

তার কথা বলার ভঙ্গিতে সকলেই হেসে ফেলে।

একটা গেম হারার পর অতীনরা আবার হারতে থাকে। তবু হাসি-তামাশার মধ্য দিয়ে খেলা পুরোদমে চলে।

একটা পকেটের জাল ছিঁড়ে গেছে। সেজন্য সুমিতাকে প্রতিবার বোর্ডের তলায় হাত চালিয়ে ঘুঁটি বার করতে হয়। একবার অসতর্কে অতীনের পায়ের ওপর তার হাত গিয়ে পড়ে। অতীন যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়। তার সমস্ত শরীর দিয়ে একটা তীব্র আনন্দের বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব'য়ে যায়।—শুধুমাত্র মুহূর্তের স্পর্শে এত আনন্দ!

দু'জনেই একটু থতমত খায়। পায়ে কারো অঙ্গ-স্পর্শ হলে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করতেই অতীন অভ্যস্ত। কিন্তু এ' ক্ষেত্রে কী করবে ভেবে পায় না। শেষে একটু অপ্রস্তুত ভাবে স্বগতোক্তি করে,—'আমার পা-টা এত লম্বা!'

ব্যাপারটা লতিকার দৃষ্টি এড়ায় না। তার সব দিকেই লক্ষ্য। সে

তাড়াতাড়ি অতীনের দিকে চেয়ে বলে,—'শান্থ বুঝি আপনার পায়ে ধরতে আরম্ভ করেছে?—তা'হলে ক্ষমাই করুন অতীনবাবু, ক্ষমাই করুন।'

সুস্মিতা কী বলার চেষ্টা করে। কিন্তু লতিকার কলহাস্যের মধ্যে তা' ডুবে যায়।

পরদিন বিকেল বেলা অতীন বাগানের পথ দিয়ে বা'র হয়ে যাচ্ছে, এমন সময় কে যেন দূর হ'তে তাকে ডাকে। অতীন চেয়ে দেখে ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট হ'তে লতিকা তাকে ডাকছে। লতিকার শুধু মুখটা দেখা যায়। কারণ ব্যাড্‌মিণ্টন কোর্টটা বুক পর্যন্ত উঁচু গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

অতীন ধীরে ধীরে কাছে যায়। দেখে সুস্মিতা আর লতিকা খেলছে।

লতিকা বলে,—'আপনি একটু দাঁড়িয়ে দেখুন অতীনবাবু আমাদের মধ্যে বাজি হয়েছে।'

লতিকা শাটল্‌টা হাতে নিয়ে জোরে সার্ভ করে। তার সার্ভিস দেখেই বোঝা যায় যে সে বেশ ভালো খেলে।

সুস্মিতা কোনোক্রমে রিটার্ন দেয়। সে দৌড়োদৌড়ি করে না। প্রায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই খেলে। বড়জোর সামনে একটু এগিয়ে বা পিছিয়ে মারে।

একটা ধানী রঙের শাড়ি তার পরনে। আঁটশাট ক'রে পরা। তা'তে তার পুষ্ট সুগঠিত দেহের সমস্ত রেখা পরিস্ফুট।

লতিকা শাটল্ নামিয়ে প্লেস্ করে। প্রায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার দরুণ সুস্মিতা তা মারতে পারে না।

লতিকা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে,—'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়! দৌড়চ্ছিস না কেন?'

সুমিতা কিছুই বলে না। শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করে।

অতীনের মনে হয় সুমিতা বোধ হয় তার সামনে দৌড়োদৌড়ি করতে সংকোচ বোধ করছে। সত্যিই তার সামনে ছুটোছুটি করতে সংকোচ বোধ করা সুমিতার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। যৌবন তার সমস্ত দেহে এক থালা জলের মতই টলমল করছে। একটু ছুটলেই তা' উপচে পড়বে মনে হয়।

অতীনও সংকোচ বোধ করে। সে বোঝে তার এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু তবু সে যেতে পারে না। তার লুব্ধ মন বোধ হয় একটু অসতর্ক মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে।

কিন্তু সুমিতা তেমনিই সংযত থাকে। খেলা জমে না। লতিকা হাসতে হাসতে বলে,—'আপনার বৌকে খেলতে বলুন অতীনবাবু। বৌ বুঝি আপনার সামনে লজ্জায় খেলতে পারছে না।'

রাগ ক'রে সুমিতা র‍্যাকেট্‌টা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে,—'খেলা নয়, শুধু ফাজলামি।'—তারপর দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে যায়।

অতীন মহা অপ্রস্তুত হয়। একটু অপমানিতও বোধ করে। ক্ষুব্ধ স্বরে লতিকাকে বলে,—'আপনি আমায় ডাকলেন কেন বলুন তো?'

লতিকা হাসতে হাসতে বলে,—'কেন, তাতে হয়েছে কী?—চলুন, ভেতরে চলুন। বৌ এর রাগ ভাঙাবেন।'

অতীন বিরসমুখে পূর্বের কথার জের টানে।—'সত্যিই আমাকে ডাকা আপনার ঠিক হয়নি। আপনাদের খেলার সময় আমার দাঁড়িয়ে থাকা কি ঠিক?—আমি একটা মহানির্বোধ তাই দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

হাসিমুখে লতিকা বলে,—'আহা আপনি অত রাগছেন কেন? কী যে বলি আপনাকে।—আপনার শেষের কথাটার সঙ্গে যদি আমি

একমত হই তাহলেও তো আপনি রাগ করবেন। কী করি বলুন তো!'—তার মুখে দুষ্টুমির হাসি খেলা করে।

ভদ্রতার খাতিরে অতীনও একটু হাসে। কিন্তু তার মনের মেঘ দূর হয় না।

হঠাৎ লতিকাও অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়ে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—'আচ্ছা, আপনি কী বলুন তো অতীনবাবু! এতদিন তো শান্তুকে দেখছেন কিছুই কি বোঝেন না?'

অতীন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে লতিকার মুখের দিকে তাকায়।

লতিকা বলে,—'চলুন ভেতরে চলুন।'

অতীন বলে,—'আপনি যান। আমি বাইরে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম।'

বাইরে এসে অতীনের আর পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার ইচ্ছে হয় না। মনটাই বিশ্রী হয়ে গেছে। সে এমনি অনির্দিষ্টভাবে হাঁটে। তার সমস্ত অন্তর ছিছি করতে থাকে।—সে লোভীর মত খেলার কাছে দাঁড়িয়েছিল। সুমিতা তা' বেশ বুঝতে পেরেছে। অতীনের মত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি তা'কে ও' অবস্থায় দেখে এটা তার ইচ্ছে নয়। তাই সে বিরক্ত হয়ে রাগ দেখিয়ে চলে গেলো।—ছিছি!

সমস্ত অন্তর তার গ্লানিতে ভরে ওঠে।

অতীন হাঁটতে হাঁটতে তাদের ক্লাসের অঞ্জলিদির বাড়ির কাছে এসে পড়ে। ভাবে,—যাই একবার অঞ্জলিদির বাড়ি। তাঁদের বাড়ি তো এই লেক্ রোডেই। অতীন অনেকবার এসেছে এখানে। অঞ্জলিদির কাছে এলে অতীনের বেশ ভালো লাগে। মাঝে মাঝে তাই সে আসে এখানে। অঞ্জলিদির মনটা মায়ের মত স্নেহপ্রবণ। অবশ্য তাঁর বয়সও

হয়েছে প্রায় চল্লিশের মত। তাঁর বড় মেয়ের বয়সই বোধ হয় উনিশ কুড়ি।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পরই অঞ্জলিদির বিয়ে হয় প্রফেসর বিজন রায়ের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের পরও তিনি পড়াশোনা একেবারে ছাড়েন না। কিছুটা স্বামীর উৎসাহে, কিছুটা নিজের আগ্রহে দু'এক বছর বাদ দিয়ে একে একে বি-এ পর্যন্ত পাস করেন। তারপর অবশ্য পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন অনেকদিন। সংসার আর ছেলেপুলে মানুষ করতেই সময় গেছে। এখন ছেলেমেয়েরা সব বড় হয়েছে। এখন আবার খেয়াল হয়েছে এম-এ পড়ার। ভর্তি হয়ে একেবারে নিয়মিত ক্লাস শুরু ক'রে দিয়েছেন।

অতীনকে দেখে অঞ্জলিদি খুব খুশি হন। বলেন,—'এসো ভাই এসো। কী খবর? তুমি তো এদিকে মোটেই আসো না আজকাল।'—তিনি অতীনকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যান।

অঞ্জলিদির পিছন পিছন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অতীন বলে,—'সকলে এসে প্রতিদিন এত বিরক্ত করে আপনাকে, তাই আমি আর ঘন ঘন আসি না।'

বেতের চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে অঞ্জলিদি বলেন,—'ভাই এলে দিদি কখনো বিরক্ত হয়? আচ্ছা বুদ্ধি তো তোমার!'

অতীন জানে অঞ্জলিদি যা' বলছেন, তা' সত্যি। প্রকৃতই, ক্লাশের ছাত্রছাত্রীরা এই যে প্রায়ই তাঁর কাছে এসে এটা খাওয়ান, ওটা খাওয়ান ব'লে আবদার ধ'রে, নানারকম প্রীতির অত্যাচার করে, এতে তিনি একটুও বিরক্ত হন না। বরঞ্চ খুশীই হন। তাই সে উত্তরে কিছুই বলে না। শুধু সলজ্জে একটু হাসে। প্রসন্ন স্মিতমুখে অঞ্জলিদির দিকে তাকায়। তার বেশ লাগে। এতক্ষণে তার মনের গ্লানি কিছুটা

যেন কেটে গেছে মনে হয়। মনে মনে ভাবে অঞ্জলিদির কাছে এসে ভালোই করেছে সে।

অঞ্জলিদি বলেন,—'আজ কলেজ থেকে আসার সময় কলেজ-ম্যাগাজিনটা পেলাম। তোমার একটা কবিতা দেখলাম। সুন্দর হয়েছে তো। তখনই তোমাকে বলবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমাকে আর খুঁজে পেলাম না। রবীনকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বল্লে,—'অতীনবাবু? তার খোঁজ কে দেবে? সে কি কারো সঙ্গে মেশে? ক্লাস আর লাইব্রেরী, লাইব্রেরী আর ক্লাস। এ'ছাড়া আর কিছু সে জানে কি?'

অতীন বলে,—'রবীনবাবুর কথাই ও'রকম। ওর ধারণা আমি দিবারাত্র শুধু পড়ি।

অঞ্জলিদি বলেন,—'পড়াশোনা করা কি খারাপ? অনেক পড়াশোনা করেছো বলেই তো এমন লিখতে পারো।

অতীন লজ্জিত হ'য়ে বলে,—'কী যে বলেন। আমার কবিতা একেবারে সহজ-সরল। ওর মধ্যে পাণ্ডিত্য কোথায় পেলেন?'

অঞ্জলিদি বলেন,—ছাখো অতীন বিদ্যেটা যখন হজম হয়ে যায় তখন ও'রকমই হয়। তখন তা আর বিরাট স্থূলোদর দেখিয়ে মানুষকে বিস্মিত বা দৃষ্টিকে পীড়িত করে না। তখন তা' স্বাস্থ্য ও শ্রী হয়ে মানুষের আচারে-ব্যবহারে কথায় লেখায় প্রকাশ পায়।—সহজ সরল লেখা কি সহজ? ও'গুণ আয়ত্ত করতে শুধু যে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় তাই নয়,—[illegible] ও প্রয়োজন। এ' সাধারণত অল্প বয়সে হয় না। অল্প বয়সে লেখকদের প্রায়ই উৎকট মৌলিকতার দিকে ঝোঁক থাকে। শক্তি থাকুক আর না-থাকুক নতুন শিং-ওঠা অহঙ্কার কেবলি [illegible]লিকতা [illegible] স্বকীয়তার নামে অদ্ভুত জটিল একটা কিছু ক'রে অপরের

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। সব সময়ই নিজেকে অপরের থেকে পৃথক ও বিশিষ্ট প্রমাণিত করতে চায়। কিছু যদি না-পারে তো বানানগুলো নতুন করে লেখে। আর এর ফলে সাহিত্যের যা মূল উদ্দেশ্য সেই রসসৃষ্টিই হয়তো বাদ পড়ে যায়। কিন্তু আমি দেখলাম তুমি তা করোনি। তোমার কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। অবশ্য রসসৃষ্টির একটা নতুন পথ তৈরী করতে পারাটা খুবই বড় কথা, খুবই ভালো কথা। কিন্তু ক'জনের সে শক্তি থাকে ?'

অতীন বাধা দিয়ে বলে,—'যাক গে যাক। ও'সব শুনে কীই বা হবে! কেই বা পড়ে কবিতা। আপনি পড়েন নাকি কবিতা ?'

অঞ্জলিদি রাগের ভান ক'রে বলেন,—'তুমি কি মনে করো আমরা কবিতা বুঝি না ?'

অতীন হেসে বলে,—'আমি কি সে-কথা বলেছি ?—আমি বলেছি কবিতা পড়েন কিনা। আমার তো মনে হয় ও'সব আজকাল আর কেউ পড়ে না। যাঁরা নিজেরা কবিতা লেখেন তাঁরা শুধু একনজর দেখেন লেখার টেকনিকটা কেমন, কীরকম শব্দ ও ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে, নতুন কিছু আছে কিনা। ব্যাস, তারপর পাতা উল্টিয়ে চলে যান। কবিতার রসাস্বাদনের চেষ্টা আর করেন না।

অঞ্জলিদি বলেন,—'এটা তোমার ভুল ধারণা অতীন। খুব সম্ভব তুমি নিজেও এটা বিশ্বাস করো না। এমনিই বলছো।—কবিতা ভালোবাসেন, কবিতা মন দিয়ে পড়েন এবং শক্তিমান কবিকে মনে মনে শ্রদ্ধা করেন এমন অনেক লোক আছেন। শুধু আমাদের মত সাধারণ লোক নয়, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও আছেন।—তোমাদের প্রফেসর রায়-ই সেই দলের। এমনিতে তো সারাদিন মোটা মোটা গুরুগম্ভীর দর্শনের বই নিয়ে থাকেন। ও'ছাড়া আর কিছু চান না।

কিন্তু ভালো কবিতার বই পেলে ও'সবও ভুলে যান। নিজে তো বারবার পড়েনই,—আবার আমাকে, ছেলেমেয়েদের পড়ে শোনান।'

অতীন এবার দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলে। সসংকোচে বলে,—'প্রফেসর রায় ও' কবিতাটা পড়েছেন নাকি ?'

অঞ্জলিদি মুচকি হাসেন। পরিহাসতরল কণ্ঠে বলেন,—'তবে যে বললে যাকগে, ও'সব শুনে কী হবে। ও,—আমাদের অ্যাপ্রি[illegible]টা কিছু নয়,—না ?—তারপর একটু থেমে স্বাভাবিক গলায় বলেন,—উনি এখনো আসেননি। ফিরতে একটু দেরি হবে বলে গেছেন। এলে দেখাবো কবিতাটা।'

অতীন বাধা দিয়ে বলে,—'না না, ও আর দেখাতে হবে না।'—ও' বাজে লেখা।'

অঞ্জলিদি স্মিতমুখে বলেন,—'আচ্ছা, সে আমি বুঝবো।'

কথা বলতে বলতে রাত্রি হয়ে যায়। অঞ্জলিদির ছোটো ছেলে হাবুল এসে ঘরে ঢোকে। বছর বারো-তেরো বয়েস হাবুলের। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সবল চেহারা। সে বাইরে থেকে খেলাধূলা ক'রে ফিরছে। কালো হাফ প্যান্ট পরা। তার ওপর শাদা হাফ শার্ট।

তাকে দেখে অঞ্জলিদি বলেন,—'স্তাখো হাবুল কে এসেছেন।'

হাবুল তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। বলে,—'ও, অতীনদা, কখন এলেন ?'

অতীন বলে,—এই তো কিছুক্ষণ হলো।'—তারপর হাবুলের দিকে ভালো ভাবে চেয়ে সহাস্তে আবার বলে,—'আচ্ছা হাবুল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমার মাকে আমি বলি দিদি। তুমি আবার আমায় বলো দাদা। তাহলে সম্বন্ধটা কেমন হলো ?'

হাবুল একটু অপ্রস্তুত হয়। বলে,—তাই তো কী রকম হলো !'

—তাকে সত্যিই কিছুটা চিন্তিত মনে হয়। সে অপ্রতিভভাবে অতীনের মুখের দিকে তাকায়।

অতীন শুধু মুচকি মুচকি হাসে।

অঞ্জলিদিও ছেলের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে হাসতে থাকেন। —'বোকা ভূত কোথাকার। তোমার আর সম্বন্ধ স্থির করতে হবে না।'—তারপর অতীনকে লক্ষ্য ক'রে বলেন,—'ও তো ঠিকই বলেছে। তুমি তো ওর দাদার মতই।'

অতীন কিছু বলে না। শুধু হাসি মুখে চেয়ে থাকে।

হাবুল সঙ্গে সঙ্গে এ'সব কথা গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেয়। সোৎসাহে বলে,—'জানো মা, আই অ্যাম ভেরি হাঙ্গরি।'

ব'লেই সে স্বগতোক্তি করে,—'ইস্, এপিটাইট কথাটা ব্যবহার করতে পারলাম না।—আচ্ছা অতীনদা, আই অ্যাম ফিলিং এপিটাইট —কথাটা কি ঠিক? কোনো গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে?'

অতীন স্মিতমুখে বলে,—'আমি কী ক'রে বলবো? আমি কি ভালো ইংরেজি জানি? তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো।'

অঞ্জলিদি ছেলের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলেন,—'মাকে আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। ঠিক হয়েছে। তুমি এখন হাতমুখ ধোও তো গিয়ে। তোমার এপিটাইটের ব্যবস্থা আমি করছি।'

তিনি অতীনকে একটু বসতে ব'লে হাসতে হাসতে বার হয়ে যান।

রাত্রে অতীনকে ভালোভাবে না-খাইয়ে অঞ্জলিদি ছাড়েন না। বেশ একটু রাত ক'রে সম্পূর্ণ হালকা মন নিয়ে অতীন বাড়ি ফেরে। বিকেলের ঘটনায় তার মনে যে-গ্লানি সঞ্চিত হয়েছিল তার আর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। এক একজন এমন মানুষ আছেন যাঁদের কাছে এলে মনে আর কোনো অশান্তি থাকতে পারে না। অন্তত সাময়িকভাবে সব দূর হয়ে মন প্রসন্নতায় ঝলমল ক'রে ওঠে।

আট

দুপুর বেলা সুমিতা নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। খোলা চুল মাথার দিকে এলানো। এখনো একটু একটু ভিজে আছে।

ঝি সারদা এসে বলে,—'দিদি, দাদাবাবুর নামে টাকা এসেছে।'

সুমিতা বলে,—'আমার কাছে কেন? পিওনকে বলো তিনি বাড়ি নেই। কাল এসে যেন দিয়ে যায়।' তারপর কী ভেবে নিজেই তরতর ক'রে নেমে যায়। কৌতূহলী হ'য়ে মানি-অর্ডারের ফরমটা দেখে। দেখে সামান্যই টাকা। কিন্তু এসেছে একটা পত্রিকার অফিস হতে। অতীনের একটি কবিতার পারিশ্রমিক হিসেবে টাকাটা পাঠানো হয়েছে।

সুমিতা অত্যন্ত বিস্মিত হয়। অতীন কবিতা লেখে! শুধু তাই নয়। সে কবিতা ভালো কাগজে ছাপাও হয় এবং তার জন্য পারিশ্রমিকও আসে।—কৈ, সে তো কিছুই জানে না। তাকে তো অতীন কোনো দিন এ'কথা বলেনি। সে কি কেউ নয়?

সুমিতা সামনের পাম গাছটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চোখ দুটো অকারণে জ্বালা করে। বুকভরা অভিমানের মেঘ ধারাবর্ষণে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তার মনে থাকে না যে অতীনের পক্ষে তাকে কোনো কিছুই জানানো সম্ভব নয়। অতীনের সঙ্গে শুধু যে সে ভালোভাবে মেশেনি তাই নয়, অতীনকে সে কোনোদিন কাছেই আসতে দেয়নি। অধিকাংশ সময়ই অতীনের প্রতি তার ব্যবহারও যে রূঢ়, অভদ্র ও সৌজন্যবর্জিত সে-কথাও তার মনে থাকে না। তার শুধু মনে হয় অতীন তাকে নিশ্চয় বড়লোকের বিলাসী অপদার্থ মেয়ে বলে মনে করে,—[illegible]চি মানুষ বলেই জ্ঞান করে না। আর তার

গতজীবনের কলঙ্কের জন্ম অতীন তাকে তো ঘৃণা করেই। নিশ্চয় করে। আর সেই জন্যই সে তাকে অবিরত এড়িয়ে চলতে চায়।—কিন্তু সে কি সত্যিই খুব খারাপ? খুব খারাপ?

সামনের মোটা পামগাছটা কেমন ঝাপসা মনে হয় স্মিতার। ক্রমশ সব কিছু আরো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজেকে সে সংবরণ করতে চেষ্টা করে। সসংকোচে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে। কেউ নেই। পিওন কখন চলে গেছে।

আস্তে আস্তে সে উপরে চলে আসে। বাথরুমে ঢুকে চোখ-মুখ ভালো ক'রে ধুয়ে ফেলে। তারপর চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকে।

নিস্তব্ধ দুপুরে বাড়ির পিছনের রাস্তা দিয়ে শিল-কোটাবে-ওয়ালা' চীৎকার ক'রে যায়। কে একটা ছেলে দূর থেকে তার দাদাকে বারবার চেঁচিয়ে ডাকে। জানালার কপাটের ওপর বসে একটা কাক মাঝে মাঝে বিশ্রীভাবে কা কা করে। স্মিতার কানে এ'সব কিছু যেন প্রবেশ করে না। সে নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকে।

অতীনের আচার-ব্যবহার দেখে অবশ্য প্রথম থেকেই তাকে তার কিছুটা শিল্পীমনা মনে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সে যে একজন কবি, ভালো কবিতা লেখে সে-কথা সে কল্পনাও করেনি। ভালো কবিতা অতীন নিশ্চয়ই লেখে। নাহলে প্রথমশ্রেণীর কাগজে তা' ছাপা হবে কেন।—এতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে বেশ ভালো লেখে।—আশ্চর্য! অতীন সত্যিই একজন কবি!—স্মিতা বারবার কথাটা মনের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উচ্চারণ করে।

কবিতা অবশ্য স্মিতা নিজেও এক সময় কিছু কিছু লিখেছে। যেমন অল্পবয়সে অনেকেই একটু-আধটু লেখে। খাতার পাতাতেই তা' চিরদিন আবদ্ধ থেকেছে। কোনোদিন প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত

হওয়ার মত নয়ও। তা সে বোঝে। তাই আজকাল আর লেখার দুশ্চেষ্টা করে না।—কিন্তু কবিতা লিখতে না-পারলেও কবিতা সে সত্যিই ভালোবাসে। কবিতা পেলেই পড়ে এবং ভালো লাগলে বারবার পড়ে।

অথচ অতীনের একটি কবিতাও সে এখনো পড়েনি। পাশের ঘরে থেকেও সে জানে না সে-কথা। তাকে জানাতে অতীনের ইচ্ছে হয়নি। হবেই বা কেন? সে তো আর কেউ নয়। মানুষ তার জীবনের আনন্দের কথা আপনজনকে জানানোর জন্য ব্যাকুল হয়। না-জানিয়ে পারে না। আপন মনে করলে সুমিতাকেও সে এ'কথা জানাতো। কিন্তু সুমিতাকে তো সে কোনোদিন আপন মনে করেনি! সুতরাং তাকে তা' জানাবে কেন?

অভিমানাহত ক্ষুব্ধ হৃদয় নিয়ে সুমিতা অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকে। তারপর মন কিছুটা শান্ত হলে সে আবার উঠে পড়ে। কবিতাটা পড়ার লোভ সে দমন করতে পারে না। শুধু কবিতার আকর্ষণ নয়, কৌতূহলও উদগ্র হয়ে ওঠে।

সন্তর্পনে সে অতীনের ঘরে এসে ঢোকে। কিন্তু পত্রিকাটি সে খুঁজে পায় না। ঘর তেমনি অপরিষ্কার ও অগোছালো। একটুক্ষণ সে ঘরের সব কিছু চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর বাইরে এসে একটা স্লিপ দিয়ে চাকরকে পাঠিয়ে দেয় স্টল থেকে পত্রিকাটি আনবার জন্য।

ইত্যবসরে সে দ্রুত হাতে ঘরটা পরিষ্কার ক'রে ফেলে। বার হয়ে আসার সময় দেখে এক জোড়া জুতো অত্যন্ত নোংরা হয়ে আছে। জুতো জোড়াও পরিষ্কার ক'রে রাখার তার খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু সেদিনের মত যদি ধরা পড়ে যায়? একটু ইতস্তত করে। তারপর জুতো জোড়া হাতে নিয়ে সে নিজের ঘরে চলে আসে। ধীরেসুস্থে

পরিষ্কার করে। কালি নিতে আবার তা'কে অতীনের ঘরে আসতে হয়। কিন্তু কালি নেই। কালির কৌটো খালি। আচ্ছা মানুষ যা'হোক!

শেষপর্যন্ত নিজের জুতোর ক্রিম লাগিয়ে সে জুতোটা চকচকে ক'রে তোলে।

তারপর হাত ধুয়ে পত্রিকার প্রতীক্ষায় সামনের বারান্দায় পায়চারি করতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর চাকর পত্রিকাটি এনে দেয়। এখানে নাকি কোনো স্টল এ'সময়ে খোলা নেই। তাই এই দেরি।

সাগ্রহে সুমিতা পত্রিকাটি খুলে দেখে। এই তো কয়েক পৃষ্ঠা পরেই ছাপা হয়েছে। প্রথমে বড় বড় হরফে কবিতার নাম,—স্বগত। তার নিচে অতীনের পুরো নাম। আরও একজনের কবিতা ছাপা হয়েছে সেই পাতায়। সুমিতা অতীনের কবিতাটা গুণগুণ ক'রে পড়ে।

বিশ্লেষণ যদি করো হয়তো কিছুই নয়। ধ'রে
কেটে কেটে দেখলেই দেখা হয় এ'ধারণা ভুল।
এই যে শীতের প্রাতে একটি শিশির-ভেজা ফুল
সাগর-ফেনার মত সাদা শাড়ি এলোমেলো প'রে
ছু'চোখে উদার এই আকাশের ঘন নীল ভ'রে
সকালে স্নানের শেষে ঈষৎ সোনালী তা'র চুল
হাওয়ার শ্যামল হাতে ঝাড়ে,—তা'র অমল দুকুল
সরিয়ে কী পাবে তুমি—আর তা'কে কুটিকুটি ক'রে?

কিছু না কিছু না—শোনো। এই কেটেকেটে দেখা রাখো।

সবই কি রয়েছে শুধু মাংস আর মেদে ? তারপরে
কিছু নেই ? কিছু নয় এই উষ্ণ হৃদয়ের হেম !

বিশ্লেষণ যদি করো হয়তো কিছুই পাবে নাকো।
তবু ছাখো কী বিস্ময় বেদনার নীল সরোবরে
আরক্ত পদ্মের মত এই রক্ত অশ্রু ভেজা প্রেম !

সুমিতা শেষ তিন লাইন আবার পড়ে। পড়া শেষ হলে কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবে। তারপর মিষ্টি সুরেলা গলায় আবার গুণগুণ ক'রে পড়তে শুরু ক'রে দেয়।

অনেকদিন পর সুমিতা সযত্নে চুল বাঁধে। বিকেল হওয়ার আগেই গা ধুয়ে নেয়। তারপর কী শাড়ি পরবে চিন্তা করে। সে লক্ষ্য করেছে ঘন নীল রঙের যে-কোনো শাড়ি পরলেই অতীন তার দিকে বারবার চেয়ে চেয়ে দেখে। নীল শাড়িতে কি তাকে বেশি ভালো দেখায় ? কে জানে !

সুমিতা অনেক বেছে একটা ভালো নীলাম্বরি শাড়িই বার করে পরিপাটি করে পরে। কিন্তু কী চিন্তা করে শেষপর্যন্ত শাড়িটা সে আবার খুলে ফেলে। একটা সাধারণ সাদা তাঁতের শাড়িই শুধু পরে।

মানি-অর্ডারের খবরটা সুমিতাই প্রথম অতীনকে দেয়।

বিকেলবেলা কলেজ থেকে ফিরে চা খাচ্ছে, এমন সময় সুমিতা এসে ঘরে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু সৌরভে ঘরের বাতাস মনোরম হয়ে ওঠে। অতীন মুখ তুলে চায়। এ'গন্ধ তার চেনা।

কিছুক্ষণ পূর্বে সুমিতা গা ধুয়ে এসেছে। সমস্ত শরীর তার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। মুখ করুণ বিষণ্ণ। তখনো সেখানে একটা চাপা অভিমানের ছায়া। প্রসাধন সে তেমন কিছুই করেনি। শুধু পরিপাটি ক'রে খোঁপাটি বাঁধা আর কপালে একটি সুন্দর সিঁদুরের টিপ। এতেই তাকে অপূর্ব দেখায়!

অতীন কিছুটা বিস্মিত হয়। বিশেষ প্রয়োজন না হলে তো সুমিতা কখনো তার ঘরে ঢোকেনা। উৎসুক দৃষ্টিতে সে সুমিতার মুখের দিকে তাকায়।

বিনা ভূমিকায় সুমিতা বলে,—'আপনার একটা মানি-অর্ডার এসেছিল।'

—'মানি-অর্ডার!'

—'হ্যাঁ, "অরণ্য" অফিস হতে। আপনার কবিতার জন্য পাঠিয়েছে।'

অতীন একেবারে অবাক হ'য়ে যায়। মাস তিনেক পূর্বে কবিতাটা যখন সে পাঠায় তখন সে তেমন আশাই করেনি কবিতাটা সত্যিই ছাপা হবে। প্রকাশ হওয়াতেই সে যথেষ্ট বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিল। তারপর এই টাকা। তার বিশ্বাসই হতে চায় না সত্যিই মানি-অর্ডার এসেছিল। তার মত নতুন ও অখ্যাত কবিদেরও বাংলা পত্রিকা না চাইতে টাকা দেয়!

—'কাল পিওন আসার সময় আপনি কি থাকবেন?'

—'হ্যাঁ থাকবো।'

সুমিতা আর কী বলবে ভেবে পায়না।

শুকনো ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নেয়। একবার তার ইচ্ছে হয় জিজ্ঞাসা ক'রে অতীন যে এমন কবিতা লেখে—কৈ সে-কথাতো

সুমিতাকে কখনো জানায়নি। কিন্তু জানতে চাওয়ার অধিকারই কি তার আছে? না, কোনো অধিকারই নেই।

তাই আর কিছু না বলে মাথা নিচু করে সে ঘর হতে বার হয়ে আসে।

কথাটা মহামায়া এবং অরবিন্দের কানেও যায়। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অরবিন্দের ঘরে অতীনের ডাক পড়ে।

ঘরে ঢুকতেই অরবিন্দ বলেন,—'এসো, বোসো অতীন। তুমি দেখছি ট্যালেণ্টেড্ পারসন।'

অতীন লজ্জিত হয়,—আনন্দিতও হয়। বুঝতে পারে কবিতাটা সকলেই পড়েছেন।

মহামায়া বলেন,—'সত্যিই কী সুন্দর কবিতা তুমি লিখেছো বাবা!'

হাসিমুখে অতীন বলে,—'আপনার কাছে তো আমার সব কিছুই ভালো।'

—'তা', আমার ছেলে কী যা তা?'—মহামায়া অতীনের অবিন্যস্ত চুলগুলি হাত দিয়ে ঠিক ক'রে দিতে থাকেন। তাঁর কথায়, তাঁর স্পর্শে, তাঁর মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ যেন ঝ'রে পড়তে থাকে। একটু সংকোচবোধ করলেও অতীন লোভীর মত তা' ভোগ করে।

তেমনি ভাবেই তার গায়ে হাত রেখে মহামায়া বলেন,—'তবে ছেলের কি আমার সবই ভালো? এই যে তুমি কিছুতে দুধ খেতে চাও না, আমার সব কথা শোনো না,—এ জন্য তোমাকে ভালো বলবো নাকি? খুব দুষ্টু বলবো।'

অতীনও তেমনি হাসি মুখে বলে,—'তা বলুন। এত ভালো হ'তে কারো ভালো লাগে নাকি?'

অরবিন্দ বলেন,—'তুমি এত সুন্দর কবিতা লেখো, তুমি ডিটেকটিভ

নভেল লেখোনা কেন? আমাদের সময়ে পাঁচকড়ি দের নভেল আর শার্লক হোমস্ খুব চলতো।'

অতীন বলে,—'কোনান ডয়েল-এর অবশ্য প্রতিভা ছিল। কিন্তু পাঁচকড়ি দে—' অতীন কথাটা শেষ করে না। একটু থেমে বলে,—ও সব আমি পারি না। সবার কি সব ক্ষমতা থাকে?'

অরবিন্দ বলেন,—'না না, তুমি অনায়াসেই পারো। তবে এখন পড়াশোনার সময় ও' সব না-করাই ভালো। হ্যাঁ গা, তুমি কী বলো?'—তিনি মহামায়ার দিকে তাকান।

ক্ষুব্ধ স্বরে মহামায়া বলেন,—'তোমার কি এতটুকু সাহিত্য-বোধ নেই? বি-এ-টা তো এক সময় পাশ করেছিলে তখনো কি কিছুই সাহিত্য পড়োনি?—ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখবে কী,—অ্যাঁ!'

অরবিন্দ ঠিক বোঝেন না ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখার যোগ্য নয় কেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এ'সব বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাই একটু অপ্রতিভ ভাবে বলেন,—'হ্যাঁ, ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখবে কেন,—সত্যিই তো।'

ব্যাপারটা অতীন খুবই উপভোগ করে।'

মহামায়া বলেন,—'তুমি কবিতার বই বার করো অতীন।'

অতীন বলে,—'আমার কবিতার বই প্রকাশ করবে কে?'

'আমি করবো। তুমি লিখে দাও।'

অতীন বলে,—'ডাহা লোকসান যাবে মা। একে কবিতার বই,—তায় আমার লেখা। ও' বই শুধু পোকায় কাটবে।'

মহামায়া বলেন,—'আচ্ছা সে আমি বুঝবো।'

অতীন বলে,—'দেখি, আর কিছুদিন যাক।'

সে খুবই উৎসাহিত বোধ করে।

উৎসাহিত হ'য়েই পরদিন বিকেলে সে আর একটা কবিতা নিয়ে 'অরণ্য'—অফিসে গিয়ে হাজির হয়। জিজ্ঞাসা ক'রে,—'ধীরেনবাবু আছেন ?'—সে দেখেছে পত্রিকার ওপর সম্পাদকের নাম লেখা থাকে ধীরেন্দ্র নাথ রায়।

—'ধীরেনবাবু এখুনি আসবেন। আপনি একটু বসুন।' ব'লে একজন তাকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। ধীরেনবাবু বলায় তা'কে সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় ভুল করে সে।

অতীন ঘরে ঢুকে দেখে পঁয়তিরিশ-ছত্তিরিশ বছরের একজন ভদ্রলোক বসে বসে একটা বাঁধানো বিচিত্রা পড়ছেন। অতীনের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি আবার পড়ায় মন দেন। অতীন কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একটি চেয়ারে বসে পড়ে। এমন সময় আরও একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢোকেন। ভদ্রলোকের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশের মত হবে। বেঁটে, কালো আর রোগা। মাথার সামনের দিকটা টাক পড়ে গেছে। মুখের মধ্যে সবার আগে নজরে পড়ে পুরু ঠোঁট আর অত্যন্ত লম্বা নাক।

অতীন ভাবে ইনিই হয়তো ধীরেন রায়। কিন্তু ভদ্রলোকের কথায় সঙ্গে সঙ্গে সে-সন্দেহ দূর হয়। তিনি ভিতরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করেন,—'যতীশ, ধীরেন কোথায় ?'

বিচিত্রা পাঠরত ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বই বন্ধ ক'রে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে বলেন,—'বসুন বসুন দিনেশবাবু। ধীরেনদা একটু বাইরে গেছেন, এখুনি আসবেন।'

ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করেন।

এঁদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে অতীন অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারে যে আগন্তুক ভদ্রলোক আর কেউ নয় বিখ্যাত সাহিত্যিক দিনেশ রায়।

অতীন প্রায় হাঁ করে চেয়ে থাকে।

দিনেশ রায় কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেন না। একটা ফিলম্ কোম্পানির আভ্যন্তরীন ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকেন। কথা বলতে বলতে এক সময় বলেন,—'যতীশ, হিতেন আবার একটা নতুন মেয়ে জোগাড় করেছে দেখেছো? চমৎকার মেয়ে। কোথা থেকে জোগাড় করেছে কে জানে!—হিতেন ছবি যা করে তা'তো থার্ড ক্লাস। কিন্তু মেয়ে জোগাড় করার ব্যাপারে একটি জিনিয়াস।'

তারপর কথাপ্রসঙ্গে এক সময় একজন বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী সম্বন্ধে মন্তব্য করেন,—ওমুক? ও'কে এখন শুধু তাড়কা রাক্ষসীর পার্টেই মানায়।

অতীন মন দিয়ে সব কথা শোনে। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়। এই কি তার বহুদিনের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার পাত্র দিনেশ রায়!

ইতি মধ্যে ধীরেন রায় ফিরে আসেন। তাঁকে দেখেই দিনেশ বলে ওঠেন,—'এই যে ধীরেন, তোমার জন্য আমি অনেকক্ষণ বসে আছি। একটা রোমান্টিক উপন্যাস শুরু করেছি। সামনের সংখ্যা থেকেই ছাপতে পারো। তবে আজ আমাকে শ'খানেক টাকা দিতে হবে।'

ধীরেন চেয়ারে বসে বলেন,—'বেশ, টাকা পাবে। কিন্তু উপন্যাসের প্রত্যেকটা ইনস্টলমেণ্ট আমার ঠিক সময়ে চাই। তুমি যা' ভোগাও লেখা দিতে।'—তারপর অতীনের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন,—'আপনি?'

অতীন উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—'আমি একটা লেখা দিতে এসেছি।'

—'লেখা ?'—সম্পাদক বোধ হয় বিস্মিত হন। লেখা দেওয়ার জন্য বসে আছে লোকটা! বলেন,—'রেখে যান এখানে।'

ভাঁজ করা কাগজটা অতীন তাঁর হাতে দেওয়া মাত্র তিনি তা' পেপার-ওয়েটএর নিচে রেখে দেন।

অতীন তবুও দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিনি আবার জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে তাকান।

একটু ইতস্তত ক'রে অতীন বলে,—'আপনাদের পত্রিকায় সম্প্রতি আমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছে। কবিতাটা কেমন হয়েছে জানতে পারলে আমার উপকার হতো।'

সম্পাদক এবার অতীনের আপাদমস্তক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করেন। তারপর বলেন,—'আমি তো কবিতা ভালো বুঝি না। আচ্ছা—' ব'লে তিনি বেয়ারাকে ডেকে বলেন,—'এঁকে বিমলবাবুর কাছে নিয়ে যাও তো।'

অতঃপর বিমলবাবু নামে যে-ভদ্রলোকের কাছে বেয়ারা নিয়ে যায় তাঁর বয়স বছর চল্লিশের মত। বেঁটে গোলগাল চেহারা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। অতীন ভাবে ইনিই কি মেঘ-মানসের কবি বিমল চক্রবর্তী ?

অতীনের কথা শুনে বিমল গম্ভীরভাবে বলেন,—'বসুন।'—তারপর জিজ্ঞাসা করেন,—'আপনার নাম ?'

অতীন তার পুরো নাম বলে। বিমল পত্রিকাটি খুলে অতীনের কবিতাটি বার ক'রে মনে মনে দ্রুত পড়তে শুরু করেন। মনে হয় ইতিপূর্বে তিনি আর কবিতাটি পড়েননি। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি কবিতাটি পড়া শেষ ক'রে ফেলেন। তারপর সম্পূর্ণ আবেগশূন্য গলায় বলেন,—'বেশ হয়েছে।—তবে এখনও আপনার

মনের সব কথা গুছিয়ে বলার শক্তি আসেনি। আঙ্গিকও যথেষ্ট দুর্বল। ও'বিষয়ে আপনাকে এখনও অনেক পড়াশোনা করতে হবে। অবশ্য এই বয়েসেই আপনার লেখায় বেশ সংযম এসেছে। কোনো সস্তা চটক নেই। নিষ্ঠা আছে আপনার। লেখার চর্চা ছাড়বেন না আপনি।'

অতীন মন দিয়ে সব শোনে।

বিমল ক্ষণকাল অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর মাথা নিচু ক'রে কী যেন লিখতে শুরু ক'রে দেন।

অতীন কী করবে ভেবে পায় না। শুধুমাত্র এই শুনতেই কী সে এসেছিল? সে বিশেষ প্রশংসা ও সংবর্ধনার আশা করে এসেছিল। অন্তত পত্রিকার সকলের সঙ্গে যে বেশ আলাপ হবে এ'সম্বন্ধে সে প্রায় নিশ্চিত ছিল। সে ভেবেছিল তার নামটা বলার পরই সকলে তার দিকে বেশ কিছুটা বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকাবে: এই ভদ্রলোকই কি সেই কবি, যিনি ওই কবিতাটা লিখেছেন?

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। ভালো করে কথা বলতেই অনিচ্ছুক।

আঙ্গিক সম্বন্ধে তার ভালো জ্ঞান নেই। মনের কথাও সে গুছিয়ে লিখতে পারে না। তাহলে তার লেখার ভালোটা কী? তার লেখার যদি এতই ত্রুটি তাহলে তা' 'অরণ্যের' মত পত্রিকায় ছাপানো হলো কেন? না-ছাপানোই উচিত ছিল।

অতীন তখনো বসে আছে দেখে বিমল আবার একবার অতীনের মুখের দিকে তাকান। তারপর পুনর্বার মাথা নিচু করে লেখায় মন দেন।

একটু ইতস্তত ক'রে অবশেষে অতীন উঠে পড়ে। হাত তুলে বিমলের উদ্দেশ্যে বলে,—'নমস্কার।'

লেখায় ব্যস্ত থাকায় বিমল মুখ তোলার অবসর পান না। তেমনি মাথা নিচু ক'রে লিখতে লিখতে শুধু বাঁহাতটা কপালের কাছে তোলেন।

অতীন 'অরণ্য' অফিস হতে বার হয়ে আসে। নিজেকে তার বড় ক্ষুদ্র, বড় তুচ্ছ মনে হয়। যে-আশা ও উৎসাহ নিয়ে সে পত্রিকার অফিসে এসেছিল তা' কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। অথচ কেউ যে তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে তা নয়। ভদ্রভাবেই কথা বলেছে। ব্যস্ততার মধ্যেও তার কবিতা পড়েছে, মন্তব্য করেছে, উৎসাহিত করেছে। পত্রিকার অফিসে যে-রকম কাজের ভিড় তাতে তার মত একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যে কিছুক্ষণ কথা বলা হয়েছে এতেই তার খুশী হওয়া উচিত। সে যদি বোকার মত অনেক আশা ক'রে থাকে তাহলে সে-আশাভঙ্গের জন্য সে-ই তো দায়ী। এদের কী দোষ?—কিন্তু তবু অতীন একটুও খুশী হতে পারে না। ভারি বিশ্রী লাগে তার। এমন সুন্দর উজ্জ্বল বিকেলটাই যেন কালো হয়ে গেছে মনে হয়।

অন্যমনস্ক হয়ে সে হাঁটতে থাকে।

তখনো সন্ধ্যা হতে অনেক দেরি। অতীন ভাবে, কোথায় যাওয়া যায় এখন? বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না। পুরনো মেসে যাবে কি? তাই যাওয়া যাক।

মেসে আজকাল কদাচিৎ যায় অতীন। বিনয়ের সঙ্গে সেই সেদিনের কথাবার্তার পরদিনই অবশ্য সে মেসে গিয়েছিল। গিয়ে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বিনয়কে তার দুর্বলতা অর্থাৎ সুস্মিতার কাছ হতে দূরে যাওয়ার অক্ষমতার কথা জানিয়ে এসেছিল। বিনয় অবশ্য প্রথম দিন তার দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্য খুবই ধিক্কার দিয়েছিল।

কিন্তু পরে আর ও'বিষয়ে কিছু বলেনি। খুব সম্ভব অতীনকে কষ্ট দিতে তারও কষ্ট হয়।

অতীন জানে বিনয় তাকে খুবই ভালোবাসে। আর আজকাল মুখে কিছু না-বললেও অরবিন্দের বাড়িতে তার অবস্থানটা যে বিনয় পছন্দ করে না এটাও সে ভালোভাবে বোঝে। সেইজন্যই বিনয়ের কাছে যেতে তার কেমন একটু বাধো বাধো ঠেকে। বিনয়কে সেও ভালোবাসে, শ্রদ্ধা ক'রে। তার কথা, তার যুক্তি অতীনের সব সময় ঠিক মনে নাহলেও ওই ভালোবাসার জন্যই বোধ হয় তা সে মেনে নেয়।

বিনয় বলে,—'বোস অতীন। আমি এইমাত্র অফিস থেকে ফিরলাম। হাতমুখ ধুয়ে আসি।'

অতীন তক্তপোষের ওপর বসে।

তারপর চা খেতে খেতে দুই বন্ধুর কথাবার্তা চলতে থাকে। অনেকে এসে জমা হয়। কমলেশ বলে,—'অরণ্য'তে আপনার একটা কবিতা পড়লাম অতীনবাবু। সিম্পলি মারভেলাস! আপনার কাব্যভাবনা, আপনার কাব্যরীতি সবই সুন্দর। আপনার পরবর্তী কবিকর্ম দেখার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে রইলাম। স্মিতমুখে অতীন বলে, 'একটু সহজ ভাষায় কথা বলুন মশাই। কবিকর্ম শুনলেই আমার অপকর্মের কথা মনে হয়।'

কমলেশ একটু অপ্রস্তুত হয়। বিরক্তও হয়। বলে,—'আপনি যদি স্বীকৃতি পেতে চান তা'হলে ভাষায় উৎকর্ষ আনতে হবে। আপনি যে ভাষায় লেখেন তা'তে স্বীকৃতি পাওয়া সহজসাধ্য নয়।'

অতীন হেসে বলে,—'হ্যাঁ, একশ্রেণীর মানুষের দুর্বোধ্য, দুষ্প্রাপ্য এবং কৃত্রিম জিনিসের প্রতি একটা সহজ দুর্বলতা আছে।'

কমলেশের মুখ লাল হয়ে ওঠে। বলে,—'কথাটা আপনার ভুল।' —হাত গুটিয়ে সে তর্ক শুরু করে দেয়।

দেখা যায় বিনয়ও কবিতাটা পড়েছে। সে বলে,—'এই ধরণের সৌখিন কবিতা লিখে কী লাভ তা' বুঝি না। সে অতীনের দিকে তাকায় না। নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বলে যায়,—'দেশের বর্তমান অবস্থায় এই ধরণের সৌখিন বা আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্য শুধু অর্থহীন নয়, লজ্জাকরও। সাহিত্য যদি সমাজের সমস্ত মানুষের কল্যাণের পথ সুগম না-করে তা'হলে তা' যেমনই হোক-না কেন তা' সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কবি, সাহিত্যিকদের আজ সমাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করতে হবে ; সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে ; শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে আকাশে সাবানের ফেনা ওড়ালে চলবে না।'

অতীন চুপ করে থাকে। বিনয়ের সব কথা সে অন্তর দিয়ে স্বীকার না-করলেও কোনো কথা বলে না।

অতীনের কবিতাকে কেন্দ্র ক'রে আলোচনা হয়তো আরও প্রসারিত হতো, কিন্তু নিখিল এসে সব ভেস্তে দেয়।

নিখিল বলে,—'আরে, অতীনবাবু যে! আবার মেসে ডেরা বেঁধেছেন নাকি?'

অতীন বলে,—'আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনি আর মেসে থাকেন না।'

বিনয় বলে,—'থাকবে কী ক'রে? ও' যে বিয়ে করেছে। এখন বাড়ি থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করছে।'

অতীন উৎসাহিত হয়। বলে,—'তাই নাকি নিখিলবাবু! কেমন লাগছে নতুন জীবন?'

ঠোঁট উল্টে নিখিল ব'লে,—'আর কেমন! উদ্বাহ নয় উদ্বন্ধন।—আর শালা আজকাল কি সব কিছুতেই ভেজাল, সব কিছুতেই চালাকি! রঙ-চঙের কারিকুরিতে তো গায়ের আসল রঙটাও বিয়ের আগে বোঝার উপায় নেই। তার ওপর আজকাল হয়েছে এক ব্রেসিয়ার! তার জন্য বুকের আসল গড়নটুকু পর্যন্ত ঠাওর করা যায় না।—উনিশ ব'লে বিয়ে দিয়েছিল মশাই, এখন শুনি উন্তিরিশ। আমার চেয়েও এক বছরের বড়।'

তার কথা বলার ধরণে হেসে ফেলে অতীন। বলে,—'তাতে হয়েছে কী? শেক্সপীয়রের স্ত্রী ছিলেন তাঁর চেয়ে আট বছরের বড়। ডক্টর জনসন-এর স্ত্রী আবার বিশ বছরের বড়।'

নিখিল বলে,—'ডবল বয়েসের বৌকে বাগ মানাতে মশাই প্রতিভাবানরাই পারেন। আমাদের দ্বারা কি ও'কাজ সম্ভব? নৈশ অভিযানে মৃত্যু অনিবার্য।'

বিনয় বলে,—'নিখিলবাবু, কথাবার্তায় শালীনতাটুকুও কি রক্ষা করতে পারেন না? নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে কথা বলছেন সেটাও কি ভুলে গেছেন?

নিখিল বিনয়ের মুখের দিকে হাসিমুখে তাকায়। তারপর অসহায়ের ভঙ্গি করে বলে,—'ওঃ, বিনয়বাবু আপনি কি একটু কম সীরিয়স হতে পারেন না?'

তার কথা বলার ভঙ্গিতে অনেকেই হেসে ফেলে। অতীনও না-হেসে থাকতে পারে না।

নয়

সকালবেলা চা খাওয়া হয়ে গেছে। অতীন তার নিজের ঘরে একটা আধুনিক ইংরেজি কবিতার সংকলন মন দিয়ে পড়ছে। সে ম্যাকনিস-এর 'প্রেআর বিফোর বার্থ্' পড়ছিল। বেশ লাগছে। কবিতাটি পড়াশেষ হলে আবার জায়গায় জায়গায় আবৃত্তি ক'রে পড়তে থাকে :

"I am not yet born ; console me.
I fear that the human race may with tall walls wall me,
with strong drugs dope me, with wise lies lure me,
on black racks rack me, in blood-baths roll me.

"I am not yet born ; provide me
With water to dandle me, grass to grow for me, trees to talk
to me, sky to sing to me, birds and a white light
in the back of my mind to guide me.

"I am not yet born ; O hear me,
Let not the man who is beast or who thinks he is God
Come near me."

অতীনের পড়ায় বাধা পড়ে। হরেন এসে ঘরে ঢোকে।

হরেনকে এ'সময় দেখে অতীন মোটেই খুশি হয় না। বেশ বিরক্ত হয়। তবু মনের ভাব চেপে রেখে বলে,—'আসুন, বসুন হরেনদা কী খবর ?'

হরেন বলে,—'তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল অতীন।'

অতীন বোঝে প্রয়োজনটা কী। বলে,—'বলুন।'

হরেন তবু ইতস্তত করে। অতীন ভীত হয়। হরেন কি অনেক টাকা চাইবে?

আরও একটু ইতস্তত ক'রে অবশেষে হরেন বলে,—'আমি একটা বই লিখছি অতীন। তোমার কিছু সাহায্য চাই।'

বই? হরেন বই লিখছে? অতীন ঠিক শুনেছে তো? অতীনের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় তার চোখ কপালে ওঠে।

অতীনের মুখের ভাব দেখে হরেন তাড়াতাড়ি বলে,—'নানা, সে-রকম কিছু নয়। আমি একটা প্রথম ভাগ লিখছি। নাম দিয়েছি প্রথম পাঠ। এ' বই প'ড়ে ছেলেমেয়েরা খুব সহজেই লেখা ও পড়া একসঙ্গে শিখতে পারবে।'

হরেন অনেক কথা বলে। বাম্বুকে পড়াবার সময়ই নাকি তার প্রথম এই বই লেখার চিন্তা মাথায় আসে। ছেলেকে পড়াতে পড়াতেই সে উপলব্ধি করে প্রচলিত সব প্রথম ভাগে কী কী ত্রুটি।—বই তার শেষও হ'য়ে এসেছে প্রায়। শুধু প্রথমে যে ছড়া দিয়ে অা-আ, ক-খ শেখানো হয় সেটা সে পারছে না। পদ্য-মেলাতে সে একেবারে পারে না। অথচ ছড়া বাদ দেওয়াও যায় না। কারণ ছড়াটাই ছেলেমেয়েরা ভালোবাসে এবং তাড়াতাড়ি মুখস্ত ক'রে ফেলে। সুতরাং ওটা চাই। অবশ্য অ-য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাবো পেড়ে,—এ'রকম হ'লে চলবে না। একটু নতুন ধরণের হওয়া চাই। অতীন তো কবিতা লেখে, সে পারে না এ'টুকু লিখে দিতে?

অতীন বলে,—'কাজটা সহজ নয় হরেনদা; ছোটো ছেলেমেয়েদের মনের মত ছড়া লেখা খুবই শক্ত!'

—'তুমি লিখেই দাও না। তারপর আমি একটু এদিক-ওদিক ক'রে ঠিকঠাক ক'রে নেবো।'—হরেন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে।

অতীন নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে। মনে মনে ভাবে এর চেয়ে হরেন টাকা চাইলেই ভালো হতো।

অতীনকে মৌন দেখে হরেন তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। তার মনের সমস্ত কথা বলে। তার প্ল্যান, তার জীবনাদর্শের কথা আবার বিস্তৃতভাবে শোনায়। বলে,—'শিশুরাই হ'চ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ, বুঝেছো অতীন। চাইল্ড্ ইজ দি ফাদার অফ ম্যান। সেই চাইল্ডদের গড়ে তোলার কাজই হচ্ছে দেশের সব চেয়ে বড় কাজ। অবশ্য এই গড়ে তোলাটা ইউরোপের আদর্শে গড়ে তুললে চলবে না। তাহলে সব আজকালকার মত লেখাপড়া-জানা বাঁদর তৈরী হবে। গড়ে তুলতে হবে সম্পূর্ণ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে। পূর্বের গুরুগৃহে বাসের মত সহর থেকে দূরে স্কুলবোর্ডিঙে থেকে ছেলেরা পড়াশোনা করবে। সেজন্য ছাত্রদের কোনো অর্থ ব্যয় করতে হবে না। তারা শুধু মনপ্রাণ দিয়ে পড়াশোনা করবে।—ভগবান যদি করেন তাহলে এই ধরণের স্কুল ও বোর্ডিং আমিই প্রথম প্রতিষ্ঠা ক'রে আদর্শ স্থাপন করবো। তারপর তা দেখে দেশ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে।—কী বলো তুমি?'—হরেন অতীনের দিকে তাকায়।

অতীন মাথা নিচু ক'রে যন্ত্রের মত ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানায়।

হরেন ব'লে চলে,—'অধ্যয়ন হচ্ছে তপস্যা। সেই তপস্যার সময় ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। মাছমাংস খাবে না। মেয়েদের মুখ দেখবে না। মাছমাংস যদি বা খায়, মেয়েদের সঙ্গ কিছুতে করবে না। কোনো সিনেমাও দেখতে পাবে না। এই যে আজকাল বাচ্চা বাচ্চা ছেলে সিনেমা দেখে মায়ের বয়সী স্ত্রীলোকের সঙ্গে

মনে-মনে ইয়ে করে তা' চলবে না। বুঝেছো অতীন ইউরোপকে নকল ক'রে আমাদের দেশটা একেবারে গোল্লায় গেলো। ইউরোপ-অ্যামেরিকা থেকে যে বিষ আমাদের মধ্যে ঢুকছে, এখনো সাবধান না হলে, কোনো দেশনেতার সাধ্য নেই যে কোনোদিন সে-বিষ ঝেড়ে ফেলে।'—সে মুহূর্তের জন্য থামে।

অতীন কোনো কথা বলে না। নীরবে মুখ নিচু ক'রে কবিতার বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

হরেন আবার তার পূর্বের কথার জের টেনে চলে,—'এই যে ইউরোপ-অ্যামেরিকার দেখাদেখি আজকাল মেয়েদের ইস্কুল-কলেজে পড়ানো হচ্ছে,—তার ফলটা কী হচ্ছে শুনি? ঘরে ঘরে আরো অশাস্তি বাড়ছে। আগেকার দিনে মেয়েরা শিবপূজো করতো। শিবজ্ঞানে স্বামীর সেবা করতো। তাই ঘরে ঘরে শ্রী ছিল, শাস্তি ছিল। আর আজকাল?'—হরেন কটমট ক'রে অতীনের দিকে তাকায় যেন এ'সবের জন্য সে-ই দায়ী।

উত্তেজিত হরেন স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। সে সম্পূর্ণ প্রসঙ্গান্তরে চলে আসে। তার প্রথম পাঠের ছড়া লেখাবার প্রস্তাব নিয়ে যে সে এখানে এসেছে সে-কথা বোধ হয় সে একেবারে বিস্মৃত হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও আরো অনেক পৌরাণিক সাধ্বী নারীর কাহিনী সে শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে বলে যায়।

বলতে বলতে সে আরো উদ্দীপিত হয়ে ওঠে:—'ওঃ, সে কী দিন গেছে ভারতের!'—একটু থামে সে। সেই অতীত দিনের ছবি বোধ হয় কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করে। তারপর আবার বলে যায়।—'তবে সে সব দিন আবার ফিরে আসবে। সেই সীতা, সাবিত্রী,

দময়ন্তীর আবার দেখা পাওয়া যাবে আমাদের দেশে। এ' দেশ কখনো ডুববে না। ডুবতে পারে না। ভারতবর্ষ ভগবানের নির্বাচিত দেশ। এক সময় এই দেশ দেবতাদের লীলাভূমি ছিল। কোনো দেশের সে সৌভাগ্য হয়নি। ভগবান ভারতবর্ষকে টেনে তুলবেনই। তিনি এখনো দেখছেন আমরা কী করি। আমাদের কতখানি অধঃপতন হয় তা' লক্ষ্য করছেন। যখন দেশ একেবারে পাপে পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন তিনি নিজে অবতীর্ণ হবেন। তখন আর একটাও বদলোক থাকবে না।'—বিশ্বাস ও আশায় হরেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অতীন মহা বিপদে পড়ে। কবিতা পড়া তার মাথায় উঠে যায়। কী ক'রে যে হরেনকে থামাবে বুঝতে পারে না। মনে মনে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। নাঃ, বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে হরেন। অতীন ভাবে সতী কী ক'রে যে হরেনকে সহ্য করে তা' কে জানে! সতী যেমনই হোক, তার মাথাটা অন্তত ঠিক আছে। সে-ও হরেনের মতই প্রায় লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু সে কি ছেলেদের জন্য বই লিখতে যাচ্ছে, না, দেশ গঠনের চেষ্টায় কোমর বেঁধেছে, আর যাই হোক, তার কাণ্ডজ্ঞানটা আছে। রেসের টাকায় 'সে স্কুল গড়ার স্বপ্ন দেখে না। তার যে কতটুকু ক্ষমতা তা সে বোঝে। সে বুদ্ধিমতী, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরীও তাকে বলা চলে। তার স্বামী যে হরেনের মত একজন অর্ধশিক্ষিত, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত রোগা পটকা লোক এ'কথা ভাবতেও এখন অতীনের বিশ্রী লাগে। হরেন যা বলে তা হয়তো সব বাজে কথা নয়। হরেনের প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতিও আছে। কিন্তু তা সত্বেও এই মুহূর্তে তাকে সে একটা ফার্স্ট ক্লাস বোর ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। সকালের এমন কবিতা পড়ার মুডটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সত্যিই সে রেগে যায়। তবু যথাসাধ্য রাগ চেপে রেখে হরেনের হাত

থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বলে,—'আচ্ছা, হরেনদা আপনার বই-এর জন্য ছড়া লেখার চেষ্টা করি এখন,—কী বলেন ?'

হরেন তার নিজের ভাবে ডুবে থেকে বলে,—'ও তুমি অন্য সময় লিখো।'

ব'লে সে আবার তার পূর্বের বক্তৃতার জের টেনে চলে।

কয়েক দিন পরের কথা। দুপুরবেলা অতীন তার ঘরে বসে লিখছে। দারুণ গরম। আকাশ থেকে যেন অগ্নি বৃষ্টি হচ্ছে। ফ্যানের তলায় বসে থেকেও সে ঘামতে থাকে।

অডেন-এর কবিতার ওপর সে একটা প্রবন্ধ লিখেছে। সেটাই সে পরিষ্কার ক'রে কপি করছিল। আজ বিকেলেই প্রবন্ধটা 'অরণ্য' অফিসে দিয়ে আসার কথা।

'অরণ্য'র সহকারী সম্পাদক কবি বিমল চক্রবর্তীর সঙ্গে আজকাল তার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সে যে-কবিতাটা সেদিন 'অরণ্য'-তে দিয়ে এসেছিল সেটা বিমলের নাকি খুব ভালো লাগে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে অতীনকে একটা চিঠি লেখে সেই কবিতাটার প্রশংসা ক'রে। চিঠি পেয়ে অতীন আবার 'অরণ্য' অফিসে যায়। সেদিন বিমলের সঙ্গে তার বেশ মন খুলে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সেদিন আর নিজেকে অতীন তুচ্ছ বা অবজ্ঞাত বোধ করেনি। প্রচুর আশা ও উৎসাহ নিয়ে সেদিন সে 'অরণ্য' অফিস থেকে ফিরেছিল। তারপর সে প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে অনেকবার 'অরণ্য' অফিসে গিয়েছে। বিমলের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। তাকে তার কবিতা পড়ে শুনিয়েছে। তার ফলে বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও এই অল্পকালের মধ্যেই তাদের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা দেখা দিয়েছে।

বিমলের অনুরোধেই সে এই প্রবন্ধটি লিখেছে। প্রবন্ধটি কপি করতে করতে একটা কথার অর্থ সম্বন্ধে অতীনের মনে কিছু সংশয় দেখা দেয়। হাত বাড়িয়ে চলন্তিকাটা নিতে গিয়ে দেখে সেটা নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে হরেন সেটা নিয়ে গেছে তার বই লেখার জন্য। প্রয়োজনের সময় অভিধানটা না-পেয়ে সে খুব বিরক্ত হয়। তাড়াতাড়ি নিচে নামে হরেনের ঘর থেকে বইটা আনার জন্য। এসে দেখে হরেনের ঘর বন্ধ। আচ্ছা মুস্কিল যা হোক। রবিবার ছাড়া দুপুরে তো হরেন থাকে না। একা একা ঘরে দরজা দিয়ে তাহলে কি করছে সতী?

অতীন ভাবে ডাকবে কিনা। ডাকাটা কি ঠিক হবে? সতী কি ঘুমচ্ছে? হয়তো ঘুমচ্ছে। তাহলে ডেকে ঘুম ভাঙানোটা উচিত হবে না। কিন্তু বইটারও যে তার অত্যন্ত প্রয়োজন। অতীন সাত-পাঁচ ভাবে। একবার ভাবে ডাকি, সতী হয়তো জেগেই আছে। আবার ভাবে চলে যাই, কাল কপি করবো। কিন্তু লেখাটা আজই দেওয়ার কথা। আজ না দিলে হয়তো অসুবিধা হবে বিমলের। কীকরবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে শেষপর্যন্ত সে করিডোর ঘুরে বাথরুমে যাওয়ার পথে উত্তর দিকের জানালার খড়খড়িটা একটু তুলে দেখে সতী ঘুমচ্ছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে যায়।

দেখে তক্তপোষের ওপর বনমালী সতীকে পিছন দিক হতে জড়িয়ে ধ'রে তার শরীরটা যথেচ্ছভাবে নিষ্পেষিত করছে। আর বিস্রস্তবাসে সতী সেই অবস্থাতেই মুখের কাছে একটা বই নিয়ে পড়ে চলেছে বা পড়ার ভান করছে।

নিমেষে অতীন সরে আসে। তারপর একরকম দৌড়ে সে নিজের ঘরে এসে উপস্থিত হয়।

আশ্চর্য! উনত্রিশ-ত্রিশ বছরের একটি ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, যার

স্বামী আছে, দুটি সন্তানও বর্তমান, সে কিনা বাইশ-তেইশ বছরের একটি ছেলের প্রতি আসক্ত,—তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত!—বিস্ময়ে, রাগে, ঘৃণায় এবং হয়তো কিছুটা ঈর্ষাতেও অতীনের সমস্ত দেহ মন জ্বালা করতে থাকে। তার শ্বাসকষ্ট হয়! মুখ দিয়ে সে শ্বাস নিতে থাকে: যেন অনেক, অনেক পথ এই মাত্র সে দৌড়ে এসেছে এমনিভাবে হাঁপায়।

তখনো বোধ হয় দুটো বাজেনি। সূর্য একটু পাশে সরলেও ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। গরমে রাস্তার পিচ গলে চক চক করছে। দু' একজন পথচারীকে শুধু পথে দেখা যায়। গরম গলানো পিচ তাদের পায়ে বা জুতোয় লেগে যাচ্ছে। পূব দিকের জানলা দিয়ে অতীন শূন্য দৃষ্টিতে এই সবই চেয়ে চেয়ে দেখে। মন তার উত্তেজনার পাখায় ভর ক'রে কোথায় উড়ে যায় কে জানে। মনে মনে সে বারবার বলে,— ছিছি,—একী!

বেশ কিছুক্ষণ পর দেহমন কিছুটা শান্ত হলে অতীন তার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয়। সতীর হাব-ভাব, আচার-আচরণ সে যতই অপছন্দ করুক, দেহের দিক হ'তে সতীর প্রতি সে যে একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করতো সেটা তার অজানা ছিল না। তার দেহের আদিম অন্ধক্ষুধা সতীর দিকে তাকে অবিরত প্রবলভাবে টেনেছে। এটা সে জানে। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী সতীর ঈষৎ স্থূল দেহের যে একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। এর উপর সতী নানাভাবে তাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে, নানা ছলাকলার জাল বিস্তার করেছে, তবু সে কখনো যে ফাঁদে পা দেয়নি, কখনো তার দুর্বলতা সামান্য মাত্র কাজে বা কথায় প্রকাশ করেনি সেজন্য সে সত্যিই তার ভাগ্যকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারে না।

একদিনের কথা মনে পড়ে। সতী তা'কে কী যেন খেতে দিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর হাত ধুয়ে সে সতীর কাছে তোয়ালে চেয়েছিল হাত মুখ মুছবার জন্য। সতী তোয়ালে না-দিয়ে তার সামনে বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম ঝাঁজের সঙ্গে বলেছিল,—'যাও পাবে না তোয়ালে, যাও।' ব'লে সে কিন্তু খিল খিল ক'রে হেসে ফেলেছিল। সেদিন অতীনের ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল সতীর আঁচলটা টেনে নিয়ে তা'তেই হাতমুখ মোছে। ভাগ্যে সেদিন সে তা' করেনি!

আর একদিন। অতীনের হাতে একটা সুন্দর গোলাপ ফুল দেখে সতী বলেছিল,—'দাও ঠাকুর পো, আমায় ওটা দাও।' ব'লে অভ্যাসবশেই হয়তো অতীনের প্রতি একটি মধুর কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে তার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। সেদিনও অতীনের খুব ইচ্ছে হয়েছিল সতীর খোঁপায় ফুলটা পরিয়ে দিতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা' সে পারেনি। সংকোচ হয়েছিল।

আর সেদিনের কথা! ওঃ, সেদিন যে কী হতো, ভাবতেও ভয় হয়।

এমনি আরও কতদিন। তার সহজ সংকোচপ্রবণতা বা লাজুক প্রকৃতি কিংবা অন্য আর কিছু তাকে প্রতিবারই বাঁচিয়েছে। নাহলে আজ তার আর লজ্জার সীমা থাকতো না।

আর একদিক থেকেও তার মন হাল্কা হয়ে যায়। এতদিন নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বোধ হতো। মনে হতো সুমিতাকে ভালোবাসায় অধিকার বোধ হয় তার নেই। সুমিতা ছাড়াও অন্য একজন স্ত্রীলোকের দেহের প্রতি তার মনে যে, একটা স্থূল অন্ধকামনা লুকিয়ে রয়েছে—এই বোধ তার শিক্ষিত মার্জিত মনকে অবিরত পীড়া দিতো। এখন তার মনকে সম্পূর্ণ একমুখী অনুভব ক'রে সে শান্তি পায়।

এরপর হ'তে যে-কোনো প্রয়োজনই হোক না কেন সতীর ঘরে আর সে যায় না। কখনো সামনা-সামনি হ'লেও যা'তে একেবারে দৃষ্টিকটু না-হয় এমনিভাবে দু'টো-একটা কথা ব'লেই পাশ কাটিয়ে চলে আসে। সে-দিনের ঘটনা যতই তার মনে পড়ে ততই সতীর প্রতি তার অন্তর ঘৃণায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। সতীকে তার কোনোদিনই সম্পূর্ণভাবে ভালো লাগতো না, এখন একেবারে সব দিক থেকেই বিশ্রী লাগে।

হরেনের প্রতিও সে অত্যন্ত বিরূপ হয়ে ওঠে। এতদিন তার সঙ্গ কিছুটা বিরক্তিকর বোধ হলেও মনেমনে সে তার প্রতি একটা সহানুভূতি ও করুণার ভাব পোষণ করতো। কিন্তু এখন তার প্রতি সে অন্তরে একটা ঘৃণার অনুরূপ মনোভাব ছাড়া আর কিছু অনুভব করে না।—চোখের সামনে স্ত্রী ব্যভিচার করে তাকি সে বোঝে না। নাকি বুঝে—সুজেও ভয়ে চুপ ক'রে থাকে?—কিছুই অসম্ভব নয় নির্বোধ ভীরু অপদার্থ হরেনের পক্ষে।

হরেনকে তাই সে আজকাল একেবারে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু হরেন তাকে বিরক্ত করতে ছাড়ে না। তাকে সেই প্রথম পাঠের ছড়া লিখে দিয়েও অতীন রেহাই পায় না। প্রায়ই সে এসে তাকে তার প্রথম পাঠের লেখা কিছু কিছু পড়ে শোনায়। পড়ার পরে যথারীতি জিজ্ঞাসা করে,—'কেমন হয়েছে অতীন?'

বিরক্তভাবে অতীন এককথায় বলে,—'ভালো।'

হরেন সেটাকে সত্যিই মনে করে। অতীনের রাগ বা বিরাগ সে লক্ষ্য করে না। আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে,—'অনেক চেষ্টা করে তবে এটা লিখেছি অতীন। পরশু বাসুকে পড়াতে পড়াতে এটা প্রথম মনে আসে। বাসু বললে,—বাবা এটা লিখবো কীকরে'—ভাবলুম

সত্যিই তো, এটা বোঝানো শক্ত। তখন এই পদ্ধতি চিন্তা ক'রে মাথা থেকে বার করলুম। কোনো বইতে তুমি এ'রকম পাবে না।'—তার মুখে চোখে গর্বের ভাব ফুটে ওঠে।

অতীনের গা জলে যায়। তবু সে সহ্য করে। মন দিয়ে শোনার ভান করে।

এমনিই চলে প্রায় দিন।

হরেন পূর্বের মত মাঝে মাঝে অতীনের কাছে টাকাও ধার চায়। প্রত্যেক বারই টাকা চাওয়ার সময় সে বলে,—'তোমার কতগুলো টাকা আমার কাছে আছে। এবার ব্যাঙ্ক থেকে তুলেই দিয়ে দেবো।'

হরেনের এই মিথ্যাচারও অতীনের সহ্য হয়। কিন্তু হরেন যে সতীকে ভয় ক'রে এটা সে সহ্য করতে পারে না। বেহায়া ব্যভিচারী স্ত্রীকেও ভয়! হরেন কি পুরুষ মানুষ নয়? মানুষের রক্ত নেই তা'র শরীরে? শাসন ক'রে টিট ক'রে দিতে পারে না বৌকে?—হরেনকে অতীন মনে মনে নির্বোধ ভীরু অক্ষম অপদার্থ যা খুশি ব'লে গাল দেয়।

হরেন অবশ্য একেবারে নির্বোধ কিনা বলা যায় না। তবে সে যে একটু ভীতু প্রকৃতির সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সতীকে সে সত্যিই ভয় করে। কিন্তু সে-ই একদিন হঠাৎ ভীষণ বীররসের অবতারণা ক'রে ফেলে। অবশ্য সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় নয়,— মাতাল হ'য়ে।

হরেন নাকি রোজই প্রায় অল্প অল্প মদ খেতো। বেশি রাত্রি ক'রে ফিরে খাওয়া-দাওয়া ক'রেই শুয়ে পড়তো ব'লে এতদিন কেউ তা' জানতে পারেনি। সেদিন রেসে হঠাৎ অনেক হার হ'য়ে যাওয়াতেই

বোধ হয় সে মাত্রা ঠিক রাখতে পারেনি। একেবারে মাতাল হয়ে ফেরে।

বাড়ি ফিরেই সে বিনা ভূমিকায় রুটি-বেলা একটা বেলুন দিয়ে সতীকে প্রহার করতে শুরু ক'রে দেয়। হরেন কিছু জানে কিনা কে জানে। কিন্তু দেখা যায় সতীর ওপর তার প্রচণ্ড ক্রোধ।

কিন্তু হরেনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বলশালী স্ত্রীকে প্রহার করা হরেনের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষত মাতাল অবস্থায়। দু'চার ঘা মার খাওয়ার পরই সতী একটান মেরে বেলুনটা হরেনের হাত থেকে কেড়ে নেয়। তারপর জোর ক'রে তা'কে বিছানায় শুইয়ে দেয়। শুয়ে শুয়েই হরেন ভীষণ চিৎকার ক'রে অকথ্য গালি-গালাজ করতে থাকে সতীকে। তার চিৎকারে সারা বাড়ির লোক এসে তাদের ঘরের সামনে জড়ো হয়। একেবারে হুলস্থুল ব্যাপার।

শুধু সতী নয়, সতীর বাপ-মাকেও রেহাই দেয় না হরেন। দেখা যায় অরবিন্দের উপরও তা'র প্রচণ্ড রাগ। তাঁকে কৃপন, দাম্ভিক, অমানুষ ইত্যাদি ব'লে সে বারবার চিৎকার করতে থাকে। অরবিন্দের বাবা কী ক'রে টাকা জোগাড় ক'রে দোকান দিয়েছিলেন তারও একটা কুৎসিত বিবরণ সে চিৎকার ক'রে দিতে থাকে। অতীনকেও ছাড়ে না। যে-হরেনকে অতীন মনে মনে এতদিন ভীরু, অপদার্থ ইত্যাদি ব'লে মনের রাগ মিটিয়েছে সে-ই তা'কে প্রকাশ্যে ভীরু কাপুরুষ ভিক্ষুক যা-খুশি ব'লে গাল দিতে থাকে।

অতীন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। কী করবে ভেবে পায় না।

পাংশুমুখে সতী বলে,—'ঠাকুর পো, ডাক্তার ডাকতে পারো?'—সে বেশ ভয় পেয়েছে বোঝা যায়। এ'অভিজ্ঞতা'ও যে তার জীবনে এই প্রথম তা-ও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কে একজন বলে,—'ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। তেঁতুল গুলে খাইয়ে দিন তাহলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

তেঁতুল গোলা খাওয়াতে গিয়ে আর এক বিপত্তি হয়। হড় হড় ক'রে বমি ক'রে ফেলে হরেন। বমি ক'রে ঘর বিছানা সব নষ্ট ক'রে দেয়। তারপর বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে এক সময় সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে।

সতী সযত্নে হরেনের নোংরা জামা কাপড় বদলিয়ে দেয়। বিছানাটাও বদলায়। তারপর নিজের হাতে ঘরের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করে। তার মুখে শঙ্কা ছাড়া এতটুকু ঘৃণার ভাব দেখা যায় না।

অতীন অত্যন্ত বিস্মিত হয়! যে-স্বামীকে সতী এতটুকু ভালোবাসে না, যার চোখের সামনেই একরকম সে ব্যভিচার করে, তার বমি পরিষ্কার করতে তার মনে এতটুকু ঘৃণার উদ্রেক হয় না? তবে কি সতী হরেনকে ভালোবাসে? স্বামীকে ভালোবাসা সত্ত্বেও কোনো স্ত্রী কি ব্যাভিচার করতে পারে?—নাকি এ সবই অভিনয়? অতীন বোঝে না। মানুষের চরিত্র বড়ই জটিল; স্ত্রীলোকের চরিত্র বোধ হয় জটিলতর।

পরদিন অরবিন্দের ঘরে হরেনের ডাক পড়ে। অরবিন্দ স্পষ্ট জানিয়ে দেন তাঁর বাড়িতে হরেনের স্থান হবে না। হরেন ক্ষমা চায়, অনুনয়-বিনয় করে, নানা কথা বলে। তা'কে খুবই ভীত ও সংকুচিত মনে হয়। বলে,—'এবারের মত আমায় ক্ষমা করুন মামাবাবু। আর কখনো আমি এ'রকম করবো না।'

অরবিন্দ কোনো কথায় কর্ণপাত করেন না। বলেন,—'না, মাতাল জুয়াড়ির স্থান আমার বাড়িতে হবে না। সাত দিনের মধ্যে তোমাকে

এ'বাড়ি ছাড়তে হবে। আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।'--তাঁকে খুবই নির্মম ও কঠোর মনে হয়।

মহামায়া বলেন,—'এবারের মত ও'কে ক্ষমা করো,—আর কখনো—'

তাঁকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে অরবিন্দ বলেন,—'প্লিজ, তুমি এ'বিষয়ে কিছু বোলো না, প্লিজ—।'

স্বামীর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে মহামায়াও চুপ ক'রে যান।

দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে যায়। হরেনের যাওয়ার কিন্তু কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। সে খুবই সংকুচিতভাবে থাকে। চিরকালই সে এমনি থাকতো। শুধু একদিনের মাত্রাতিরিক্ত নেশাই যা' তাকে অল্পক্ষণের জন্য গণ্ডগোলের নায়ক করেছিল। নেশা সে ছেড়ে দিয়েছে মনে হয়। খুব সংযতভাবে চলাফেরা করে। সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সে বাড়ি আসে, যাবার নিঃশব্দে সকলের অগোচরে কখন বাড়ি থেকে বা'র হয়ে যায় কেউ তা' জানতেও পারে না।

কিন্তু এ'সব সত্ত্বেও অরবিন্দ তা'কে ক্ষমা করেন না। তিনি বোধ হয় এ'সব কিছুই লক্ষ্য ক'রে দেখেন না। হরেনকে ডাকিয়ে আবার তিনি খুব ধমকিয়ে দেন। ভালোভাবে হরেন এ'বাড়ি থেকে যাবে কি না? নাকি তাঁ'কে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে?

হরেন আবার ক্ষমা চায়, অনেক কাকুতি-মিনতি করে, অনেক কথা বলে। তারপর শুধু সজল চোখে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে।

শেষপর্যন্ত তা'কে যেতেই হয়। কী ব্যবস্থা সে করে কে জানে। একদিন তা'কে ম্লানমুখে সত্যিই জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করতে দেখা যায়।

অতীনের মনটা খারাপ হ'য়ে যায়। ভাবে, হরেন থাকলে কী-ই বা

এমন ক্ষতি হতো? সে যা' করেছে বা বলেছে তা'তো সবই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। নেশার ঘোরে।—সেই নেশাই বোধ হয় সে ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং সে থাকলে আর অসুবিধা কী?—হয়তো ধূপের এজেন্সিতে তার যা' আয় তা'তে তার সংসার চ'লবে না। নিজে, স্ত্রী এবং দু'টি ছেলে,—সংসার তার একেবারে ছোটো নয়। আজকালকার বাজারে খরচও কম নয়। হয়তো খাওয়া-দাওয়ারই অসুবিধা হবে সকলের। বাচ্চা দুটোর তো কোনো দোষ নেই। তারাও কষ্ট পাবে এই সঙ্গে।

হরেন ম্যাট্রিকও পাশ করেনি। তার উপর সে রুগ্ন। সে আর অন্যভাবে কী বেশি উপার্জন করবে। বি. এ. পাস করেও অতীন চার বছর অবিরাম চেষ্টা করেও একটা ভদ্রগোছের চাকরি জোগাড় করতে পারেনি। নিজেকে ভালোভাবে চালানোই তার পক্ষে এক সময় শক্ত হ'য়ে উঠেছিল। বিনয়ের সাহায্য না-পেলে তার যে কী অবস্থা হতো কে জানে। এ' অবস্থায় হরেন কী-ই বা করবে?—মনটা অতীনের সত্যিই বড় খারাপ হয়ে যায়।

যাওয়ার সময় হরেন অতীনের কাছে বিদায় নিতে আসে। তাকে আরও কৃশ, আরও রুগ্ন দেখায়। এই ক'দিনে তার বয়স আরও অনেক বেড়ে গেছে মনে হয়। হরেন বলে,—সে-রাত্রে নেশার ঘোরে তোমায় নাকি অনেক গালিগালাজ করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো অতীন।'—হরেন অতীনের হাতটা চেপে ধরে। তার হাত থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

অতীন তাড়াতাড়ি বলে, 'না, না, সে কিছু নয়।'—তার মুখ করুণ হয়ে ওঠে।

হরেন আবেগের সঙ্গে বলে,—'অতীন, মানুষের যেটুকু দেখা যায়, যেটুকু শোনা যায়,—সব সময় তাই তা'র আসল পরিচয় নয়।'—একটু থামে হরেন। গলা পরিষ্কার করে নেয়। তারপর বলে,—'তুমি বুঝতে পারছো অতীন আমি কি বলতে চাই? আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না।'—রুগ্ন শুষ্ক মুখে হাসার চেষ্টা করে হরেন। অতীন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মনের আবেগ সে রোধ করার চেষ্টা করে।

হরেন আজ অকপটে তার দৈন্য জানায়। বলে,—'তোমার কিছু টাকা আমি দিতে পারিনি। খুব সম্ভব দিতে আর পারবোও না। তবে যদি কোনোদিন দেওয়ার মত অবস্থা হয় নিশ্চয়ই দিয়ে দেবো। আমাকে ঠক মনে কোরো না অতীন।'

অতীন বলে,—'না না হরেনদা আমি সব বুঝি। আমিও জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, অনেক অভাবের মধ্যে কাটিয়েছি।'—বলতে বলতে তার গলাটাও যেন ধ'রে আসে।

হরেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক কী ব'লে বিদায় নেবে তা' বোধ হয় সে ভেবে পায় না। অতীনের হাতের উপরে নীরবে তার ঈষৎ-কাঁপা হাতটা শুধু রাখে।

একটু পর হরেন ম্লান গলায় আবার বলে,—'অতীন, আমি যা' করতে চেয়েছিলাম, যা' আমার জীবনের লক্ষ্য, তা' আর হলো না। হবেও না কোনোদিন। আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমাদের মত লোককে ভগবান কিছুই দেননি। না-বুদ্ধি, না-অর্থ, না-শক্তি—কিছুই না।'—একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে হরেন।

অতীন একটা কথাও বলতে পারে না। বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয়ে নীরবে মাথা নিচু করে শুধু বসে থাকে।

হরেন আস্তে আস্তে চলে যায়।

যাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে সতীও আসে বিদায় নিতে। শুষ্ক মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে,—'চললুম ভাই। অনেক অন্যায় হয়তো করেছি। সব ক্ষমা করো।'—বলতে বলতে কিন্তু সে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে।

অতীন কী বলবে বুঝতে পারে না। তার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে। মুহূর্তমধ্যে তার চোখও সজল হ'য়ে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে। সতীর প্রতি কোনোরকম রাগ বা ঘৃণা আর সে অনুভব করে না। দুঃখে ও মমতায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়।

সতী কি সত্যিই খুব খারাপ?—অতীন নতুন ভাবে চিন্তা করে।—হরেন সতীর চেয়ে প্রায় বারো-চোদ্দো বছরের বয়সে বড়। তার উপর হরেন রুগ্ন এবং নেশা করার জন্য আরো কিছুটা শক্তিহীন। সে হয়তো অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী সতীর দেহের ক্ষুধা একেবারেই মেটাতে পারে না। সতীর অজ্ঞাতসারেই হয়তো তার ক্ষুধার্ত দেহ অবিরত একটি বলিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গ কামনা করে। নিজের অজান্তে নারীসুলভ ছলায় কলায় হয়তো তা'রি প্রকাশ। এটা কি সত্যিই খুব দোষের? ক্ষুধা কি অন্যায়?

তা' ছাড়া নানা কারণে মানুষ তার সুবিধার জন্য বিবাহ-প্রথার প্রচলন করেছে। এ' খুবই ভালো ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃতি কি তা' অনুমোদন করেছে? কোনোদিন কি করবে? যদি করে তা'হলে আজও যে সম্পূর্ণ তা' করেনি সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

না, ব্যভিচার অতীন সমর্থন করে না। অবাধ যৌন-মিলনও নয়। তবে সব কিছুই খোলা চোখে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার ক'রে দেখতে হবে। তা'হলে অনেক জিনিষ চোখে পড়বে যা' ইতিপূর্বে

পড়েনি। তা' ছাড়া কারোকে ঘৃণা করার অধিকার কি অতীনের আছে? না, অতীনের তা' নেই। সে নিজেই কি নির্ভেজাল ভালো? সতীর প্রতি তার মনে যে ঘৃণার বিষ জমে উঠেছিল সে কি শুধুই নীতিগত কারণে? বঞ্চিত পুরুষ হৃদয়ের ঈর্ষায় নয়!

অতীনকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে চোখ মুছে সতী বলে,—'কী ভাই, কিছু বললে না?'—সেও অতীনের হাতের 'পরে তার হাত রাখে। কিন্তু সে স্পর্শে অতীন কামনার লেশও অনুভব করে না। শুধুই অনাবিল প্রাণের এক গভীর স্পর্শ পায় তাতে।

সতী মহামায়ার মতই সস্নেহে অতীনের কপালের কাছে ঝুলে পড়া কয়েক গাছি চুল সরিয়ে দেয়। তারপর আবার বলে,—সত্যিই যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি তো ক্ষমা কোরো ভাই।'

অতীন আর চুপ করে থাকতে পারে না। আবেগের সঙ্গে বলে,—'না না বৌদি, আপনিই বরঞ্চ আমায় ক্ষমা করবেন।'—অনুশোচনায় তার কণ্ঠস্বর করুণ শোনায়।

তার অনুশোচনার কারণ সতী ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের অকৃত্রিম আবেগ তাকে আরো বিচলিত করে।—তার দুই গাল বেয়ে আবার দরদর ক'রে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

অকস্মাৎ অতীনের মনে হয় শুধু যৌনক্ষুধা নয়, রিরংসার খাদ মেশানো জোয়ালো প্রেমও নয়, যুবক যুবতীর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় আরও সূক্ষ্ম, আরও গভীর এবং হয়তো আরও শক্তিশালী অন্য এক অনুভূতিও ধীরে ধীরে জন্ম নেয়। অন্তত এই মুহূর্তে অতীন তা' অন্তরে অন্তরে অনুভব করে।

দশ

এবারে বর্ষার আর বিরাম নেই। জৈষ্ঠের মাঝামাঝি থেকে শুরু হ'য়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। অবশ্য হ্রাস পাওয়ার কথাও নয়। এই তো সবে আষাঢ় অতিক্রম ক'রে বর্ষা শ্রাবণে পা দিয়েছে।

আজ পয়লা শ্রাবণ। মেঘ-মেদুর প্রকৃতি যেন শ্রাবণের সমগ্র রূপটি চোখের সামনে তুলে ধরেছে। সকাল থেকেই বর্ষণ আরম্ভ হয়েছে। দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য থেমে আবার বিকেল থেকে অঝোর ধারে ঝরতে শুরু হয়েছে।

অতীন জানালা দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। মেঘে মেঘে সারা আকাশ আচ্ছন্ন। বিকেলের ম্লান ফ্যাকাশে আলোয় বাড়িগুলো চুপচাপ ভিজছে। একটা কাক কার্নিসের নিচে আশ্রয় নিয়ে আছে। বাসায় যেতে পাচ্ছে না। অদূরে আর একটা পায়রাও ভিজে সমস্ত শরীর ফুলিয়ে বসে রয়েছে। কেউ কারোকে বিরক্ত করছে না। দু'জনেই স্তব্ধ।

মনে হয় সুখী নয়,—কেউ সুখী নয়। কী একটা বিষাদ যেন সমগ্র প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। কে যেন ছিল, সে যেন নেই। তা'কে চাই,—এখনই চাই। তা'কে না-দেখলে, তা'কে না-পেলে সমস্ত জীবন ব্যর্থ,—কোনোকিছুই কিছু নয়। কিন্তু তা'কে তো পাওয়া যাবে না—যাবে না—যাবে না। বৃষ্টির অজস্র ধারায় যেন শুধু এই এক নৈরাশ্যের করুণ সুর।

অনেক দিন পর অতীন অন্তরে কবিতা লেখার একটা তাগিদ অনুভব করে। আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে

লেখে। তারপর লেখা সমাপ্ত হ'লে আবার স্তব্ধ হ'য়ে বসে থাকে।

ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়। ঝি এসে ঘরে আলো জেলে দেয়। তার হাতে সুন্দর একটি রজনীগন্ধার স্তবক।

অতীন জিজ্ঞাসা করে,—'রজনীগন্ধা কে আনলো সারদা?'

ফুলদানিতে রাখতে রাখতে সারদা বলে,—'দিদি পাঠিয়ে দিল।'

সুমিতা? সুমিতা পাঠিয়ে দিল!—অন্য দিন হ'লে এতেই অতীন প্রসন্ন হ'য়ে উঠতো। কিন্তু আজ এই বৃষ্টি-ভেজা মন-কেমন-করা সন্ধ্যাবেলায় তা'র মনে হ'লো, সুমিতা নিজে কেন এলো না? সুমিতা কি নিজে আসতে পারতো না?—কেন সে আসে না? কী সে বাধা? সে কি অতীন দরিদ্র বলে? এই বাড়িতে আছে ব'লে? নাকি অন্য কিছু?—অতীন একদৃষ্টে কালো অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

আকাশের ঘন মেঘ বুঝি একটু একটু ক'রে মনেও এসে জমা হয়। বৃষ্টি-সজল মেদুর প্রকৃতি কি চোখের জলও টেনে আনতে চায়!

দ্রুত পায়ে কে যেন ঘরে প্রবেশ করে। শাড়ির খস খস শব্দ হয়। অবশেষে সুমিতা কি এলো? অতীন ফিরে তাকায়। দেখে সুমিতা নয় লতিকা।

লতিকা বলে,—'কী করছেন অতীনবাবু চুপচাপ বসে?'

নিজেকে সংবরণ ক'রে অতীন বলে,—'কিছু নয়।'

—'তা'হলে চলুন না ও'ঘরে গিয়ে গল্প-গুজব করি।'—তারপর টেবিলের উপর রক্ষিত খাতার 'পরে দৃষ্টি পড়ায় বলে,—'কী, কবিতা লিখছিলেন?—ডিস্টার্ব করলাম?'

অতীন বলে,—'না না, লেখা হ'য়ে গেছে। ও'কিছু নয়।

লতিকা বলে,—'দেখি কী লিখেছেন ?'

সংকুচিতভাবে অতীন বলে,—'ও' কাটাকুটি আপনি পড়তে পারবেন না।'

—'প'ড়ে শোনাবেন ? বীথির অনেকদিন থেকে আপনার কবিতা শোনার খুব ইচ্ছে। বেচারি লজ্জায় আপনাকে বলতে পারে না।—তা'কে ডাকবো ?'—ব'লে অতীনের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই লতিকা সামান্য একটু দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকে,—বীথি,—ও' বীথি এ'ঘরে একবার আয়তো।'

বীথি এসে ঘরে ঢোকে। তার পরনে একটি ফিকে সবুজ শাড়ি। কচি কলাপাতার মতন তার চিকন শ্যাম বর্ণের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে।

লতিকা বলে,—'বীথি, অতীনদার কবিতা শুনবি ?'

বীথি সলজ্জদৃষ্টিতে অতীনের দিকে তাকায়। অতীন বলে,—'তুমি কবিতা লেখো বুঝি ?'

লজ্জিত স্মিতমুখে বীথি বলে,—'সে কিছু নয়। তবে আমি কবিতা খুব ভালোবাসি। বিশেষ ক'রে আপনার কবিতা। সেদিন পত্রিকায় আপনার 'আকাশ' কবিতাটা প'ড়ে এত ভালো লাগলো!'—তার কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর।

অতীন খুশী হয়। কবিতার খাতাটা টেনে নেয়।

লতিকা বলে,—'একটু দাঁড়ান, আমি শান্তুকে ডেকে আনি।'—সে দ্রুত ঘর হ'তে বার হ'য়ে যায়। তারপর একরকম জোর ক'রে সুমিতাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে ঘরে ঢোকে।

বেশবাস সংযত করতে করতে সুমিতা ব'লে,—'কী হচ্ছে লতু ?'—তারপর অতীনের দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে বলে, 'কবিতা পড়বেন বুঝি ? কী সৌভাগ্য আমাদের।'

সুমিতার পরনে একটি ঘন নীল শাড়ি। খোঁপায় তিনটি শুভ্র রজনীগন্ধার আধ-ফোটা কলি। তা'র ঈষৎ-হেলানো নিটোল গ্রীবার পাশ হ'তে তা স্পষ্ট দেখা যায়।

অতীন মনে মনে ভাবে, তা'র কবিতা শোনা যদি সুমিতার পক্ষে সৌভাগ্য হয়, তা'হলে সে হুকুম করলে সে-সৌভাগ্য তো রোজই হ'তে পারে। আসলে তা তো নয়। এটা শুধুই ভদ্রতা। সভ্য শিক্ষিত মার্জিত মানুষ অবিরত এমনি মিষ্টি মিথ্যে কথা বলতেই অভ্যস্ত।—কিন্তু মুখে সে কিছুই বলে না। খাতার পাতা ওল্টাতে থাকে।

লতিকা বলে,—'আজকে যে-কবিতাটা লিখেছেন সেইটাই পড়ে শোনান।

অতীন একটু ইতস্তত করে। বলে,—'বীথি রয়েছে, ছেলে মানুষের সামনে এ'কবিতাটা পড়বো ?'

লতিকা বলে,—'কী এমন কবিতা এটা!—তা'ছাড়া সতেরো বছরের মেয়েকে আপনি ছেলেমানুষ বলেন ? মশায়ের বয়সটা কত শুনি ?'

অতীন বলে,—'কিন্তু কয়েক মাস আগে আপনিই ওকে ছেলে-মানুষ ব'লেছিলেন।'

—'সে আপনি ও'কে আপনি বলছিলেন ব'লে। তা'ছাড়া আমি ছেলেমানুষ তো বলিনি। ব'লেছিলুম ফ্রক পরে। তা' সেটা একেবারে মিথ্যে নয়।'—লতিকা বীথির দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসে।

লজ্জিত বিব্রত বীথি অতীনের দিকে চেয়ে অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, —'আমি কি উঠে যাবো ?'

—'না না,'—তাড়াতাড়ি অতীন বলে,—'ও' সব কিছু নয়। আসলে আমার নিজের কবিতা পড়তে কেমন যেন একটু সংকোচ হয়।'

হঠাৎ স্থমিতা বলে,—'তুই উঠবি কী বীথি! তো'কে শোনাবার জন্যেই তো পড়া।'

বাইরে বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি ধ'রেছিল। আবার ঝর ঝর ধারে ধারাবর্ষণ শুরু হয়। জানলা দিয়ে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির ছাট এসে ঘরে ঢোকে। সেই সঙ্গে বাদল বাতাসে রজনীগন্ধার একটু মৃদু মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়ায়।

কয়েকবার গলা পরিষ্কার ক'রে খাতার পাতাটা খুলে আত্মগতভাবে অতীন বলে,—'শুনুন, কবিতাটার নাম হ'চ্ছে 'শ্রাবণ'।'—তারপর অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে টেনে টেনে থেমে থেমে পড়ে:

ফাল্গুন কখন্ গেছে। বৈশাখও গেলো অবশেষে।
এখন আকাশ মাটি নদী মাঠ বন,
ইঁটের দেয়ালে বন্দী এই প্রাণ আর শ্রান্ত মন,
সমস্ত—সমস্ত কিছু ঢেকেছে শ্রাবণ।

এখন শ্রাবণ শুধু চেতনায় ঝ'রে ঝ'রে পড়ে:
সে' নীল গহনে আমি হারিয়ে গেলাম।
মনের সেতারে শুধু একটি সজল স্থর বাজে:
এ'জীবনে কী পেয়েছি কী-ই বা পেলাম!

আমাকে ভোলাবে ব'লে শ্রাবণের মত কোনো মেয়ে
দুরু দুরু বুকে তার চুল তো বাঁধেনি!
আমাকে হারাবে ভয়ে চোখের অতল কালো হ্রদ
ভরিয়ে ভাসিয়ে হায় কেউতো কাঁদেনি!

তা'হলে কী হবে শুধু এ'নগরে থেকে আর বলো !
পুরানো কাগজ বিক্রি : ফেরিওয়ালা চলো ॥

পড়া শেষ হলে কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না। কবিতাটা হয়তো এমন কিছুই নয়, কিন্তু অতীনের আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরে, রজনীগন্ধার গন্ধে আকুল বৃষ্টি-ঝরোঝরো তরুণ রাত্রির পরিবেশে তা' অপূর্ব শোনায়। সকলেই কিছুটা অভিভূত হ'য়ে পড়ে।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ ক'রে লতিকা বলে,—'আপনার সত্যিই ক্ষমতা আছে অতীনবাবু। আমার মত গদ্য-প্রকৃতির ফাজিল মেয়েকেও আপনি অভিভূত ক'রে ফেলেছেন।'

অতীন বলে,—'সত্যিই ভালো লেগেছে?' তার কণ্ঠস্বরে সংশয়। তারপর একটু থেমে বলে,—'আমি তো কিছুই বুঝি না। সদ্য সদ্য সব লেখাই ভালো লাগে। তারপর আর একেবারেই ভালো লাগে না। এ যে কী যন্ত্রণা!' সে বিষন্ন দৃষ্টিতে সুমিতার দিকে একবার তাকায়। সুমিতা কিছুই বলে না। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

রাত্রে মহামায়া লতিকা ও বীথিকাকে না-খাইয়ে ছাড়েন না।

লতিকা বলে,—'বৃষ্টি তো ধ'রে এসেছে মাসীমা, গাড়ি ক'রে যাবো। চলেই যাই।'

মহামায়া বলেন,—'দু'টি খেয়ে যেতে এমন অসুবিধাটা কী?'

—'মা হয়তো চিন্তা করবেন।'

মহামায়া বলেন,—'তোদের কথা শুনলে গা জ্বালা ক'রে লতু। মা চিন্তা করবেন সে-চিন্তা আমার চেয়ে তোর বেশি?—আমি সেই ছ'টার সময় মিসেস সেনকে ফোন ক'রে দিয়েছি।'

সকলে একসঙ্গে খেতে বসে। অরবিন্দও বসেন। মহামায়া নিজের হাতে পরিবেশন করতে থাকেন।

মহামায়া বলেন,—লতুর যে মায়ের প্রতি এত টান, বিয়ে হলে এ'সব কোথায় থাকবে?'

মুখে একটা কৃত্রিম হতাশার ভাব ফুটিয়ে তুলে লতিকা বলে,—'বিয়ে কি আর হবে মাসীমা? মা'র একেবারে চেষ্টা নেই। আপনি একদিন একটু বলুন না।'

হোহো ক'রে হেসে ওঠেন অরবিন্দ। সস্নেহে বলেন,—'আচ্ছা দুষ্ট মেয়ে তো।'

হাসিমুখে মহামায়া বলেন,—'তোর কি এতটুকু লজ্জা-সরম নেই লতু?'

লতিকা বলে.—'লজ্জা, ঘৃণা আর ভয়,—এই তিনটে জিনিষ ডিসেক্‌শন-হলে ত্যাগ ক'রে এসেছি।'

বীথি বলে,—'সব সময় আর ডাক্তারী ফলিও না। এখন যদি তুমি মড়াকাটার গল্প জুড়ে দাও তাহ'লে আমি উঠে যাবো।

অরবিন্দ বলেন,—'তোমার বুঝি খুব ভূতের ভয়?'

—'ভয় কিসের? খাওয়ার সময় মড়াকাটার কথায় ঘেন্না করে না?'

লতিকা বলে,—'ভূতের ভয় নেই তোর? জানেন সেদিন রাত্তিরে—'

—'কেউ বিশ্বাস করবেন না। সব বাজে কথা।'—বিপন্নভাবে বীথি বলে।

অরবিন্দ হেসে ফেলে বলেন,—'আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কেউ বিশ্বাস করবো না।—কিন্তু ভূত কি নেই?—অতীন কখনো ভূত দেখেছো?'—তিনি অতীনের দিকে তাকান।

অতীন বলে,—'আজ্ঞে না।'

লতিকা বলে,—'আমি ভূত দেখিনি বটে,—তবে অনেক অদ্ভুত দেখেছি।' বলে সে অতীনের দিকে তাকায়।

অরবিন্দ বলেন,—'হাসি নয়। ভূত তোমরা কেউ বিশ্বাস করো না?'

লতিকা বলে,—'না, আমি ভূত বিশ্বাস করি না।'

—'অতীন?'

অতীন বলে,—'ভূতের ভয় অবশ্য আমার আছে। তবে ভূত আমিও বিশ্বাস করি না।'

—'ভূতের ভয় আছে অথচ ভূত বিশ্বাস করো না এ' কেমন কথা?'

অতীন বলে,—'আমার মা'র খুব ভূতের ভয় ছিল। বংশগতির রহস্যময় কারণেই হোক, বা ছেলেবেলায় মায়ের প্রভাবের জন্যই হোক, সেই ভয়ের কিছুটা আমার মধ্যে এসেছে মনে হয়।—কলকাতার শ্মশানে অবশ্য ভয় পাই না। তবে গভীর রাত্রে পল্লীগ্রামে কোনো এক কুখ্যাত গাছের তলা দিয়ে যেতে বা শ্মশানের মাঝ দিয়ে হাঁটতে বেশ গা ছম ছম করে দেখেছি। মনেহয় এটা সংস্কার। হাজার যুক্তি দিয়েও একে তাড়াতে পারবো না।'

—'সংস্কার যেটাকে তুমি বলছো সেটাও বিশ্বাস। তবে সেটা সাবকন্‌শাস্ মাইণ্ডে আছে।'

—'তা' হয়তো হ'তে পারে। অত বিশ্লেষণ ক'রে দেখিনি। তবে সচেতনভাবে আমি ভূত বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না।—আমি সবই জেনেছি, সবই বুঝে ফেলেছি এমন কথা বলি না। তবে আমার মনে হয় মৃত্যুই শেষ। আত্মা যা'কে বলা হয় সেটা দেহেরই একটা গুণ বা ধর্ম। দেহাতিরিক্ত কিছু নয়।'

—'কিন্তু আত্মা বা প্রেতাত্মার কথা প্রাচীন এবং প্রধান সব ধর্মদর্শনেই পাওয়া যায়।'

—'এর কারণ বোধ হয় এই যে এই বিশ্বাস মানুষের প্রায় আদিমতম। মানুষের জীবনে মৃত্যুই সবচেয়ে ভীষণ ও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। এই মৃত্যু-ভয় থেকেই বোধ হয় এই সব ধর্মদর্শনের জন্ম।—মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। বাঁচার অন্ধ আকাঙ্ক্ষা মানুষের। অথচ চিরদিন বাঁচা যায় না,—বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই মানুষ অমর আত্মার কল্পনা করেছে,—মৃত্যুর পরও জীবনকে কল্পনায় প্রসারিত করেছে।'

—'তুমি যা' বলছো হয়তো তাই ঠিক, হয়তো তা' ঠিক নয়। পণ্ডিতেরা এ' নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। এ' বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না। তবে আমার এক বন্ধুর ভূত দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। তা'কে আমি কোনোক্রমেই অবিশ্বাস করতে পারি না। তার কাছে যে-কাহিনী শুনেছি কোনো যুক্তি বা ব্যাখ্যা দিয়েই তা'কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

অতীন বলে,—'এ'রকম অভিজ্ঞতার কথা আমিও একজন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির মুখে শুনেছি। তাঁ'র কাহিনীও সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করা শক্ত। তবে আমার মনে হয় আজ যা' ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে না, ভবিষ্যতে হয়তো তার সহজ ব্যাখ্যা মিলবে। এই বিজ্ঞানই হয়তো খোলা চোখে যুক্তির পথে তা' করবে।'

—'কিন্তু যতদিন তা' পাওয়া যাচ্ছে না ততদিন বিশ্বাস করতে আপত্তি কী?'

'আপত্তি আছে'—অতীন বলে।—'অবশ্য মানুষের কল্পনাপ্রবণতা এবং রহস্যের অনুভূতি সম্পূর্ণ দূর হোক এটা আমার ভালো লাগে

না।—কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে দু'চারজনের কল্পনা বা অলৌকিক অভিজ্ঞতার চেয়ে অধিকাংশ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। অধিকাংশ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে,—ভূত দেখা যায় না। ওমুক বা ওমুকের ওমুক দেখেছে এইমাত্র শোনা যায়। সুতরাং দু'চারজনের ঐ সব সত্যি বা মিথ্যে অলৌকিক অভিজ্ঞতার খুব মূল্য আছে ব'লে আমার মনে হয় না।—আর তা'ছাড়া দেখা যায় এই সব ভূত ইত্যাদির বিশ্বাস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষের বড়ই ক্ষতি করে। সেই জন্যই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ ছাড়া এ'সব বিশ্বাস করতে আমার আপত্তি।'

মহামায়া বলেন,—'তোমরা খাবে, না ভূতের কথাই বলবে?' তারপর অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে বলেন,—'তুমি কী বলো তো! আলোচনা করার আর বিষয় পেলে না। দু'টো ভগবানের কথাও তো বলতে পারতে।'

হাসিমুখে অরবিন্দ বলেন,—'কথায় কথায় উঠলো তাই। তবে এদের কাছে ভূত আর ভগবান প্রায় সমান।'—তিনি লতিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে মহামায়া লতিকার দিকে চেয়ে বলেন,—'সত্যিই তাই?'

ছদ্মগাম্ভীর্যের সঙ্গে লতিকা কপট মিনতি করে,—'না মাসীমা, আমাকে এতটা পাপিষ্ঠা মনে করবেন না।'

তার কথা বলার ভঙ্গিতে সকলেই হেসে ফেলে।

গাড়িতে ওঠার আগে পাদানিতে পা দিয়ে লতিকা অতীনকে বলে,

—'ভূতের কথা তো অনেক হলো, এখন একটি অদ্ভুতের কথা বলি, —শুনবেন?'

স্মিতমুখে অতীন বলে,—'বলুন।'

লতিকা বীথিকে বলে,—'গাড়িতে ওঠ বীথি।'—তারপর বীথি গাড়িতে উঠলে অনুচ্চকণ্ঠে প্রায় অতীনের কানের কাছে মুখ এনে বলে, —'আমি একজন অদ্ভুতকে জানি যিনি জীবনে গভীর ভালোবাসা পেয়েছেন, অথচ তিনিই ভালোবাসা পাননি ব'লে কবিতায় হাহাকার ক'রে থাকেন। আশ্চর্য!'—সে ভ্রূকুঞ্চিত করে। তারপর তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে জোরে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।

অতীন আর সুমিতা পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। রাত্রি দশটা বেজে গেছে। বাড়ি নিঃস্তব্ধ। অতীন ভাবে, লতিকা সুমিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাদের বিচিত্র দাম্পত্য জীবনের কথা সে তো সবই জানে। সে কেন এ'কথা বললো? তবে কি লতিকা নিজে—? না না, তা' কখনো সম্ভব হ'তে পারে না।

কয়েকদিন পরের কথা। সকালবেলা সুমিতা অতীনের খোঁজে তার ঘরে এসে ঢোকে। সেখানে তাকে দেখতে না-পেয়ে দোতলায় খোঁজ করে। সতীদের খালি ঘরে কিছু পুরোনো ফার্ণিচার রাখা হয়েছে। সেখানেও যায়। পাগল না-হলে খালি ঘরে আধভাঙা টেবিল-চেয়ারের মধ্যে যে একজন বসে থাকতে পারে না সে-চিন্তা বোধ হয় তা'র মাথায় আসে না। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। সেখানেও অতীনকে না-পেয়ে সে নিচে আসে। নিচে এসে দেখে অতীন বাগানে। একা একা পায়চারি করছে। সুমিতা পিছন দিক হ'তে একটু চেঁচিয়ে ডাকে,—'শুনছেন, একটা কথা ছিল।'

অতীন শুনতে পেয়েও শোনে না। ভাবে সুমিতা আগে অতীনবাবু ব'লে ডাকুক তারপর শুনবে। সুমিতা কিন্তু অতীনবাবু ব'লে ডাকে না। দ্রুতপদে তা'কে অনুসরণ ক'রে পাশে এসে দাঁড়ায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,—'দয়া ক'রে একটা কাজ ক'রে দেবেন ?'

অতীন জিজ্ঞাসুভাবে তাকায়।

সুমিতা বলে,—'আমার এক বন্ধুর ছেলের ভাত আজ। আগেই বলেছিল। কিন্তু একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ ফোনে মনে করিয়ে দেওয়াতে স্মরণ হলো। একটু পরেই যেতে হবে।—আপনি যদি একটা রূপোর বাটি আর একটা ঝিনুক এনে দেন তাহলে বড়ই ভালো হয়।'

অতীন চেয়ে দেখে সুমিতার মুখ আরক্ত, বুক ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে স্পন্দিত। এইটুকু দ্রুত হেঁটেই কি সুমিতা এতটা হাঁপিয়ে পড়েছে ?—নাকি অন্য কিছু ? কে জানে কী।

অতীন বলে,—'আচ্ছা, এখনই এনে দিচ্ছি।'—একটা জামা গায়ে দিয়ে তখনই সে রূপোর ঝিনুক-বাটি কিনতে বার হয়ে যায়।

রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু অতীন বড় মুস্কিলে পড়ে। রূপোর ঝিনুক-বাটি যে কোথায় পাওয়া যাবে তা' সে ঠিক করতে পারে না। সে ভাবে খুব সম্ভব সেকরার দোকানেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সেকরার দোকানই বা এখানে কোথায় ? তাহলে এখন সে যাবে কোন দিকে ? —কিছুই স্থির করতে না-পেরে অগত্যা ট্রামে উঠে দু'পাশে দোকানের দিকে চাইতে চাইতে যায়, যদি কোনো দোকান চোখে পড়ে যেখানে এই সব জিনিস পাওয়া যেতে পারে ব'লে মনে হয়। কিন্তু সে-রকম কিছুই তার চোখে পড়ে না। দু'একটা সন্দেহজনক স্থানে নেমে

দোকানের ভিতরে উঁকি ঝুঁকি মেরেও দেখে। কিন্তু সেখানেও রূপোর ঝিনুক-বাটি পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না।

খুঁজতে খুঁজতে ভাগ্যক্রমে একটা সেকরার দোকানই পথে পেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। হ্যাঁ, এখানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করে,—'রূপোর ঝিনুক বাটি আছে এখানে ?'

—'বাটি ?'—বিস্মিত স্যাকরা এমনভাবে তাকায় যেন তাকে অপমান করা হয়েছে। তারপর একটু থেমে গম্ভীরভাবে বলে,—'না, ঘটি-বাটির কাজ এখানে হয় না।'

অতীন খুবই অপ্রস্তুত হয়। কান লাল ক'রে তাড়াতাড়ি সে দোকান থেকে বার হয়ে আসে। সেকরা পিছন দিক হতে ডাকে—'শুনুন, ও' মশাই শুনুন, অর্ডার দিলে কিন্তু আমরা সবকিছুই ক'রে দিতে পারি।'

অতীন পিছন না-ফিরেই বলে,—'না, দরকার নেই। অর্ডার দেওয়ার সময় নেই।'

অতীন আবার ট্রামে উঠে পড়ে। সে বাড়িতে ফিরে যাবে, না সারা কলকাতা ঘুরে ঝিনুক-বাটি কিনে আনবে তাই ভাবতে থাকে। বাড়ি ফিরে গেলে সুমিতা কী ভাববে তাকে ? একটা জিনিস কিনে আনারও সামর্থ্য নেই তার। একেবারে অপদার্থ।

অথচ আন্দাজে সারা কলকাতা যদি সে এখন ঘোরে তাহলে কখন যে ফিরতে পারবে তার কোনো ঠিক নেই। ও'দিকে সুমিতা একটু পরেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবে। তাহলে ?

অবশ্য তার বেশ মনে পড়ছে ইতিপূর্বে অনেকবার সে দোকানের শো-কেসে রূপোর ডিশ, বাটি প্রভৃতি দেখেছে। কিন্তু কোথায় কোথায়

যে দেখেছে এখন আর তা' ঠিক মনে পড়ছে না। যে-সব স্থানে দেখেছে ব'লে একটু-একটু মনে হচ্ছে সে-সব সম্ভাব্য স্থানে ঘুরতে হলেও বেশ সময় দরকার। তার চেয়ে সময় থাকতে সুমিতাকে গিয়ে বলাই ভালো। সে নিজেই হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়ার পথে কিনে নিতে পারবে। গাড়ি ক'রেই তো যাবে। দোকান জানা থাকলে কতক্ষণই বা লাগবে ?

ফিরেই যেতো অতীন। কিন্তু হঠাৎ ট্রামে তাদের মেসের জ্যোতি রায়ের সঙ্গে দেখা হওয়াতে শুধু হাতে আর ফিরতে হলো না।

জ্যোতিই তাকে প্রথম দেখে। কাছে এসে বলে,—'আরে অতীনবাবু যে, কোথায় চলেছেন ?'

অতীন বলে,—'আরে মশাই আর বলবেন না, রুপোর ঝিনুক-বাটি কিনতে বেরিয়েছি।'

হাসিমুখে জ্যোতি বলে,—'রূপোর ঝিনুক-বাটি ? ভে—রি গুড। কবে হলো ?

অতীন বলে,—'হলো আবার কী ?'

একবার চারদিকে চেয়ে জ্যোতি বলে,—'কেন, আপনার ছেলে।'

—'ছেলে!'—অতীন খুবই বিস্মিত হয়। তারপর বুঝতে পেরে বলে,—'দূর, আমার ছেলে আবার কোথায় !'

জ্যোতি বলে,—'কিন্তু শুনেছিলাম যে আপনি বিয়ে করেছেন।

অতীন বিরক্ত হয়ে বলে,—'বিয়ে করলেই ছেলে হয় নাকি ? আচ্ছা বুদ্ধি তো আপনার।'

—তারপর একটু থেমে স্বাভাবিকভাবে বলে,—'আমাদের জানাশোনা একজনের ছেলের অন্নপ্রাশন আজ। নিমন্ত্রণ করেছে। তাই ঝিনুক-বাটি দিতে হবে।'

জ্যোতি বলে,—'ও,—তাই বলুন।

অতীন ভাবে, জ্যোতি তো নানারকম অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ করে। সে নিশ্চয় বলে দিতে পারবে কোথায় ঝিনুক-বাটি পাওয়া যাবে।

সে জিজ্ঞাসা করে,—'আচ্ছা জ্যোতিবাবু, এখানে কোথায় রূপোর ঝিনুক-বাটি পাঁবো বলতে পারেন?'

—'এখানে?—আপনি তো দোকান ফেলে এসেছেন।—জ্যোতি অতীনকে কোথায় যেতে হবে তার নির্দেশ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অতীনেরও মনে পড়ে যে সে-ও দেখেছে দোকানটা ওখানে। তাড়াতাড়ি সে ট্রাম থেকে নেমে পড়ে।

এইভাবে ঘোরাঘুরি ক'রে ঝিনুক-বাটি কিনে ফিরতে ফিরতে অতীনের প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কেটে যায়। এসে দেখে সুমিতার ঘরের দরজা ভেজানো। তার যে খুব দেরি হয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারে। সুমিতা হয়তো অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করছে। কী ভাবছে সুমিতা কে জানে। তাড়াতাড়ি সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে। কিন্তু ঘরে ঢোকামাত্রই যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়। কে জানতো যে মিনিট কয়েক পূর্বেই সুমিতা স্নান সেরে ফিরেছে।

মুখ লাল ক'রে অতীন ঘর হতে বার হয়ে আসে। তারপর কোনোক্রমে ঝি-এর হাতে ঝিনুক-বাটি দিয়ে সে নিজের ঘরে এসে খিল দেয়।

ছিছি, সুমিতা কী ভাবলো!—সংকোচে সে ঘেমে ওঠে। সেই সঙ্গে সুরার মত একটা মধুর নেশা: মেয়েদের লজ্জা কী এত সুন্দর হয়,—এত সুন্দর!

এগারো

খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে প্রবল ধারাবর্ষণে পৃথিবীর সমস্ত মালিন্য সাময়িকভাবে যেন ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় গাছের নতুন সব পাতা চকচক করছে।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর অতীন চেকভ-এর রচনাবলীর একটা ইংরেজি অনুবাদ আয়েস করে পড়ছিল। চেকভ-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে একেবারে বিস্মিত হয়ে গেছে। বিদেশী সাহিত্য অবশ্য তার খুব বেশি পড়াশোনা নেই। তবু যেটুকু আছে তা-ও নেহাত সামান্য নয়। এ'রকম সূক্ষ্ম রস পরিবেশন সে আর কারো লেখায় পায়নি। তার মনে হয় সূক্ষ্ম কারুকলার ক্ষেত্রে চেকভই বোধ হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী।

আর ভাষা কী সহজ, সংযত ও সাবলীল! অনুবাদ পড়েও তার আঁচ পাওয়া যায়। শিল্পরচনায় তাঁর সংযম বিস্ময়কর। কিছুই ব্যাখ্যা করে বলে দেওয়া নেই। সব পাঠককে বুঝে নিতে হবে, কিছু কিছু সৃষ্টিও করতে হবে। পাঠকের প্রতি এতটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা খুব অল্প কথাশিল্পীর রচনাতেই পাওয়া যায়।

টলস্টয়-এর কথাটা অতীনের মনে পড়ে। টলস্টয় নাকি বলেছিলেন, —ফ্রান্সে যেমন মোপাসাঁ, আমাদের তেমনি চেকভ। তবে আমার মনে হয় চেকভ উৎকৃষ্টতর।

টলস্টয়-এর এই উক্তি অতীন স্নেহান্ধ স্বদেশ-প্রেমিকের উচ্ছ্বাস ব'লে মনে করে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সুচিন্তিত অভিমত ব'লেই এটাকে সে গণ্য করে।

মসগুল হ'য়ে সে পড়ছিল।

এমন সময় স্থমিতা এসে ঘরে ঢোকে। চুড়ির একটু যেন বেশি ঠুন ঠুন, শাড়ির একটু যেন বেশি খস খস।

অতীন বই থেকে মুখ তুলে দেখে।

এতন্মাত্রে স্থমিতাকে দেখে সে খুবই আশ্চর্য হয়। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তা'র মুখের দিকে তাকায়।

স্থমিতা একটু ইতস্তত করে। তারপর সহজভাবে বলে,—'আপনার কবিতার খাতাটা একটু পড়তে দেবেন ?'

—'কবিতার খাতা!' অতীন আরো আশ্চর্য হয়। সংকোচের সঙ্গে বলে,—'সে-সব বাজে লেখা। আর তা'ছাড়া সে' কাটাকুটি আপনি পড়তেও পারবেন না।'

স্থমিতা প্রথম কথার কোনো জবাব দেয় না। বলে,—'আপনার যদি অন্যকোনো আপত্তি না-থাকে তা'হলে দিন,—আমি পড়তে পারবো।'

—সে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে।

অতীন সসংকোচে খাতাটা এগিয়ে দেয়।

অতীন ভেবেছিল স্থমিতা হয়তো খাতাটা নিয়ে তা'র ঘরে চলে যাবে। কিন্তু স্থমিতা কোথাও যায় না। সেখানে ব'সেই মনে মনে পড়তে থাকে।

অতীন চেয়ে দেখে স্থমিতা বেশ সেজেছে। সযত্নে খোঁপা বাঁধা। আয়ত চোখের কোণে স্থর্মার একটু ছোঁয়া। জ্র আরো একটু গাঢ়, আরো একটু টানা। কপালে একটা ছোটো সিঁদুরের টিপ। মনে হয় এখনই পরেছে। তার চুল থেকে, শরীর থেকে একটা মৃদু মধুর চেনা গন্ধ অল্প অল্প ভেসে আসে।

অতীন ভাবে, শোয়ার পূর্বে মেয়েরা কি এমনি একটু প্রসাধন করে? কে জানে। এ'সব বিষয়ে তার কোনোই অভিজ্ঞতা নেই।

চেকভ-এর রচনায় আর মন বসে না। অতীন বই-এর ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে স্থমিতার দিকে চেয়ে দেখে। টেবিল-ল্যাম্পের শেড্-এর ফিকে সবুজ রঙ্ স্থমিতার মুখে এসে পড়েছে। সারা মুখে তার তন্ময়তা। নির্জন রাত্রে একা ঘরে স্থমিতাকে এত কাছে অতীন আর কখনো পায়নি। অনাস্বাদিতপূর্ব এক মধুর অনুভূতির স্বাদ পায় সে।

দশটা সাড়ে দশটা এ'বাড়িতে অনেক রাত। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। কোনো শব্দ নেই। শুধু ক্ষীণ টিকটিক শব্দে সময়ের অলস মন্থর পদক্ষেপ।

পাড়াটাও প্রায় নিঝুম হয়ে এসেছে। শুধু অনেক দূর হতে রেডিও বা গ্রামোফোন-এর একটা অস্পষ্ট গান হাওয়ায় ভেসে আসে। কথা ভালো বোঝা যায় না। শুধু স্থর। তবে রবীন্দ্র-সংগীত যে তা' স্পষ্ট ধরা যায়।

ভালো ক'রে কান পাতলে অবশ্য কথাও কিছু কিছু বোঝা যায়। চিত্রাঙ্গদার গান।.হাওয়ার আনুকূল্যে ভাঙা-ভাঙা লাইন কানে আসে।—

"রোদন ভরা এ' বসন্ত, সখী

কখনো আসেনি বুঝি আগে।

মোর বিরহ বেদনা রাঙালো

কিংশুক রক্তিম রাগে।"

এর পর হাওয়া বোধ হয় একটু এলোমেলো বয়। কথা আর ঠিক বোঝা যায় না। একটু পরে আবার শোনা যায়।—

"দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে

একেলা বিরহী গাহে—"

আবার কথা অস্পষ্ট হয়ে যায়। শুধু স্থরটা ভেসে আসে। কিছু পর পুনরায় কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :—

"দেওয়া হলো না যে আপনারে

এই ব্যথা মনে লাগে।'

যৌবনভরা এ' বসন্ত, সখী
কখনো আসেনি বুঝি আগে ॥"

অতীনের কবিতার খাতায় বোধ হয় গোটা পনেরো কবিতা ছিল। অধিকাংশই সনেট জাতীয়। কিন্তু সুমিতা দু'ঘণ্টাতেও তা' শেষ করতে পারে না। সে একইভাবে তেমনি তন্ময় হয়ে পড়ে চলে।

ঢং ঢং করে বারোটা বেজে যায়। দূরাগত সেই সঙ্গীতের সুরও কখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোথাও জনপ্রাণীর আর সাড়াশব্দ নেই। মনে হয় নিকটে ও দূরে কেউ কোথাও জাগ্রত নেই। সব নিদ্রিত। রাত্রিও বুঝি তন্দ্রাচ্ছন্ন।

অতীন বেশ অস্বস্তি অনুভব করে। নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হতে থাকে। সে ঘন ঘন সুমিতার দিকে তাকায়। কী জানি কেন তার বুক দুরদুর করে।—সুমিতা কি বোঝে না এই গভীর নির্জন রাত্রে শুধুমাত্র তার উষ্ণ উপস্থিতিই অতীনের মনে কী বিপুল আলোড়ন তুলতে পারে!

আশ্চর্য, সে বোধ হয় এ'সব কিছুই বোঝে না। তাই নিশ্চিন্তমনে বসে বসে পড়েই চলেছে। রাত যে কত হয়েছে সে খেয়ালও নেই। সে হয়তো ভাবছে তার ঘরে গিয়ে পড়াও যা' এখানে বসে পড়াও তাই। কিন্তু সত্যি তো তা' নয়। অতীনের পক্ষে এটা মারাত্মক।

ক্রমে অতীন অনুভব করে,—না, আর সুমিতার এখানে থাকা উচিত নয়। এখন তার যাওয়াই ভালো! কয়েকবার ইতস্তত ক'রে তাই সে মৃদুস্বরে বলে,—'খাতাটা কিন্তু আপনি নিয়ে যেতে পারেন।'

এতক্ষণে যেন সুমিতার ধ্যান ভাঙে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর অতীনের মুখের দিকে একবার তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বিরস মুখে বলে,—'মাপ করবেন, আপনার ঘুমের বড় ব্যাঘাত ঘটালাম।'—ব'লে

অতীনকে কিছু বলার অবসর না-দিয়ে খাতাটা টেবিলের 'পরে তাড়াতাড়ি রেখে দ্রুতপদে সে ঘর হতে বার হয়ে যায়।

তার চলে যাওয়ার ভাব দেখে মনে হয় সে যেন এতক্ষণ যাওয়ার জন্যই অধৈর্য হয়ে বসে ছিল।

অতীন তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার বুক হতে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে কী যেন ভাবে। তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে।

নিজের লেখা নিজের কাছে যতই খারাপ মনে হোক, অপরের তা' কেমন লাগলো সে বিষয়ে কৌতূহল বোধ হয় সব সময়ই থেকে যায়। লেখার প্রথম যুগে এটা তো খুবই থাকে। অতীন নতুন লিখছে। এই তো অল্পদিন হলো তার লেখা ছাপা হচ্ছে। এ' কৌতূহল তারও আছে। বিশেষত তার কবিতা সুমিতার কেমন লাগলো তা' জানার আগ্রহ তার খুবই হয়।

পরদিন ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে ভাবে, তার কবিতা কেমন লাগলো সুমিতা তো কিছুই বললো না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

কিন্তু সকালে হঠাৎ সুমিতার ঘরে ঢুকতে তার সংকোচ হয়। নিজের ঘরে সুমিতা কখন কী অবস্থায় থাকে কে জানে। পর্দা সরিয়ে আচমকা ঢুকে সেদিনের মত যদি সে আবার বেকুব হয়! সেদিনের দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভাসে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার পথে তাই সে সুমিতাকে পাকড়াও করে। মুখে হাসি টেনে এনে বলে,—কৈ, কবিতা পড়ে কিছু তো বললেন না কেমন লাগলো?'

সুমিতা ভ্রূকুঁচকে একবার অতীনের দিকে তাকায়। তারপর

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবেগশূন্য গলায় গম্ভীরভাবে এককথায় শুধু বলে,—'ভালো।'

অতীন অন্তরঙ্গতার সুরে বলে,—'বেশ, শুধু ভালো বললে হয়? কেন ভালো তা' বলুন।'

বিরক্তভাবে সুমিতা বলে,—'কেন ভালো কী ক'রে বলবো? আমি কি কবিতার কিছু বুঝি?'—ব'লে সে তেমনি মুখ ফিরিয়ে অতীনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে তর তর ক'রে নিচে নেমে যায়।

ইদানীং অতীনের প্রতি সুমিতার ব্যবহার খুবই ভালো। তাই হঠাৎ আবার তার এই রকম আচরণে অতীন যেমন বিস্মিত হয় তেমনি আহতও হয়। ক্ষুব্ধ মনে ভাবে, এ'র মেজাজের কি কোনোই ঠিকঠিকানা নেই!

ক'দিন পরে তার মন আরো বিরূপ হ'য়ে ওঠে।

অনেকদিন আগের কথা। একবার একজনের বাগানে অতীন গাছ-ভর্তি গোলাপজাম ফুল দেখে খুব বিস্মিত হয়েছিল। এত সুন্দর গোলাপজাম ফুল! পাউডারের পাফ্-এর মত ঝুমকো ঝুমকো ফুলগুলি তার খুব ভালো লেগেছিল। মনে মনে সে সেই ফুল তার মানসীর খোঁপায় পরিয়েও দিয়েছিল। সে অবশ্য বহুকাল পূর্বের কিশোর-মনের কবি-কল্পনা।

এবারে রথের মেলায় এক জায়গায় গোলাপজামের চারা দেখে তার সেই ফুলের কথা মনে পড়ে। কী ভেবে সে একটা চারা কিনে আনে। এনে বাড়ির পিছন দিকে যেখানে একটি পেয়ারা গাছ আছে তা'র কিছু দূরে নিজের হাতে পুঁতে দেয়। মালীকে ব'লে দেয় যেন সে গাছটার যত্ন নেয়। তারপর হতে সে নিজেই প্রতিদিন গাছটার প্রতি লক্ষ্য রাখতো এবং প্রতিদিন দেখার ফলেই হয়তো গাছটার প্রতি তার একটা মায়াও জন্মে গিয়েছিল।

সেদিন সে যথারীতি গাছটা দেখতে এসে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়। দেখে গাছটা সেখানে নেই। মালীকে জিজ্ঞাসা করায় সে ভীতভাবে বলে যে দিদির হুকুমে গাছটা সে তুলে ফেলে দিয়েছে।

অতীন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করে,—'আমি পুঁতেছিলাম সে-কথা বলেছিলে?'

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি বললেন এটা তো ফলের বাগান নয়,—তাই এখানে ও'সব গাছ হবে না।'

অতীনের একবার ইচ্ছে হয় পেয়ারা গাছটা দেখিয়ে বলে,—ও'টা কিসের গাছ?—কিন্তু মালীকে আর কিছু বলতে তার প্রবৃত্তি হয় না। গম্ভীরভাবে সে চলে আসে। সে খুবই আঘাত পায়। তার মনে হয় এ'বাড়িতে সে যে একজন নগণ্য আশ্রিত এই কথাটাই সুমিতা তা'কে বারবার বুঝিয়ে দিতে চায়। সুমিতার কয়েকদিনের ভালো ব্যবহারেই সে যে সব কিছু ভুলতে বসেছিল সেজন্য সে নিজেকে কঠোর ভাষায় ভৎর্সনা করে। সে মনেমনে বলে,—আর নয়, ক'টা দিন যা'ক—ক'মাস বাদে ফাইনাল পরীক্ষাটা শেষ হ'লেই সে এখান থেকে চলে যাবে। মহামায়া যা-ই বলুন, এ'ভাবে এখানে থেকে নিজেকে আর সে অপমানিত হ'তে দেবে না। তা'র মনের মূঢ় দুর্বলতাকেও আর সে প্রশ্রয় দেবে না। এ'বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্কই এবার সে শেষ ক'রে দেবে।

ক[illegible] বাদে আরও একটি ঘটনা এ'সংকল্প তা'র আরো দৃঢ় করে।

সকাল গোটা এগারো বোধ হয় হবে। অতীন খাবার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পায় মহামায়া সুমিতাকে বল[illegible]ন,—'শানু, অতীনের ভাতটা তুই দে না। ঠাকুর একটু নিচে গেছে।'

সুমিতা বলে,—'আমি ভাত দিলে খাবে না। আমাকে ভীষণ ঘেন্না করে।'

—'কী বলছিস তুই! ঘেন্না করবে কেন?'

—'কেন করবে তা' জানো না?'—সুমিতা বোধ হয় অগ্নিদৃষ্টিতে মহামায়ার দিকে তাকায়। তারপর সেই অবস্থায় ঘর হ'তে বেরিয়েই দরজার কাছে অতীনকে দেখে একেবারে জ্বলে ওঠে।

—'আপনি আচ্ছা অসভ্য তো! আড়ি পেতে কথা শুনছিলেন?' —ব'লে সে দ্রুত নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

হঠাৎ অতীনের কী হয় কে জানে। সে একেবারে বোমার মত ফেটে পড়ে।—'শুনুন'—ব'লে সে দ্রুত সুমিতার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। —'অসভ্য আমি, না আপনি?—আড়ি পেতে কথা শোনা আমার স্বভাব নয়। আমি এখান দিয়ে আসছিলাম। আসতে আসতে আপনাদের কথা কানে গেছে। আপনি না-জেনে আমায় অসভ্য বললেন কেন?—কেন বললেন?'—রাগে সে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে। মনে হয় সুমিতাকে সে বোধ হয় মেরেই বসবে।

অতীনের এ'রকম রুদ্ররূপ সুমিতা এর আগে আর কখনো দেখেনি। ধনী বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে সে। এ'রকম ধমকও বোধ হয় সে কখনো কারো কাছে খায়নি। নিমেষে সে যেন কেমন হ'য়ে যায়। কম্পিত স্বরে বলে,—'আমায় মাপ করবেন। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'—থর থর ক'রে তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

ঝাপসা চোখে কোনক্রমে সে নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দেয়।

এই ঘটনার পর হ'তে সুমিতা প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে কোনো সময়েই অতীনের সঙ্গে আর কোনো কথা বলে না। একেবারে কথাবার্তা

বন্ধ ক'রে দেয়। খাওয়ার ঘরে, বারান্দায় বা বাগানে কোনো জায়গায় অতীনের সঙ্গে দেখা হলেই সে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

আবার সে প্রাক্-বিবাহ যুগের মত প্রতিদিন বিকেলে ড্রইংরুমে গিয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করে। বহুদিন পর আবার ড্রইং রুমে ভিড় বাড়ে। আবার তর্কে গল্পে হাসিতে সান্ধ্য আসর জমে ওঠে। আবার সে এখানে-ওখানে এর-ওর সঙ্গে বা'র হ'য়ে রাত ক'রে ফিরতে থাকে। মহামায়া শঙ্কিত হন। অরবিন্দও বিরক্ত হন। কিন্তু সুমিতা কোনো কিছুই গ্রাহ্য করে না।

সুমিতার এ'রকম আচরণ অতীন কখনো দেখিনি। এতদিন সে এখানে আছে, কখনো সুমিতাকে সে ড্রইং রুমে আসর জমাতেও দেখেনি, এ'র ও'র সঙ্গে বেড়াতে বা'র হ'য়ে রাত ক'রে বাড়ি ফিরতেও দেখেনি। সে ভাবে, সুজয় ডাক্তার কি আবার বিলেত থেকে ফিরলো নাকি?—যাক গে, ফিরুক গে। গোল্লায় যাক সুমিতা। তার কী? আর ক'মাস বাদেই তো সে এখান থেকে চলে যাবে।

সে-ও সুমিতার সঙ্গে কোনোরকম কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে না। সেও সুমিতাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এমনিভাবে দিন কাটে

মাস দুয়েক পরের কথা।

বিকেলে অতীন বাড়ি থেকে বা'র হ'চ্ছে। দেখে বাগানের পথের পাশে মোটা পাম গাছটার নিচে ঘাসের পরে সুমিতা ও লতিকা বসে-বসে গল্প করছে। কী জানি কেন লতিকা অনেকদিন এ'বাড়িতে আসেনি। অনেকদিন পর অতীন তাকে দেখলো। লতিকা অতীনকে দেখেই ডাকে,—'অতীনবাবু শুনুন।'

অতীনের কিন্তু কাছে যেতে ইচ্ছে হয় না। সে জানে সে কাছে গেলেই সুমিতা উঠে পড়বে। সুতরাং ওখানে গিয়ে কাজ কী। সে দূরে থেকে গম্ভীরভাবে বলে,—'মাপ করবেন। এখন সময় নেই। বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যাচ্ছি।'

লতিকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—'খুব সময় আছে। শীগ্‌গির আসুন।' —তারপর অতীন কাছে গেলে বলে,—'আপনার সাহস তো কম নয়। আমি ডাকছি আর আপনি বলছেন সময় নেই।'

অতীন বলে,—'মরিয়া হ'লে একটা বেড়ালও নাকি সাহস দেখায় শুনেছি। কিন্তু যাক সে-কথা। আপনাকে তো অনেকদিন দেখি না। কী ব্যাপার?'

লতিকা বলে,—'বিয়ের জন্য তৈরি হ'চ্ছি।'

—'বিয়ের জন্য তৈরি হচ্ছেন!'—অতীন হেসে ফেলে। তার মনটা হাল্কা হয়ে যায়। বলে,—'বিয়ের জন্যে আবার তৈরি হ'তে লাগে নাকি?'

—'লাগে না? বাবাঃ, কত কী লাগে!—তবে শেষপর্যন্ত বিয়ে করবো কিনা ঠিক নেই। কারণ যখনই মনে হচ্ছে একজন পুরুষকে বিয়ে করতে হবে তখনই বিয়ের সব ইচ্ছে একেবারে উবে যাচ্ছে।'

—'পুরুষের প্রতি এত বিরাগের কারণ?'

—'কারণ?—কারণ—পুরুষগুলো ভীষণ বোকা। স্পষ্ট ক'রে সব কথা না-বললে কিছু বোঝে না।—অথচ মেয়েরা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর কবিতার মত। পরিষ্কার ক'রে কিছুই বলে না। একটু আভাস, একটু ইঙ্গিত। একটু ইশারা, একটু সঙ্কেত। তা' থেকেই বুঝে নিতে হবে সব।'

হাসিমুখে অতীন বলে,—'যা' বলছেন তা' বোধ হয় বিয়ের পূর্বের অবস্থা। বিয়ের পর মেয়েরা এত লাউড যে তখন আর তাদের

তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাও বলা চলে না। ইস্তাহার বল্লেই বোধ হয় ঠিক হয়।'

লতিকা বলে,—'লাউড্ যেটা বলছেন সেটা তাদের কথা নয়। তারা অনেক কিছুই বলে বটে, কিন্তু তার মধ্যে যেটুকু না-বলা সেটাই তাদের কথা। অরসিক পুরুষ ব্যক্ত নিয়েই ব্যস্ত থাকে,—তাই অব্যক্তের সৌরভ কোনোদিনই পায় না।'

অতীন বলে,—'কী ব্যাপার! আপনিও যে রীতিমত কাব্য শুরু করলেন!—তা' যাক গে।—আপনি একটি বুদ্ধিমতী দেখে মেয়েই বিয়ে করে ফেলুন।'

লতিকা বলে,—'তা-ও ইচ্ছে হয় না। মেয়েগুলোও কোনো কাজের নয়। শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে পারে—আর কিছু পারে না।'—সে সুমিতার দিকে আড়চোখে তাকায়।

সুমিতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

এর পর দু'জনেই চুপ হ'য়ে যায়। কী জানি কেন চেষ্টা ক'রেও কেউ কথা খুঁজে পায় না। অবশেষে অতীন কী একটা বলতে যায়। কিন্তু বাধা পায়। দারোয়ান একটি অচেনা লোককে নিয়ে এসে হাজির হয়। লোকটির সঙ্গে আবার একটি আধ ভাঙা সাইকেল।

লোকটিকে শ্রমিক শ্রেণীর ব'লে মনে হয়। বয়স বোধ হয় বছর তিরিশেক হবে। চুল উসকো খুসকো। গায়ে একটা হাফ সার্ট।

অতীনকে হাত তুলে নমস্কার ক'রে বলে,—'আপনিই অতীনবাবু?'

অপরিচিত লোকটির দিকে চেয়ে কিছুটা বিস্মিত ভাবে অতীন বলে,—'হ্যাঁ।'

লোকটি সংক্ষেপে তা'র পরিচয় ও আসার কারণ বিবৃত করে।

কলকাতা থেকে মাইল পনেরো দূরের একটি স্থানের নাম করে সে।

সেখানকার একটি কারখানায় সে কাজ করে। দিন পনেরো হ'লো তা'দের কারখানায় ধর্মঘট চলছে। ধর্মঘট খুবই সাফল্যের সঙ্গে ও শান্তভাবে চলছিল। কোনোভাবে ধর্মঘট ভাঙতে না-পেরে শেষপর্যন্ত কারখানার মালিক ভাড়া-করা কয়েকটি গুণ্ডার সাহায্যে আজ গেটের সামনে উপবিষ্ট শান্ত ধর্মঘটীদের 'পরে হামলা চালায়। ফলে মারামারি লেগে যায়।

পুলিশ বোধ হয় অন্তরালে থেকে এরই সুযোগ খুঁজছিল। সঙ্গে সঙ্গে এসে ধর্মঘটীদের পরে লাঠিচার্জ শুরু করে। তা' সত্ত্বেও ধর্মঘটীরা মুখে গালাগালি দেওয়া ছাড়া পুলিশের প্রতি কোনো আক্রমণ চালায় নি। কারণ তারা বুঝেছিল যে বন্দুকধারী পুলিসের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে না।

কিন্তু কারখানার মালিক বোধ হয় আগে থেকেই একটা প্ল্যান ক'রে রেখেছিল। তাই এই সময় মালিক পক্ষের কয়েকটি গুণ্ডা দূর হ'তে পুলিসের প্রতি ইঁটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। সেই সঙ্গে একটা বড় পটকাও ছুঁড়ে মারে। ফলে পুলিস তিন রাউণ্ড্ গুলি চালায়। গুলি চালানোর ফলে ধর্মঘটিরা প্রায় অধিকাংশই পালিয়ে যায়। কিছু সংখ্যক লোককে গ্রেপ্তার ক'রে অতঃপর পুলিসও অন্তর্হিত হয়।

লোকটি বলে,—'আপনার বন্ধু বিনয় রায় আমাদের সংগঠনের কাজে আজ ওখানে গিয়েছিলেন। এই গুলি চালনার পর তাঁকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। খুব সম্ভব তিনি মারা গেছেন। তাঁর লাস ওরা গুম ক'রে ফেলেছে। আমাকে বিনয়বাবু একবার আপনার ঠিকানা দিয়ে ব'লেছিলেন তিনি যদি কোনো আন্দোলনের ফলে গ্রেপ্তার হন বা আহত হন, তা'হলে আপনাকে যেন জানানো হয়। আপনি নাকি সে-কথা জানানোর জন্য তাঁকে অনেক অনুরোধ করেছিলেন।—

যাইহোক, আমি পার্টি অফিসেও জানিয়েছি,—আপনাকেও জানালাম।'

শুনতে শুনতে অতীনের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়।—বিনয় মারা গেছে? বিনয় নেই! তা'র ফুসফুস দু'টো যেন কে জোর ক'রে চেপে ধরেছে মনে হয়। শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। কোনোক্রমে সে নিজেকে সংবরণ করে। বলে,—'আমাকে নিয়ে যেতে পারেন সেখানে? —এই তো মাইল পনেরো রাস্তা অর্ধেক পথ আপনি সাইকল্ করবেন, অর্ধেক আমি।'—সে উঠে দাঁড়ায়।

সুমিতা এতক্ষণ বিস্ফারিত চোখে সব শুনছিল। উত্তেজনায় সে-ও উঠে দাঁড়ায়। আতঙ্কিত হয়ে বলে,—'সে' গুলি-গোলার মধ্যে আপনি কোথায় যাবেন?'

অতীন বর্তমান সম্বন্ধে সচেতন হয়। তারা ছাড়াও আরও দু'জন নারী যে এখানে উপস্থিত সে-সম্বন্ধে অবহিত হয়। বলে,—'গুলি-গোলা কোথায়? সে তো কখন বন্ধ হ'য়ে গেছে। গুলি ক'রে যতখুশি মানুষ মারা তো পুলিসের উদ্দেশ্য নয়। পুলিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে আতঙ্ক সৃষ্টি ক'রে ধর্মঘটীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। তা' তারা ক'রে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোককে গ্রেপ্তার ক'রে কখন চলে গেছে। এখন আর কোনো ভয় নেই।'

ভীত কণ্ঠে সুমিতা বলে,—'আপনাকে তো ওরা গ্রেপ্তার করতে পারে।'

অতীন বলে,—'আমি বন্ধুর খোঁজ নিতে যাবো। আমাকে গ্রেপ্তার করবে কেন? আর যদি করেই তা' ব'লে আমি আমার মৃত বন্ধুর খোঁজ নিতে যাবো না!'

লতিকা বলে,—'অতীনবাবু, এখনই যাওয়ার কী দরকার? আপনার বন্ধু খুব সম্ভব ভালোই আছেন। তিনি যদি মারা যেতেন তা'হলে

নিশ্চয়ই তা' জানা যেতো। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় একজনকে গুম করা কি এতই সহজ? আর তা কেনই বা করা হবে?'

অতীন বলে,—'তা' আমি বলতে পারি না। এ'সব বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুবই সামান্য। তবে আমি শুনেছি এ'রকম নাকি হয়।—সে যদি অক্ষত থেকে থাকে তা'হলে খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আমার খোঁজ নিয়ে জানতে তো হবে!—লতিকা দেবী, যা'র মৃত্যু-সংবাদ এইমাত্র আমি শুনেছি সে যে আমার কী তা আপনি বুঝবেন না। তা'কে ছেলেবেলা থেকে জানি। সে আমাদের মত সাধারণ মানুষ নয়। শুধুমাত্র নিজের সুখ-দুঃখের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সে কোনোদিন আবদ্ধ রাখেনি। রাজনীতি তা'র নেশাও নয়, পেষাও নয়। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই তা'র সমস্ত রাজনৈতিক কর্মের উৎস।'—আবেগে অতীনের গলা থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে। আগন্তুক লোকটির দিকে সে এগিয়ে যায়।

সুমিতাও সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়। কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে,—'মাকে ব'লে যান। মাকে না-বলে যাবেন না আপনি। পায়ে পড়ি আপনার।'

কিন্তু অতীনকে এখনই যেতে হবে। এক মুহূর্ত দেরি করলে চলবে না। এ'তো আর কেউ নয়, এ যে বিনয়! নিমেষে বিনয়ের স্মৃতি-জড়িত জীবনের কত কথাই তা'র মনে পড়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেই সব ঘটনা মণি-মুক্তার মতই জীবনের সম্পদ। তার মতই উজ্জ্বল ও মূল্যবান।

মনে পড়ে একবার ছেলেবেলায় তারা অনেকে মিলে আম পাড়তে গিয়েছিল। সেখানে হঠাৎ একটি সাপ অতীনকে কামড়ায়। সাপ দেখে সকলেই ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। শুধু বিনয় পালায় নি। সে গাছের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে নিজের কাপড় ছিঁড়ে অতীনের

পা-টা বেঁধে ফেলে। তারপর পকেট থেকে ছুরি বা'র ক'রে ক্ষতস্থানটা আরও একটু চিরে বিনা দ্বিধায় মুখ দিয়ে টানতে থাকে।

তা'র সেই নির্ভিকতায়, তা'র সেই মহত্ত্বে অতীন সেদিন আবেগে একেবারে কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল,—'আমি তো মরবোই—তুইও যে মরবি বিনয়। তোর দাঁত ভালো নয়।'

বিনয় আশ্বাস দিয়ে বলেছিল,—'নারে, কোনো ভয় নেই। কিছু হবে না আমার। আর যদি মরিই তো মরবো। মরতে তো একদিন হবেই।'—ব'লে বিচিত্রভাবে হেসেছিল।

বিনয়ের রক্তমাখা ঠোঁটের সেই অদ্ভুত হাসি জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবে না অতীন। মনের পর্দায় আজো তা' স্পষ্ট, আজো তা' উজ্জ্বল।

বাষ্পোচ্ছ্বাসে অতীনের গলা বন্ধ হ'য়ে আসে। চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে সে সুমিতাকে বলে,—'আপনি মা'কে ব'লে দেবেন। কোনো ভয় নেই। আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবো।'

লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে সে দ্রুত বা'র হ'য়ে যায়।

বারো

সে-রাত্রে ফিরতে ফিরতে অতীনের প্রায় দুটো বেজে গিয়েছিল। বাড়ি ঢুকে সেই গভীর রাত্রেও সে নিচে থেকে স্থমিতার ঘরের আলো জ্বলতে দেখে। স্থমিতা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। খুব সম্ভব সন্ধ্যা থেকে নিচে-ওপর ক'রে সে শেষপর্যন্ত শ্রান্ত হ'য়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মহামায়াও খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন।

না, বিনয় মারা যায়নি। সে ভালোই আছে। গুলি-চালনার পর গুরুতর আহত একজন শ্রমিকের বাড়িতে সে খবর দিতে গিয়েছিল। তারপর সেখান থেকেই তা'র স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে সে গিয়েছিল হাসপাতালে। সেইজন্যই তা'কে কেউ খুঁজে পায়নি। আর তা'কে না-পেয়ে সেই মৃত্যু, পীড়ন ও বিভীষিকার সময় খারাপটাই সকলের মনে হয়েছিল। তাই গুজব রটেছিল যে সে মারা গেছে। তা'র লাস গুম করা হয়েছে।

সে-রাত্রেই অতীন মহামায়া ও স্থমিতাকে এই স্থসংবাদ দিয়েছিল।

স্থমিতা অবশ্য তারপর থেকে আবার অতীনের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করেছে। একদিনের অস্বাভাবিক ঘটনা শুধু কিছুক্ষণের জন্যই বোধ হয় তা'র প্রতিজ্ঞা শিথিল করেছিল। তারপর আবার পূর্ববৎ অবস্থা। আবার সে অতীনকে দেখলে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেয়। কাছে এলে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

অতীনের কিন্তু এখন আর এটা তেমন খারাপ লাগে না। বরঞ্চ একটা মধুর অনুভূতিতে তা'র চিত্ত সিক্ত হ'য়ে ওঠে। এটাকে তা'র আর ঘৃণা বা অবজ্ঞা ব'লে মনে হয় না। মনে হয় এটা নারী হৃদয়ের দুর্জয় অভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতীন ভাবে, ভালোবাসা ছাড়া কি অভিমান সম্ভব? কখনোই না। যেখানে যত প্রেম সেখানে তত অভিমান। সত্যিই তাই।

যতই সে এ'কথা ভাবে ততই সে অন্তরে এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে।

তাই সুমিতা তা'কে দেখে পিছন ফিরে দাঁড়ালে এখন আর সে চোখ ফিরিয়ে নেয় না। বরঞ্চ সুস্মিত দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকে।

এতদিনে এই মেয়েটির হৃদয়ের কিছু কিছু হদিস যেন সে পায়। বিনয়ের খোঁজ নিতে যাওয়ার সময় তা'র বিপদের আশঙ্কায় সুমিতার সে-দিনের সেই শঙ্কা, ভয়, ব্যাকুলতা,—তা'র ফেরার বিলম্ব দেখে তা'র সেই অস্থির উৎকণ্ঠা অতীনের চোখের পর্দা যেন অনেকখানি অপসারিত ক'রে দিয়েছে। অতীতের অনেক কিছুই এখন তা'র কাছে স্পষ্ট হয়। অথচ তা' যে খুব অস্পষ্ট ছিল তা-ও নয়। আসলে নারী-হৃদয় বা নারীচরিত্র সম্বন্ধে তা'র একেবারেই অভিজ্ঞতা ছিল না। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার কোনো সুযোগই সে পায়নি। সেইজন্য অনেক স্বচ্ছ জিনিষও সে ভালোমত বুঝতে পারেনি। অবশ্য এখনও যে সবকিছু ঠিক-ঠিক বুঝেছে এমন আত্ম-বিশ্বাস তা'র নেই। এখনো অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয়, আলো-আঁধারের অনেক লুকোচুরি।

অবশ্য এম-এ পরীক্ষার পর এ'বাড়ি ত্যাগ করার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করেছে। পূর্বের মত আবার সে এই বাস্তব সত্য অনুভব করেছে যে সুমিতাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ ক'রে দূরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ'বন্ধন থেকে কোনোদিনই হয়তো সে মুক্ত হতে পারবে না। মুক্ত হওয়ার সত্যিকার চেষ্টাও বোধ হয় তার নেই। এত যন্ত্রণাকর তবু কী মধুর এই বন্ধন!

সপ্তাহ খানেক হলো এম-এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কদিন বেশ পরিশ্রম গেলো। অতীন অবশ্য কোনোদিন পড়াশোনায় অবহেলা করেনি। প্রতিদিন নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে গেছে। সুতরাং পরীক্ষার ক'দিন পূর্বে সারা রাত জেগে প্রাণপণ ক'রে তা'কে পড়তে হয়নি। তা'হলেও কিছু বেশি পরিশ্রম তো করতে হয়েছেই,— সেই সঙ্গে কিছু দুশ্চিন্তাও ছিল। এখন মনটা হাল্কা হয়েছে। তা'র জীবনের একটা আশা পূর্ণ হলো। নির্ঝঞ্ঝাটে সে এম-এ টা পড়তে পেরেছে। ভালোভাবে পরীক্ষাও দিয়েছে। এখন কেমন ফল হয় কে জানে। তবে যতদূর মনে হয় ফার্স্ট ক্লাস সে পাবে।

দুপুর বেলা অতীন খেতে বসেছে। একটু তফাতে সুমিতাকেও খেতে দেওয়া হয়েছে। মহামায়া নিকটে বসে খাওয়ার তদারক করতে করতে বলেন,—'জানো অতীন, দেশের বাড়ি থেকে দু'একদিনের মধ্যেই আমার মা এখানে আসছেন। তিনি বেশ কিছুদিনের জন্য তীর্থ-দর্শনের সঙ্কল্প নিয়ে বাড়ি থেকে বা'র হচ্ছেন। এখানে দিন তিন চার থেকে তিনি সোজা কাশী চলে যাবেন। তারপর সেখান থেকে মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার ইত্যাদি সব ঘুরবেন।'

অতীন বলে,—'তাই নাকি? বেশ বেশ। স্টেশনে গিয়ে আমি দিদিমাকে নিয়ে আসবো। তাঁ'কে দেখার আমার খুবই আগ্রহ। আপনার মুখে তাঁর রূপের এত প্রশংসা শুনেছি যে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে বেশ একটা কৌতূহল জন্মে গেছে।'

মহামায়া বলেন,—'মায়ের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। এখন কি আর কিছু অবশিষ্ট আছে? তবু তুমি দেখলে বুঝতে পারবে আমি বাজে কথা বলিনি।'

অতীন বলে,—'সেটা আমি কিছুটা বুঝি। দিদিমার মেয়ে এবং তাঁরও মেয়েকে দেখলে সেটা অনায়াসেই আন্দাজ করা যায়।'

কথাটা শুনে সুমিতা ভ্রূকুঁচকে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ তা'র সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনোকিছুই যেন অতীন না বলে। তা' বলার অধিকার তার নেই।

অতীন একবার আড়চোখে সে-দিকে তাকিয়ে দেখে। অভিমানের এই বহিঃপ্রকাশটুকু তা'র ভারি মিষ্টি লাগে।

একটু থেমে সে আবার তা'র কথার জের টানে। হাসিমুখে মহামায়াকে বলে,—'তবে না-দেখেই বলছি, আমার মা কিন্তু আপনার মা'র চেয়েও দেখতে ভালো,—এ'কথা আপনাকে মানতেই হবে।'—সে স্মিতমুখে মহামায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মহামায়া একটু অপ্রতিভ হন। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তাঁর। তারপর হঠাৎ বলেন,—'আচ্ছা অতীন, তুমি কি সত্যিই আমাকে মায়ের মত ভালোবাসো?'

এবার অতীন অপ্রতিভ হয়। এমন প্রশ্ন সে আশা করেনি। একটু ইতস্তত ক'রে বলে,—'অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন মেয়েরা নাকি বাস্তব সত্য সহ্য করতে পারেন না। মধুর মিথ্যেই পছন্দ করেন। এবং অবিরত সেই মিথ্যে নিজেকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে মিথ্যের রসে একেবারে জারিত হয়ে থাকেন।—আমার অবশ্য এ'রকম কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাই সত্যি কথাই বলি। আমার মনে হয় মায়ের প্রতি সন্তানের যে ভালোবাসা একেবারে সেইরকম ভালোবাসা শুধুমাত্র শৈশবেই জন্মায়। পরে আর সে-রকম হয় না। নিজেকে এবং অপরকে ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছে না-থাকলে এ'কথা স্বীকার করতেই হবে। তবু মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে,—এ'ক্ষেত্রে কি এটা একেবারেই নির্ভেজাল সত্য?'

মহামায়া বোধ হয় অতীনের এত বিশ্লেষণ ও এত কথার মারপ্যাচ অনুধাবন করতে পারেন না। বলেন,—'মেয়েরা কিন্তু যে-কোনো বয়সে সন্তানের মত ভালোবাসতে পারে।'

অতীন বলে,—'হ্যাঁ, তা' হয়তো পারে। তবে তা'র কারণও আছে।'

মহামায়া সে-কথা ভালো ক'রে শোনেন কিনা কে জানে। তিনি কিছুক্ষণ আনমনা থাকেন। তারপর বলেন,—'যাক্ ও'সব কথা। যে-কথা বলছিলাম। তুমি আর শানু দু'জনেই এখানে আছো। বলি।— জানোতো তোমাদের বিয়ের সময় আত্মীয়-বন্ধু কারোকেই কিছু জানানো হয়নি। মাকেও জানাইনি। কেন যে জানাইনি সে তো তিনি জানেন না। তাই পরে তিনি আমায় চিঠিপত্রে অনেক অনুযোগ-অভিযোগ করেছেন। রাগ করে লিখেছেন এখানে আর কোনোদিন আসবেন না। বস্তুত আসেনওনি তারপর আর। অথচ তাঁর ভালোর জন্যই তাঁ'কে এ'সব জানাইনি। তাঁকে সব কথা জানাতে অন্তত এখন আমার আর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু জানলে তিনিই কষ্ট পাবেন। বুড়ো মানুষকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে হয় না। যে-ক'টা দিন তিনি এখানে থাকবেন সকলে একটু সাবধানে চললেই হবে।'— তারপর একটু থেমে আবার বলেন,—'ছাখো অতীন তোমার স্বাধীনতায় কোনোদিন আমি হস্তক্ষেপ করিনি। আজও করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বুড়ো মানুষকে কষ্ট দিতে আমার মায়া লাগে। তাই তোমার কাছে আমার অনুরোধ…'

বাধা দিয়ে অতীন বলে,—'আপনি অমন ক'রে কেন কথা বলছেন মা? কী করতে হবে বলুন। আমি সানন্দে রাজী।'

ম্লান কণ্ঠে মহামায়া বলেন,—'কী আর বলবো। শুধু দেখো যেন

তিনি কিছু বুঝতে না-পারেন। যে-ক'টা দিন তিনি এখানে থাকবেন সে-কটা দিন তোমরা এক ঘরেই থেকো। আর নিজেদের আপনি-আপনি ক'রে কথা বোলো না।'

তাই তো,—অতীন এ'কথা তো ভাবেনি! সে খুবই চিন্তিত হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে একটা মধুর আনন্দও অনুভব করে।—কিন্তু একি সম্ভব? সুমিতার সঙ্গে কথা নয় সে দিদিমার সামনে একেবারেই বলবে না। তা'হলেই তুমি বলার দায় এড়ানো যাবে। কিন্তু এক ঘরে রাত্রি যাপন?—অসম্ভব। তা' সে পারবে না। সে ব্যাকুলভাবে মহামায়ার দিকে তাকায়। কিন্তু তাঁর ম্লান উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চেয়ে কিছুই বলতে পারে না। মাথা নিচু করে সে ভাবে। থালার ওপর আঙুল দিয়ে হিজিবিজি কাটতে থাকে।

উদ্বিগ্নভাবে মহামায়া বলেন,—'কী বাবা, কিছু বলছো না যে!'

অতীন মহামায়ার দিকে পলকের জন্য তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করে। অনেক কথা তার মনে হয়। দু'তিনটে দিন হয়তো সে কোনোরকমে চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সে যদি এ' প্রস্তাবে রাজী হয় তাহলে সুমিতা কী ভাববে? সে হয়তো ভাববে অতীন এই সুযোগটা গ্রহণ করছে। ছি ছি।—

সে অসহায়ভাবে আবার মহামায়ার দিকে তাকায়।

মহামায়া তার মনের অবস্থাটা বোধ হয় কিছুটা বুঝতে পারেন। ম্লান কণ্ঠে বলেন,—'সবই আমি বুঝতে পারছি। তোমাকে এ'কথা বলতেও আমার খুব সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু কী করি বলো, মাকে হঠাৎ যদি এখন সমস্ত কথা বলি, এই বুড়ো বয়সে তাঁর মনের অবস্থা যে কী হবে—' মহামায়া কথাটা আর শেষ করতে পারেন না। চুপ ক'রে যান।

মিনিটখানেক কেউ কোনো কথা বলে না। চুপচাপ কাটে।

অতীন মহামায়ার অবস্থাটা বুঝতে পারে। মহামায়ার দুশ্চিন্তার কারণ হওয়ার জন্য নিজেকে তার কেমন অপরাধী মনে হয়। কী যেন চিন্তা করে সে। তারপর সব দ্বিধা কাটিয়ে বলে—'আচ্ছা, বেশ তাই হবে। উনি যদি রাজী থাকেন, আমার দিক হতে কোনো আপত্তি নেই।'—সে সুমিতার দিকে মুখটা ফেরায়।

সুমিতা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। মহামায়া বলেন,—'কী, উঠছিস যে? বোস একটু। কথা আছে। তোর কোনো আপত্তি নেই তো?'

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুমিতা বলে'—'আপত্তি নেই মানে!—এ' হতে পারে নাকি?—আমার পক্ষে এই অভিনয় করা সম্ভব নয়।—আমি অভিনয় করতে পারি না।'

মহামায়া বলেন,—'দু' তিনটে দিনের তো ব্যাপার। এই দুটো দিন একটু কষ্ট করতে পারবি না?'

—'কষ্টের ব্যাপার তো নয় এটা। অনেক অসুবিধা আছে।'

—'মানলাম অসুবিধা আছে। কিন্তু তোর দিদির জন্যে সেটুকু সহ্য করতে পারবি না? বুড়ো মানুষকে দুঃখ দেওয়া কি ঠিক?'

একটু ইতস্তত ক'রে সুমিতা বলে,—'আমার মনে হয় যা সত্যি তা' তাঁর জানা উচিত। এতে এমন দুঃখ পাওয়ার কী আছে তাতো বুঝি না।'

—'তুই যদি দিদি হতিস তাহলে বুঝতে পারতিস একমাত্র নাতনির দুঃখ কেমন ক'রে বুকে বাজে।'

সুমিতা রাগ করে বলে,—আমার দুঃখটা কিসের শুনি? আমি তো বেশ সুখেই আছি।'

মহামায়া বলেন,—'বেশ, মানলাম যে তুই সুখেই আছিস। কিন্তু মা সেকেলে মানুষ। তাঁর কাছে সেকেলে সুখদুঃখের মানে অন্য।'

সুমিতা মাথা নেড়ে বলে,—'তা' আমি কী করবো ? আমার পক্ষে এ' সম্ভব হবে না।'—সে প্রস্থানোদ্যত হয়।

মহামায়া তার হাতটা চেপে ধরেন। অনুনয়ের সুরে বলেন,—'শোন একটু শোন। লক্ষ্মী মা আমার। আর গোলমাল করিস নে। এইক'টা দিন একটু মানিয়ে চল। তোর দিদির কথাটা একটু ভাব।—তোর দিদি যে তোকে কত ভালোবাসে তা' তো তুই জানিস না। তুই যখন হোস তখন তোর দিদির সে কী আনন্দ! আমার তখন মন ভালো নয়। মাস ছয়েক আগে খোকা চলে গেছে। তোকে কোলে নিলেই খোকার কথা মনে পড়তো। বুকটা কেমন ক'রে উঠতো। খালি কাঁদতাম। মা কত বোঝাতেন। বলতেন,—তাকে ভগবান নিয়ে গেছেন। তার জন্য আর কেঁদে কী করবি ?—এই ছাখ ভগবান আবার লক্ষ্মী প্রতিমা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর হেলা ফেলা করিসনি।—তিনি কত কথা বলতেন। তোকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু এমনই আমার কপাল, সব হয়েও কিছু হলো না।'—বলতে বলতে মহামায়ার গলাটা ধরে আসে। তিনি আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন।

সুমিতা বিব্রত বোধ করে। বলে,—'বাবারে বাবা! কান্নাকাটি তোমার থামাও দেখি। তুমি যা' বলছো তা-ই হবে। বুঝেছো!—তবে একটা কথা, দু'তিন দিনের বেশি আমি এই অভিনয় কিছুতেই চালাতে পারবো না, তা' তোমায় আগেই জানিয়ে রাখছি।'—সে ঘর হতে দ্রুত বার হয়ে যায়।

ম-ামায়ার মা সরোজিনীকে [illegible] গিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসার সুযোগ আর অতীনের হয় না। নির্দিষ্ট দিনের একদিন পূর্বেই তিনি এসে উপস্থিত হন। দিন ভালো ছিল না ব'লে একদিন আগেই

নাকি রওনা হয়েছিলেন তিনি। দিন অবশ্য মাসখানেক পূর্বেই পণ্ডিত দিয়ে স্থির ক'রে রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষকালে নাকি হঠাৎ জানা যায় ঐ দিনে কী একটা দোষ আছে। তাই এই যাত্রার দিন পরিবর্তন। যে-জন্য তাঁর বার হওয়া তা'তে ভালোভাবে দিনক্ষণ না-দেখে তো আর বার হওয়া যায় না!

সরোজিনীকে দেখলে মহামায়ার মা ব'লে চিনতে এতটুকু কষ্ট হয় না। এখনো তাঁর হাতির দাঁতের মত ফর্সা ধবধবে গায়ের রঙ। এত বয়স হয়েছে তবু একটিও দাঁত পড়েনি। চুল অধিকাংশই কালো। শুধু বয়সের ভারে শরীর কিছুটা স্থূল হয়েছে। গরদের থান পরা তাঁর শান্ত মূর্তি সকলেরই সম্ভ্রম আকর্ষণ করে।

তিনি পৌঁছানোমাত্র বাড়িতে যেন উৎসব শুরু হ'য়ে যায়। ঝি-চাকর থেকে শুরু ক'রে সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়। তিনি সকলের জন্য কাপড় ও মিষ্টি এনেছিলেন। একে একে নিজের হাতে সকলকে তা' দেন। শুধু অরবিন্দ বাড়ি না-থাকায় তাঁর কাপড়টা তিনি তুলে রাখেন।

প্রায় পাঁচ বছর পর তিনি এ' বাড়িতে এলেন। পুরোনো ঝি-চাকরদের সব কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ক'রে একে একে তাদের তিনি বিদায় দেন। অতীন, সুমিতা, মহামায়া, সকলের চিবুক ধ'রে ধ'রে তিনি চুমু খান। গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দিয়ে আদর করতে থাকেন। বহুদিন পর মেয়ে, নাতনি, নাতজামাই-এর মধ্যে এসে তিনি যে বেশ সুখী হয়েছেন তা' স্পষ্ট বোঝা যায়।

অতীনকে দেখে তিনি খুবই খুশী হ'য়ে ওঠেন। মহামায়াকে বলেন,—'তোর তো খুব সুন্দর জামাই হয়েছে মায়া! এতদিনে আমি বুঝলাম তুই কেন আমায় তোর মেয়ের বিয়ের কথা প্রথমে জানাসনি।

তোর ভয়—এমন সুন্দর তোর জামাই দেখে আমি হয়তো ভাগ বসাবার চেষ্টা করবো। তাই না? তা' ভয় তোর একেবারে মিথ্যেও নয়। এমন ছেলে দেখলে কা'র না লোভ হয়? তীর্থে গিয়ে এখন আমার মন টি'কলে হয়।'

তারপর সুমিতার মাথায় ঘোমটা নেই দেখে সস্নেহে বলেন,—'মাথায় কাপড় দিসনি যে খুকু! একেবারে মেম-সাহেব হয়েছিস?——কী বিশ্রী যে লাগে দেখতে।'

সুমিতা তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দেয়। রাগ ক'রে বলে,—'আমায় খুকু বলছো কেন? আমার নাম খুকু নাকি?'

সরোজিনী হেসে বলেন,—'ইস্, ঝাঁঝ ভাখো মেয়ের!—তা' তোর যতদিন খোকাখুকু না-হয় ততদিন আমাদের কাছে তুই খুকু নয়তো কী?'—তারপর মহামায়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করেন,—'তোর মেয়ে কি পোয়াতি নাকি মায়া?'

মহামায়া নতমুখে শুধু বলেন,—'না।'

—'না? এখনো হয়নি!'—বিস্মিত চোখে সরোজিনী সুমিতার আপাদমস্তক লক্ষ্য করেন।

লজ্জায় সুমিতা আকণ্ঠ রাঙা হ'য়ে ওঠে। পালাবার জন্য তাড়াতাড়ি সে উঠে দাঁড়ায়। কে জানে এরপর আবার কী বলবে বুড়ি!

সরোজিনী বলেন,—'এই উঠে পালাচ্ছিস যে বড়। বোস শিগ্‌গির। বুঝেছি সব সাহেব-মেম হয়েছো। বুড়ি থুড়থুড়ি না-হলে আর ছেলেপুলে হওয়া পছন্দ করো না। কী যে হয়েছে আজকাল। ধাড়ি ধাড়ি মেয়ের সব কোল খালি। দেখলে গা জ্বালা করে।—আহা দাঁড়িয়ে রইলি কেন,—বোস না।,

কী আর করে সুমিতা, অগত্যা আবার বসে পড়ে। অনভ্যাসের

ফলে তার ঘোমটা বারে বারে খ'সে পড়তে থাকে। বারে বারে সে মনোরম ভঙ্গিতে তা' মাথায় টেনে দেয়।

অতীন চেয়ে চেয়ে দেখে। ঘোমটা দিলে তো ভারি সুন্দর দেখায় সুমিতাকে! এ' আর এক অন্য রূপ তা'র। এ' রূপ যেন অতীন আর কোনোদিন দেখেনি। কেমন মা-মা মনে হয় সুমিতাকে। সমস্ত মুখে চোখে যেন তার তরুণী মায়ের স্নিগ্ধ সুষমা। সুমিতার এই রূপ যেন আরো তীব্রভাবে আকর্ষণ করে অতীনকে। মুগ্ধ হ'য়ে সে চেয়ে থাকে।

অতীনের এই মুগ্ধ দৃষ্টি সরোজিনীর চোখ এড়ায় না। তিনি খুবই প্রীত হন। বলেন,—'বৌ-এর দিকে তো হাঁ ক'রে চেয়ে আছো খোকা, এখন আমার কথার জবাব দাও দিকি।—তুমিই বুঝি চাওনা এখন ছেলেপুলে হোক।'

অতীন একটু অপ্রতিভ হয়। কিন্তু তাড়াতাড়ি সে-ভাব কাটিয়ে নিয়ে বলে,—'আমি ছেলেপুলে চাই না! কী যে বলেন দিদিমা। আজ যদি আমার চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটা ছেলে থাকতো তাহলে যে কী হ'তো তা' শুধু আমিই বুঝি।'

সরোজিনী হেসে ফেলে বলেন,—'হ্যাঁ, তোমার চেয়ে বয়সে বড় যদি তোমার ছেলে থাকতো।—দুষ্টুমি আছে ষোলো আনা। তা' ছেলে যদি চাও তো ছেলেপুলে হয় না কেন? মনে হচ্ছে কোনো কাজের নও তুমি। আচ্ছা, আজ রাত্রে আমি আড়ি পেতে দেখবো তুমি কী করো।'

বিরক্ত হয়ে সুমিতা বলে,—'তোমার এই অশ্লীল কথাবার্তাগুলো বন্ধ করবে দিদি? তোমার গেঁয়ো রসিকতা শুনে মা কখন্ উঠে পালিয়ে গেছেন।'

সরোজিনী হাসিমুখে বলেন,—'আমি তো গেঁয়োই, তোরা তো খুব সহুরে! আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়ে আগে হোক। তারপর দেখিস তোর মা কীভাবে কথাবার্তা বলে।'

দিনটা একরকম ক'রে কেটে যায়। সমস্যা দেখা দেয় রাত্রে শোয়া নিয়ে। ঠিক হয়েছে সুমিতার ঘরেই শোয়া হবে। অতীনের ঘরটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে মনে হয় এ ঘরে সে শুধু পড়াশোনাই করে,—শোয় না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অতীন একা একা সসংকোচে সুমিতার ঘরে এসে ঢোকে। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে।—সুমিতা তখনো ফেরেনি। তা'র খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়নি হয়তো। অতীন চুপচাপ বসে থাকে। বেশ লাগে। এ' ঘরের সমস্ত কিছুতেই সে সুমিতার সৌরভ অনুভব করে। সে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। একপাশে আলনায় রক্ষিত শাড়ি ব্লাউজ হ'তে আরম্ভ ক'রে সুমিতার অতি সামান্য জিনিষও তার চোখে রমণীয় মনে হয়। সামনে টেবিলের 'পরে একটি খাতার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে। খাতার 'পরে সুমিতার নিজের হাতে লেখা নাম। হাতের লেখা সুমিতার মোটেই ভালো নয়। বড় বড়, সোজা সোজা। কাঁচা হাতের লেখা। সে যে এম, এ, পর্যন্ত পড়েছে হাতের লেখা দেখলে তা' মনে হয় না। তবু সেই লেখাই অতীনের কী যে ভালো লাগে তা বলার নয়। হাঁ করে সেই সামান্য লেখাটুকুর দিকেই সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর সুমিতা এসে ঘরে ঢোকে। সামান্য ইতস্তত ক'রে সংকোচের সঙ্গে সে বলে,—'আপনি একটু বাইরে যাবেন,—আমি কাপড়টা ছাড়বো।'

অতীন উঠে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। সুমিতা দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়। অল্পক্ষণ পরে সে আবার দ্বার খুলে মৃদুস্বরে বলে,—'এবার আসতে পারেন।'

অতীন আবার ঘরে ঢোকে। সে চেয়ে দেখে যে-রাত্রে সুমিতা কবিতা পড়তে এসেছিল সে-রাত্রে সে যেমন সেজেছিল আজ তার চিহ্ন মাত্র নেই। নেই সেই সযত্নরচিত কবরী, নেই আয়ত চোখের কোনে সুর্মার এতটুকু ছোঁয়া। হয়তো সে শুধু শাড়িটা বদলেছে, আর হয়তো ভেতরের আঁট জামাটা।

সুমিতা কথা বাড়ায় না। বলে,—'নিন আপনি খাটে শুয়ে পড়ুন। আমি নিচে মাদুর পেতে শুচ্ছি।'

অতীন বলে,—'সে কী, আপনি মাদুর পেতে শোবেন কেন? আমিই নিচে শুই।—আপনার অভ্যাস নেই; কষ্ট হবে। আমি প্রায় সারা জীবনই মাদুর পেতে শুয়েছি। আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

অকস্মাৎ সুমিতার দুই চোখ জ্বলে ওঠে। বলে—'আমার বাবা কিছু বেশি উপার্জন করেন ব'লে আপনি কি মনে করেন যে আমি মেয়েছেলে নই?'

অতীন অবাক হয়। এ কথার কোনো তাৎপর্যই সে বুঝতে পারে না। একটু অপ্রতিভ হয়ে বলে,—'আমি তো সে-কথা বলিনি। আমি বলছিলাম আপনার অভ্যাস নেই। হয়তো ঘুমতে পারবেন না।'

তেমনি চাপা উত্তেজনার সঙ্গে সুমিতা বলে,—'আমি কী পারি না পারি কোনোদিন কি তা' লক্ষ্য করে দেখেছেন?'

এই বা কী রকম উত্তর! অতীন চুপ করে যায়। ও' বিষয় নিয়ে

আর ঘাঁটায় না। সুমিতার কথাই মেনে নেয়। বলে,—'বেশ আমি খাটেই শুচ্ছি। তবে আপনি ঐ মাদুরের ওপর একটা তোষক পেতে নিন। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।'

সুমিতাও আর কথা বাড়ায় না। খাট থেকে একটা পাতলা তোষক বা'র করে মাদুরের ওপর পেতে তাড়াতাড়ি তার শয্যা রচনা ক'রে নেয়। তারপর অতীনের দিকে তাকিয়ে বলে,—'নিন শুয়ে পড়ুন এবার। কোনো দ্বিধা করবেন না। চাদর, বালিশের ওয়াড়,—কিছুই আমার ব্যবহার করা নয়। সব নতুন কাচানো।'—ব'লে সে তাড়াতাড়ি আলোটা নিবিয়ে দেয়।

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে অতীন ভাবে, চাদর সুমিতার ব্যবহার করা নয় এ' কথা সে বললো কেন? সুমিতার ব্যবহার-করা চাদর হ'লে কি অতীনের খারাপ লাগতো? কিছুই কি বোঝে না সুমিতা?

অতীনের ঘুম আসে না। চুপচাপ শুয়ে থাকে। এই নির্জন রাত্রে একই ঘরে মাত্র কয়েক হাত দূরে সুমিতা শুয়ে আছে এই অনুভূতি তা'র অন্তরে এক অভূতপূর্ব সুখের স্পর্শ এনে দেয়। এই সান্নিধ্যের তীব্রতা তা'র সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত ক'রে রাখে। কিছুতে ঘুমতে পারে না। নানা চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। তার এই অদ্ভুত বিবাহিত জীবনের সব কথা আগাগোড়া মনে পড়ে। অকস্মাৎ তার মনে হয় তার জীবন কি এইভাবেই অতিবাহিত হবে?—এই ভাবেই একদিন শেষ হয়ে যাবে?—যে-মেয়েকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসে এবং যে-মেয়ে হয়তো তা'কেও ভালোবাসে, তা'কে কি কোনদিন সে পাবে না? এমনিভাবেই সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে?—কেন—কেন তা' হবে?

ঘণ্টা খানেক এমনি চিন্তার যন্ত্রণা ভোগ ক'রে অবশেষে অতীন

বিছানার 'পরে উঠে বসে। তারপর বেড-সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দেয়।

কাপড়-চোপড় ঠিক করতে করতে সুমিতাও উঠে বসে। বিস্মিত হয়ে বলে, 'কী হলো ?'

অতীন বলে,—'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

—'এখন ?'

—'হ্যাঁ, এখন। আপনি একটু বসুন এখানে।'—ব'লে অতীন খাটের একটা কোন দেখিয়ে দেয়।

সুমিতা কিন্তু খাটের পরে বসে না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। এই সামান্য কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার ফলেই তা'র চুল কিছু উসকো খুসকো হয়ে গেছে। তা'তে তা'কে আরো যেন সুন্দর দেখায়। অতীনের ইচ্ছে হয় ঐ চুলের 'পরে হাত রেখে সুমিতাকে সে একটু আদর করে।—কিন্তু সে অধিকার কি তা'র আছে ?

সুমিতা বলে,—'বলুন—কী বলবেন।'

অতীন ইতস্তত করে। বার কয়েক গলা পরিষ্কার করে। তারপর একরকম মরিয়া হয়েই ব'লে ফেলে,—'আমাদের জীবন কি এইভাবেই চলবে ?'

—'অর্থাৎ ?'

—'অর্থাৎ আমাদের জীবনে এই বিচ্ছেদই কি একমাত্র সত্য হবে ?'

—'ক্ষতি কী !'

—'জীবনকে সফল করার সব রকম উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের জীবন এ'ভাবে ব্যর্থ হবে ?'

সুমিতা বলে,—'আমার জীবন তো একরকম কেটেই গেলো। বাকী ক'টা দিনও একরকমভাবে কেটে যাবে।—তবে আপনার জীবন

ব্যর্থ হবে কেন? আপনি অনায়াসেই আপনার জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারেন। আপনি আবার বিয়েও করতে পারেন। সব রকম স্বাধীনতাই তো আপনার আছে।'

আবেগের সঙ্গে অতীন বলে,—'কিন্তু এ স্বাধীনতা তো আমি চাই না। যা'কে ভালোবাসি, সমস্ত অন্তর যা'কে চায়,—সব স্বাধীনতার বিনিময়ে তা'কেই শুধু আমি চাই।'

সুমিতা মুখ নীচু ক'রে বলে,—'আপনি জানেন না, এটা ঠিক আপনার অন্তরের কথা নয়। আজ দিদি এখানে আসায়, এই একঘরে থাকতে বাধ্য হওয়ায়,—এই পরিবেশের প্রভাবেই আপনার ও' কথা মনে হচ্ছে। কাল সকালেই আপনি আবার ও' সব ভুলে যাবেন।'

অতীন বলে,—'না, কাল সকালে ভুলে যাওয়ার মত কথা এ'টা নয়। দিনে দিনে তিলে তিলে একথা আমার মনে জমা হয়েছে। শুধু সাহসের অভাবে এতদিন বলতে পারিনি।'

—'সাহস?—আমার সঙ্গে কথা বলতে হ'লে সাহস দরকার হয়? এত খারাপ আমি?—অবশ্য হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমি কয়েকবার খুবই খারাপ ব্যবহার করেছি। সেজন্য আমি ক্ষমাও চাইছি।—কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা। তখন অপনাকে আমি চিনতামও না,—আমার মনের অবস্থাও স্বাভাবিক ছিল না। সে-দিনের সেই দেহমনের পরিচয়ই কি আমার সব পরিচয়?'

অতীন বাধা দিয়ে বলে, 'না না, আমি ও' কথা বলতে চাই নি। আসলে আমি নিজেই একটু ভীতু প্রকৃতির।'

—'ভীতু? আপনি ভীতু প্রকৃতির?'—সুমিতা একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসে।—'কোনোদিন কোনো সময়ে আপনার মধ্যে এতটুকু ভয়ের লক্ষণ আমি দেখিনি।'

অতীন বলে,—'সে-ধরণের ভয়ের কথা আমি বলিনি।'—

বাধা দিয়ে সুমিতা বলে, 'থাক্ এ সব কথা। অনেক রাত হয়েছে। আপনি শুয়ে পড়ুন।'—বলে সে একরকম জোর করেই সব কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে আবার আলো নিবিয়ে দেয়।

অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুব্ধ চিত্তে কিছুক্ষণ বসে থাকে অতীন। তারপর ভাঙা গলায় প্রশ্ন করে, 'তাহলে আমাদের জীবনে এ বিচ্ছেদ কি কোনোদিনই শেষ হবে না?'

অন্ধকার ভেদ করে সুমিতার সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে,—'না।'

অতীনও শুয়ে পড়ে। আবার চিন্তার সমুদ্র। আহত মনে সে ভাবে, সুমিতা তা'কে প্রত্যাখ্যান করলো? সুমিতা কি সত্যিই তা'কে চায় না? সত্যিই তা'কে ভালোবাসে না? সুমিতা যদি তা'কে সত্যিই না চায় তাহলে একটু আগে ও'কথা বলবে কেন যে,—এটা আপনার অন্তরের কথা নয়, একঘরে রাত্রি যাপনের জন্যই আপনার এ'রকম মনে হচ্ছে, কাল সকালেই হয়তো সব ভুলে যাবেন;—এ'কথার অর্থ কী?—আর ভালোই যদি সে না বাসে তাহলে সেদিন সন্ধ্যায় সে যখন বিনয়ের খবর নেওয়ার জন্য সেখানে যেতে উদ্যত হয়েছিল তখন কেন সুমিতা অত ভীত, উৎকণ্ঠিত ও অস্থির হয়েছিল?—ভালো সে নিশ্চয়ই বাসে। তাকে সে চায়ও। তারা দু'জনই পরস্পরকে ভালোবাসে ও পরস্পরকে চায়।

তাহলে? তাহলে কেন তাদের জীবন মিলনের মধ্যে দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে না? কী সে বাধা? কী সে অন্তরায়? কী? কী!

যাই হোক-না-কেন, 'সেই মিথ্যে বাধার প্রাচীর কি কোনোদিন ভাঙবে না?

অতীনভাবে, আসলে সভ্য মানুষের সবকিছুই বড় জটিল, বড় অসরল। তারা যদি সভ্য মানুষ না হ'য়ে অসভ্য বন্য হতো তাহলে তাদের এই মিলনের পথে কোনো কিছুই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না। অসভ্য ও আদিম কামনার তীব্র বেগ সবকিছুই গুঁড়িয়ে উড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।—সে যদি সত্যিই বর্বর যুগের বন্য মানুষ হতো তাহলে এই যে কয়েক হাত দূরে শায়িত সুন্দরী যুবতী মেয়েটি,—যাকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে কামনা করে,—তার ওপর কি বলপ্রয়োগ করতো না?—নিশ্চই করতো। এবং তার ফলে হয়তো সব সমস্যাও সঙ্গে সঙ্গে মিটে যেতো।

কিন্তু আজ? শিক্ষিত সুসভ্য সে কি আজ তা' পারে? আজ কি তাতে সে সুখী হবে? তার মনের গভীর তৃষ্ণা কি তাতে মিটবে,—যে-তৃষ্ণা সূর্যমুখীর মত অবিরত উর্দ্ধমুখী? যে-তৃষ্ণায় তার সমস্ত হৃদয় বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনের মত সন্তপ্ত,—সে-তৃষ্ণা কি তাতে যাবে? না না, কিছুতে যাবে না।

তার সমস্ত অন্তর যা' চায়,—সুমিতার সেই ভালোবাসাতেই এখনো তার মনে সন্দেহ, এখনো সংশয়। যদি সুমিতা তাকে সত্যিই ভালো না বাসে তাহলে প্রেমহীন শুধু কয়েকটি উত্তেজিত অন্ধ মুহূর্তের দেহ-সম্ভোগে কী পাবে সে? কিছু না, কিছু না। সে তো কামোন্মত্ত রিরংসু বর্বর নয়, প্রেমের জন্যই তার সমস্ত প্রাণে গভীরতম তৃষ্ণা।

পর মুহূর্তেই অতীন আবার ভাবে,—কিন্তু সুমিতা তো তাকে ভালোবাসে। তার অভিমানাহত ফল্গু প্রেমের কত প্রমাণ সে পেয়েছে। কিন্তু তবু তার সংশয় যায় না কেন?—কেন—কেন?

অতীন কল্পনা করে, এই নির্জন অন্ধকার রাত্রে সুমিতা যদি একবার স্বেচ্ছায় নিমেষের জন্যও তার একটি হাত তার হাতের 'পরে এনে

রাখতো তাহলে সব সংশয় চলে যেতো। সমস্ত পৃথিবী তার মুঠোয় এসে ধরা দিতো। অনির্বচনীয় আনন্দে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠতো।

কিন্তু সুমিতা তো তা করলো না! কেন করলো না?—লজ্জা? এই অন্ধকারে তার কিসের এত লজ্জা? অতীন তো স্পষ্ট করেই তার মনের কথা বলেছে। সুমিতা মুখে না-বললেও স্পষ্ট করে একটু আভাসও কি দিতে পারে না?—না না, লজ্জা নয়। অন্য কিছু, হয়তো অন্য কিছু।

চিন্তার সমুদ্রে অতীন তলিয়ে যায়। উদ্দাম, অসংযত চিন্তারাশি দুর্বার বেগে তাকে কোথায় কোন্ অতলে টেনে নিয়ে যেতে থাকে; কোনোমতে সে তা' রোধ করতে পারে না।

এবং এমনি এলোমেলো উষ্ণ অসংযত চিন্তার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে শেষ রাত্রের দিকে বোধহয় তার চোখে একটু তন্দ্রা আসে। কিন্তু সেই সামান্য তন্দ্রার মধ্যেই সে স্বপ্নে ছাখে যে তার মা যেন তার দিকে চেয়ে আছেন। নিষ্পলক চোখে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছেন,—চেয়েই আছেন।

ঘুমের মধ্যেই তার হঠাৎ মনে হয়, এই কি তার মা? কিন্তু মা তো কবে মারা গেছেন!—

ধড়মড় করে সে উঠে বসে। ছাখে সত্যিই অন্ধকারে কে একজন তার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি সে বেড-সুইচটা টিপে দেয়। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় সমস্ত ঘর ভরে যায়। না, মা নয়, সুমিতা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুমিতার সারা মুখ এক অস্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল। চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণ ও উদভ্রান্ত।

অতীন অত্যন্ত আশ্চর্য হয়। বিস্মিতভাবে বলে,—'কী হয়েছে? ঘুম আসছে না?'

সুমিতা কোন কথা বলে না। নিশি-পাওয়া মানুষের মত তেমনি কয়েক মুহূর্ত শুধু সে অতীনের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলে।

অতীন কী করবে ভেবে পায় না।

সুমিতা উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে। সমস্ত শরীর তার বাষ্পোচ্ছ্বাসে থরথর ক'রে কাঁপে।

অতীন মূঢ়ের মত সেদিকে চেয়ে থাকে। কিছুই সে বুঝতে পারে না। একটু পর আস্তে আস্তে তার কাছে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে আসে। মনে মনে সে বলে, এত কান্না, এত !

সুমিতার চোখের প্রতিটি অশ্রুবিন্দু যেন অতীনের এতদিনের গভীর তৃষ্ণা ধীরে ধীরে শীতল করে দেয়। তার অশ্রুর ধারাবর্ষণে অতীনের হৃদয়ের শুষ্ক, তৃষিত, তপ্ত ভূমি যেন সিক্ত হয়, তৃপ্ত হয়, প্লাবিত হ'য়ে যায়। এই মুহূর্তে সে পূর্ণ, এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ।

অতীন সুমিতার পিঠের 'পরে একটি হাত রাখে। তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকে,—'সুমিতা—শান্ত।'

সুমিতা কোনো কথা বলতে পারে না। শুধু তার দেহটা আরো একটু জোরে কেঁপে ওঠে।

অতীন বলে, 'কেঁদো না, লক্ষ্মী মেয়ে কেঁদোনা'—পরম স্নেহে সে সুমিতার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

ধূপের মত, দক্ষিণের হুহু করা হাওয়ার মত সময় পুড়ে যায়, উড়ে যায়।

সুমিতার কোমল অঙ্গের স্পর্শে ধীরে ধীরে অতীন যেন কেমন হয়ে ওঠে।

হঠাৎ দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবির দিকে অতীনের পড়ে। আদিম অরণ্য জীবনের ছবি। চারিদিকে গভীর বন। শালজাতীয় অসংখ্য দীর্ঘ ঋজু গাছের সমাবেশ। এদিকে গুল্ম ঢাকা একটি অন্ধকার গুহা। দু'জন অরণ্যবাসী অসভ্য মানুষ সেই গুহার দিকেই আসছে। একটি মৃত হরিণ তাদের পেশিবহুল বিশাল কাঁধে ঝোলানো। বন্য মানুষ দুটির চোখে, মুখে, দেহের প্রতিটি পেশিতে কী তীব্র ক্ষুধার চিহ্ন! অদ্ভুত প্রচণ্ড সে ক্ষুধা।

ক্ষণেকের জন্য অতীন সব ভুলে সেই মৃত হরিণ ও ক্ষুধার প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর অকস্মাৎ হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর ঈষৎ আলো মেশানো তরল অন্ধকারে ডুবে যায়,—যে-অন্ধকারে জীবনের অনেকখানি আজও আবৃত।

সমাপ্ত